প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পত্রাঙ্ক
ষষ্ঠী পূর্ণিমা	শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত	২৩৫
[illegible]	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত	৮৫
বেঙ্গলের 'পুরুবিক্রম' ও 'নাট্যবিক্রমে'	সম্পাদক ...	১১
বংশাবলী	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	৮২
ভদ্রেশ্বর হইতে ত্রিবেণী	" ...	১৩৪
।' মিনার্ভায় "স্বপ্নের ফুল"	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার ...	১৪৩
১। রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ... ৩	২০২
২। রঙ্গভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্ন	... ...	২৩৪
৩। রমণীর সৌন্দর্য্য বোধ ও অলঙ্কার প্রিয়তা	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,	১৯৭
৩। স্টারে চন্দ্রশেখর	শ্রী—প	৯১
৩৫। সমালোচন	——	৪৩
৩৬। সমালোচনা	চোরবাগান সাহিত্যসমালোচক সমাজ*	২৫৫
৩৭। সমালোচনা	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ	১২৭
৩৮। সাহিত্য সংক্রান্ত চিঠিপত্র	প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র ও তত্ত্বাবধায়কের টিপ্পনী	২৩০
৩৯। স্তোত্র	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,	১৪৮
৪০। স্বাস্থ্য	শ্রীমন্মোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন ...	২
৪১। সমালোচনের অনুশীলন	শ্রী—ক	২৭৬
৪২। হাবড়া ঘুস্থড়ির বৌদ্ধমঠ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি ...	৬
৪৩। হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	১১৬

* সমালোচকগণের নাম ক্রমান্বয়ে এই, শ্রী—ম। শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু ও তত্ত্বাবধায়ক।

অনুশীলন

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০১ সাল, আশ্বিন। { প্রথম সংখ্যা।

আত্ম-নিবেদন।

বিশ্বপাবনী পতিতপাবনীর আগমনী তিথি আগতপ্রায়। তাই দীন-তারিণী ভূতভাবনী জগজ্জননী ভবানীর আনন্দবিধায়িনী আগামিনী আশ্বিনী দিনাবলীর পবিত্র স্মৃতি, হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। শুভ মাসে, শুভ সূচনা করিতে "অনুশীলন"কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ধর্ম্ম,সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, উপন্যাস, গল্প, প্রত্নতত্ত্ব, পদ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অনুশীলন, "অনুশীলনে" স্থান পাইবে। ইহার প্রধান উদ্যোগী লেখকগণ-মাত্রেই প্রায়ই সাহিত্য-জগতে সু-পরিচিত। কেহ কেহ কোন কোন সুবিখ্যাত মাসিক বা সাময়িক পত্রের সম্পাদকতাও সুখ্যাতির সহিত পরিচালন করিয়াছেন। অন্যান্য লেখকগণের মধ্যেও অনেকে অনেক প্রসিদ্ধ পত্রিকার লেখক-শ্রেণীভুক্ত। নূতন লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য, উপযুক্ত বোধে, তাঁহাদের প্রবন্ধও "অনুশীলনে" প্রকাশিত হইবে। যিনি পত্রিকা-সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিও সাহিত্য-জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে পরিগণিত। এরূপ আয়োজন করিয়া পত্রিকা প্রকাশিত করা যে, কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা ভুক্তভোগীরাই অবগত আছেন। এরূপ উপযুক্ত সাহিত্যসেবানিরত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের সহায়তায় "অনুশীলন" যে অল্প দিনের মধ্যেই খ্যাতিলাভ করিবে, সে

বিষয়ে আমাদিগের সাহস হইয়াছে। নানা কারণে লেখকগণের নামের তালিকা এখন দেওয়া হইল না।

বঙ্গভাষায় "সমালোচনী" মাসিক পত্রিকায় অভাব। প্রকৃত বিস্তারিত সমালোচনা, আজ কাল প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাতে প্রকৃত ও বিস্তারিত সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টিত থাকিব।

স্বর্গীয় মহাত্মা পিয়ারীচরণ সরকারের স্মরণচিহ্ন-সংস্থাপনার্থে "চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরী" স্থাপিত। উক্ত লাইব্রেরীতে যে "সাহিত্য-সমালোচক সমাজ" হইয়াছে, পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার সভাপতি। সেই সমাজ হইতে যে সকল পুস্তক ও পত্রিকাদির আলোচনা ও সমালোচনী-সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রস্তুত হইবে, তাহা এই "অনুশীলন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। অন্য উপায়েও সমালোচনা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইবে। সুতরাং সমালোচন কার্য্য, অতি গুরুতর হইলেও, এরূপ বিদ্বন্মণ্ডলীর সহযোগে আমরা যে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব, তাহা আশা করা যাইতে পারে।

সাড়ম্বর ভূমিকার পরিবর্ত্তে এই স্বল্পাক্ষর-গ্রথিত আত্ম-নিবেদনে সংক্ষেপে বক্তব্য বিষয় বিবৃত হইল। অবশিষ্ট কথা, কথায় না বলিয়া, কার্য্যে প্রদর্শিত করিবার মানস রহিল।

স্বাস্থ্য।

বর্ত্তমান সময়ের একটি প্রধান অভিযোগ এই যে, এ দেশের স্বাস্থ্য দিন দিনই অবনত হইতেছে। অধিকাংশ লোকই ব্যাধি-পীড়িত। তাহাদের দেহে সুস্থতা-ব্যঞ্জক কান্তি নাই। নীরোগ শরীরের যে উদ্যম, উৎসাহ এবং স্ফূর্ত্তি, তাহা নাই। সকলই যেন ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। এখনকার সাময়িক প্রবাদ-বচন এই ;—

"বল, বুদ্ধি, ভরসা।
চা'র দশকে ফর্সা॥"*

বস্তুতঃও এখন চল্লিশ বৎসর বয়স অতীত হইলেই অধিকাংশ লোককে জরাগ্রস্ত ও অকর্ম্মণ্য হইতে দেখা যায়।

"বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং।"—সুশ্রুত।

৭০ সত্তর বৎসরের পর বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। সে কালের এই ঋষিবাক্য একালে আর স্থান পাইতেছে না। অনেকেই বলেন, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ এবং দীর্ঘজীবী সবল লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতৃ-পিতামহাদি উর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষের কথা মনে করিয়া দেখুন না কেন, তাঁহারা কেমন বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম ছিলেন; যে দুই এক জন সেকালের লোক এখনও জীবিত আছেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা এখনও যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ, আমরা তাহার সিকি পারি না। এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের দাঁত কেমন শক্ত ও কঠিন। সুপারি চিবাইতেও তাঁহাদের ক্লেশ হয় না। চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি এখনও ক্ষীণ হয় নাই এবং আধুনিক বালকগণের ন্যায় দু পংক্তি পাঠোদ্দেশ্যে তাঁহাদের চসমার আবশ্যক হয় না। বস্তুত, পূর্ব্বের লোকের সহিত বর্ত্তমান কালের লোকদের তুলনা করিলে এতদ্রূপই দৃষ্ট হয়। দিন দিনই যদি দেশের স্বাস্থ্যের এইরূপ দুর্গতি হইতে থাকে, তবে দুই তিন পুরুষ পরে এ দেশের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা স্মরণ করিলেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়। আমাদের এই স্বাস্থ্যভঙ্গ ব্যক্তিগত নয়, কিন্তু জগতগত। স্বদেশের শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার পরিণাম চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছেন, হওয়াও আবশ্যক হইয়াছে। ভারতভিন্ন প্রায় সকল দেশেই দিন দিন স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। লোক সকল উত্তরোত্তর দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, কার্য্যপটু এবং দীর্ঘজীবী হইতেছে। আর আমাদের দেশে তাহার বিপরীত।

* শেষাংশের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ শুনিয়াছি। যথা—"ত্রিশে ত্রিশে ফর্সা"। "বিশের পর ফর্সা।" "কুড়ি গেলেই ফর্সা।" "ত্রিশ পেরুলে ফর্সা"।—সং

এ দেশের লোক সকল ক্রমশঃ ক্ষীণ-প্রাণ ক্ষীণ-শরীর হইতেছে, কোন মতে অতি ক্লেশে দিন কয়েক অতিবাহিত করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া চির বিশ্রামভবনে গিয়া আরাম করিতেছে।

ঐ সকল দেশের সহিত আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের এত পার্থক্য দৃষ্ট হয় কেন? আমাদের অজ্ঞানতা, এবং নিশ্চেষ্টতাই কি তাহার কারণ নয়? এদেশের স্বাস্থ্য কি তদ্রূপ উন্নত হইতে পারে না? বিধাতার কি ইহাই ইচ্ছা যে, এ জাতি ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে? যদি এখনও আমরা ব্যক্তিগত, দেশগত এবং জাতিগত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যত্নবান্ না হই. তাহা হইলে আমাদের বিনাশ নিশ্চিত। যে ব্যক্তি স্বীয় স্বাস্থ্য-রক্ষায় যত্নবান্ হয় না, বরং স্বাস্থ্য-ভঙ্গ করিতে তৎপর, সে তো এক প্রকার আত্মঘাতী। সে এক দিনে আত্মহত্যা করে না বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে আত্মহত্যা করে। আমাদের এই ব্যক্তিগত আত্মহত্যার চেষ্টা এখন জাতিগত আত্মহত্যায় পরিণত হইয়াও উঠিতেছে, যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয়, তজ্জন্য এখনই কৃতসঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য। আর উপেক্ষা করিলে সময় বৃথা নষ্ট হইবে।

স্বাস্থ্য যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ. তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ইহার আবশ্যকতা, প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করিতে সমর্থ। যিনি বিষম কোন যাতনা-ভোগ করিয়া দুই দিনের জন্য একটু আরামলাভ করিয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বাস্থ্য কিরূপ প্রার্থনীয়। লোকে সমস্ত বিনিময়ে স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। স্বাস্থ্যবিহীন রাজা, রাজভোগেও আরামলাভ করিতে অক্ষম। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি, পান, ভোজন, ভ্রমণ, শয়ন. গমনাদি ব্যাপারেই কোন সুখানুভব করিতে সমর্থ হয় না এবং জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও পারলৌকিক কুশল-সাধনে বঞ্চিত হয়। ফলতঃ কোন বিষয়েই স্বাস্থ্যহীনের মনোবাসনা পূর্ণ হয় না। তাহার আকাঙ্ক্ষা সকল অতৃপ্ত রহিয়া যায়। রুগ্ন ও ক্ষীণ শরীরে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া জীবন ধারণ করা বড়ই ক্লেশদায়ক। একে ব্যাধির যাতনা, তাহাতে দৈহিক অপটুতা এবং তজ্জন্য প্রত্যেক কার্য্যে অকৃতকার্য্যতা, মানুষকে একেবারে জীবন্মৃত করে

করিয়া ফেলে। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই শরীর-রক্ষণে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়।

"সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"—চরক॥

অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে শরীর পালন করা বিধেয়। শরীর না থাকিলে, শরীরীদিগের কিছুই থাকে না। বস্তুতঃও শরীর লইয়াই মানুষ। সেই শরীর নষ্ট হইলে, তাহার সম্বন্ধে সকলই ধ্বংস হইয়া যায়। যিনি দৈহিক সুখলাভের বাসনা করেন, যিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সংসারে মহোদ্যমশীল মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন এবং যিনি পরকালের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্ব্বাগ্রে দেহ রক্ষার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য।

মানবগণ, ব্যাধিগ্রস্ত হইলেই চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারাও উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রুগ্নদিগকে ব্যাধি পরিমুক্ত করিবার জন্য যথাসম্ভব যত্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে দেহ সুস্থ থাকে, কোন প্রকার ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে না, প্রত্যেক ব্যক্তির তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত থাকা আবশ্যক। স্বীয় শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা অনেকটা নিজের আয়ত্তাধীন। দৈহিক অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক যথোপযুক্ত আহার-বিহারে নিযুক্ত থাকিলে, দেহ সুস্থ থাকিতে পারে।

"তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত স্বাস্থ্যং যেনানুবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণাং অনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥"—চরক।

যে বিশুদ্ধ আহারাদি দ্বারা ক্ষীয়মাণ শরীরের পোষণ হয় এবং যে সকল আহারাদি দ্বারা ব্যাধির উৎপাত হয় না, তাহারই অনুষ্ঠান করিবে।

ধন্বন্তরি স্বীয় শিষ্য সুশ্রুতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"বৎস সুশ্রুত! ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনম ব্যাধ্যুপসৃষ্টানাং ব্যাধিপরিমোক্ষঃ স্বস্থস্য রক্ষণঞ্চ।"

বৎস সুশ্রুত! আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের প্রয়োজন দুটি। প্রথম, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যাধি-মোচন। দ্বিতীয়, সুস্থ ব্যক্তির স্বাস্থ্য-রক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রণালী আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অন্তর্গত হইলেও তদ্বিষয়ে চিকিৎসকের প্রতি সর্ব্বদা নির্ভর না করিয়া, আত্মনির্ভর করাই শ্রেয়ঃ। স্বাস্থ্য-রক্ষা-বিষয়ে সর্ব্বদা চিকিৎসকের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভর করাই সুবিধা-জনক। যাহাতে সাধারণে স্বাস্থ্য-তত্ত্বগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া তদনুসারে বলিতে পারেন, আমরা তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপদেশ-সমূহ সম্পন্ন করিয়া সাধারণের হিতার্থে তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন করিব। আশা করি, আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তা ঋষিগণের যুক্তিযুক্ত সারগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করিয়া সাধারণে স্বাস্থ্যরক্ষা পালন করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীমনোমোহন সেনগুপ্ত কবিরত্ন।

হাবড়া-ঘুসুড়ির বৌদ্ধ-মঠ।

কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর। এই বরাহনগরের আড়-পারে গঙ্গাতীরে ঘুসুড়ি গ্রাম অবস্থিত। এই ঘুসুড়ি গ্রামে একটি বৌদ্ধ-মঠ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মঠের কথা, কলিকাতাবাসী অধিকাংশ লোকেই জানেন না। মঠটি বড় অধিক দিনের প্রাচীনও নয়। বাঙ্গালায় যখন ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রথম গবর্ণর-জেনেরাল্ হন, তখন ইহা নির্ম্মিত হয়।

ঘুসুড়ি গ্রামে গঙ্গাতীরে এই বৌদ্ধ-মঠ প্রতিষ্ঠিত। গ্রামের যে ভাগে মঠটি অবস্থিত, এক্ষণে মঠের নামানুসারে সেই স্থানটি 'ভোটবাগান' নামে খ্যাত হইয়াছে। আর মঠটি 'ভোট-মন্দির' নামে খ্যাত। ইংরাজ-রাজত্বের অতি শৈশবাবস্থায় কলিকাতার এত নিকটে, বাঙ্গালা দেশে, গঙ্গাতীরে বৌদ্ধ-মঠ কেন স্থাপিত হইল, কেই বা স্থাপন করিল, তাহা জানিতে

বোধ হয়, পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল হইয়াছে। আমরাও নিম্নে তাহার বিশেষ বিবরণ দিলাম। *

গুর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে নেপালে অত্যন্ত উপদ্রব করেন। সেই উপদ্রবে নেপাল রাজ্য, গুর্খা-জাতির অধীন হয়। এই যুদ্ধে গুর্খারা নেপালীদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করে। দুই জন রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক, স্বচক্ষে সেই সকল অত্যাচার দেখিয়াছিলেন। নেপাল-রাজবংশের জনৈক রাজকুমার, স্বরাজ্য উদ্ধারার্থ ইংরাজরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। ইংরাজ গবর্ণর কাটিয়ার ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন কিন্‌লকের অধীনে এক দল সৈন্য, নেপাল-রাজকুমারের সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন; কিন্তু ইংরাজ সেনাদল বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। তৎপরে গুর্খাযুদ্ধ থামিলে ভুটানের রাজা দেপা শিদার সিকিম জয় করেন এবং ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে কুচবিহার রাজ্য আক্রমণ করেন। ঠিক্ এই সময় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার গবর্ণর হন। কুচ-বিহার-রাজ, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনিও এক দল পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া দেন। যুদ্ধে ভুটানীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং আহারাভাবে মহাকষ্টে পড়ে। ভুটানরাজ, তিব্বত-রাজের এক জন করদ রাজা; কাজেই দেপ শিদার, তিব্বত-রাজ দলই-লামার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিব্বত-রাজ দলই লামা, তখন অতি শিশু। তশি লামাই তাঁহার অভিভাবক-রূপে রাজ্য চালাইতেছেন। তশি লামা, ভুটানরাজের পত্রাদি পাইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের নিকট এক খানি পত্র ও এক জন দূত প্রেরণ করেন। পত্রখানিতে ভুটানরাজের ব্যবহারের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তশি লামা প্রার্থনা করেন যে, ভুটানরাজ যখন এ রাজ্যের অধীন রাজা, তখন তাঁহাকে শাসনে রাখিবার জন্য ইংরাজ, যদি অস্ত্র ধারণ করেন, তবে তাহা এই রাজ্যের বিরুদ্ধে ধারণ করাই হইয়া থাকে; অতএব

* বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার ৫৯শ ভাগের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বাবু গৌরদাস বসাক মহাশয় এ সম্বন্ধে একটি অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই ইহার সংগ্রহ করিলাম।

ইংরাজ, তিব্বতের সহিত বন্ধুতা রাখিয়া চলিলে সুখী। যাহাতে দেপ শিদার ভবিষ্যতে ইংরাজ-রাজ্যের কাহারও সহিত অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত না হন, তদ্বিষয়ে তিব্বত-রাজ লক্ষ্য রাখিবেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৯ মার্চ্চ তারিখে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস এই পত্র প্রাপ্ত হন। এই পত্র যিনি লইয়া আসেন, তিনি এক জন ভারতের পশ্চিমোত্তরীয় হিন্দু সন্ন্যাসী। তাঁহার নাম পূরণগিরি গোসাঞি *। আর যে দূত আসিয়াছিলেন, তিনিও এক জন লামা, নাম পৈমা।

তৎপরে হেষ্টিংস্ ভূটানের রাজার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। তাহাতে ভূটান-রাজ ইংরাজের নিকট নানা সর্ত্তে বাধ্য হন। কুচবিহার-রাজ রাজা দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা দেবনদেব বন্দিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সন্ধি স্থাপিত হইলে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মনে তিব্বতে ইংরাজ-বাণিজ্য-বিস্তারের কথা জাগিল। তিনি লামার পত্রের ও দূতের কথার উত্তর দিবার ছলে তিব্বতের এক জন দূত পাঠাইবেন স্থির করিলেন এবং স্থির হইল যে, মিঃ বোগ্‌ল্, ডাক্তার হামিল্‌টন্ ও পূরণগিরি গোসাঞি দূত হইয়া যাইবেন। এই দূত-দলের প্রত্যাবর্ত্তনেই ভোটবাগান ও ভোট মন্দিরের সূত্রপাত হয়।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ বোগ্‌লের অধীনে দূত-দল কলিকাতা হইতে তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিল। তখন ভূটানের দক্ষিণস্থ বোধ-পর্ব্বতই বাঙ্গালা ও তিব্বত রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত ছিল; বাঙ্গালার নাগরকোট পর্ব্বত বাঙ্গালার উত্তর সীমা ছিল। মিঃ বোগ্‌লের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, এই সকল পর্ব্বতের উপর দিয়া বেশ পরিস্কৃত পথ নাই। সন্ন্যাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অতি সামান্য বন্য ও পার্ব্বত্য পথ ধরিয়া তাঁহারা তিব্বতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন

* 'গোস্বামী' শব্দের অপভ্রংশে 'গোসাঞি' পদ হয়। এই অপভ্রষ্ট পদটি আপাততঃ 'গোসাই', এই রূপে লিখিত হইতেছে; কিন্তু 'গোসাঞি' হওয়াই উচিত; কারণ 'স্বামী' শব্দের স্থানে 'সাঞি' হওয়াই বেশী সঙ্গত। ইহাতে 'ঞ' বর্ণটির একটি স্বতন্ত্র ব্যবহারও পাওয়া যায়।

পরে ভুটান-রাজ্যের রাজধানী তশিচ্ছইজঙ্গ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। এই নগর কুচবিহার হইতে ৫৩ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই নগর এখনও কুচবিহারের রাজধানী। এই খানে ভুটান-রাজ্যের তদানীন্তন "দেবরাজ" নামক প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিলেন।

"দেবরাজ * তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদর করিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে তিব্বতে যাইতে দিতে কতকটা বাধা দিতে লাগিলেন; চীন সম্রাটের অপত্তি তুলিলেন। পূরণগিরি, রাজার চতুরতা বুঝিয়া দল-বল লইয়া সাহস পূর্ব্বক ১৩ই অক্টোবরে বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহারা ফরি-জঙ্গ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থান চুম্বি উপত্যকায় অবস্থিত। এই স্থানে তাঁহারা ভুটান ও তিব্বতের সীমা চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তৎপরে ৮ই নবেম্বর তারিখে তাঁহারা তিব্বতে তশি রব্‌গ্যা নামক স্থানে তশিলামার প্রাসাদে উপনীত হইলেন। দলই লামাই তিব্বতের রাজা। তশি লামা, ভুটানের দেবরাজের ন্যায় রাজ্যের রক্ষক ও রাজার অভিভাবক। তশিল্‌হুন্‌পো নামক স্থানেই তশি লামা বাস করেন; কিন্তু তৎকালে সেই স্থানে বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় রব্‌গ্যা নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। এই খানে দূত-দল সমাদরে কিছু দিন থাকিয়া, তশি লামার ইচ্ছানুসারে তশিল্‌হুন্‌পো

---

* ভূত পূর্ব্ব ছোট লাট সার্ আশ্‌লি ইডেনের কথামতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান যে জনপদকে ভুটান বলে, তথায় ৩ শতাব্দী পূর্ব্বে কুচবিহারের এক জন রাজা ছিলেন। তিনি তিব্বতের ডুবঙ্গ সডুবঙ্গ নামক এক জন লামা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ঐ লামাই 'লামা রিন্‌পোচে' "ধর্ম্মরাজ" নাম গ্রহণ করিয়া ভুটানে রাজত্ব স্থাপন করেন। লামা সডুবঙ্গ বর্ত্তমান দেহ পরিত্যাগ করিয়া আবার লাসা নগরে নব দেহ পরিগ্রহ করেন এবং ভুটানে প্রেরিত হইয়া যখন বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি রাজ্য-বাসনা ত্যাগ করিয়া এক জনকে রাজ্যের রক্ষক ও নিজ-প্রতিনিধি-রূপে নিযুক্ত করিলেন, তাঁহারই পদের নাম 'দেবরাজ'। এই দেবরাজ আপাততঃ ৩ বৎসর অন্তরে ছয় জন বিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন।

নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। এখানে তাঁহারা পাঁচ মাস রহিলেন। ইতি মধ্যে লামার সহিত মিঃ বোগ্‌লের বেশ সম্প্রীতি হইল। মিঃ বোগ্‌ল, লামার ন্যায় সন্ন্যাসী ও ফকিরদিগকে প্রত্যহ কিছু কিছু দান করিতেন, তিব্বতীয়ের ন্যায় পোষাক পরিতেন ও সর্দ্দারের সহিত মিশিয়া তিব্বতের ভাষা, তিব্বতী রাজ্যের নিয়ম, তিব্বতীয় আচার-ব্যবহারাদি শিক্ষা করিতেন; আর পূরণ গিরি, উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করিয়া উভয়েরই বিশেষ প্রীতিপাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া ছিলেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে দূত-দল, ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ বোগ্‌ল ও পূরণ্‌গিরি, আবার তিব্বত গমনে নিযুক্ত হন; কিন্তু সে সময় তশিলামা চীন-রাজধানীতে থাকায় তাঁহাদের গমনের বিলম্ব ঘটিল। শেষে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সংবাদ আসিল, পিকিন নগরে তশি লামা বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের যাওয়া একপ্রকার স্থগিত হইল। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করায় কিছুদিনের জন্য তিব্বত-যাত্রার কথা চাপা পড়িয়া গেল। তার পর আবার ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তশি লামার ভ্রাতা, ফেব্রুয়ারি মাসে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে সংবাদ দিলেন, তশি লামা পইনম উপত্যকার এক স্থানে আবার নব দেহ ধারণ করিয়াছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এই উপযুক্ত সুযোগে আবার এক বার দূত-প্রেরণার্থ উদ্যোগ করিলেন। এবার কাপ্তেন স্যামুয়েল টার্ণার প্রধান দূত, লেফটেনাণ্ট স্যামুয়েল ডেভিস্ ও ডাক্তার রবার্ট সহকারী, পূরণগিরি পথদর্শক ও পরামর্শদাতা স্থিরীকৃত হইলেন। এই দূত-দল ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা ত্যাগ করিল।

কাপ্তেন টার্ণার মিঃ বোগ্‌লের পথ ধরিয়া তাশ ছুইজঙ্গে উপস্থিত হইলেন; সেখানে তিন মাস কাল থাকিয়া ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে তশিল্‌হুন্‌পো নগরে লামার প্রাসাদে পৌঁছিলেন। এই সময় মৃত লামার ভ্রাতা অভিভাবক-রূপে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি দূত দলকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে দূত দল, তিব্বতে কয়েক মাস থাকিয়া ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পাটনায়

ফিরিয়া আসিলেন। কাপ্তেন টার্ণার এই খানেই ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌কে নিজ যাত্রার ও কৃতকর্ম্মের বিবরণী প্রদান করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ পুরণগিরিকে বৃটীশ দূতরূপে তিব্বতরাজধানীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করেন, কিন্তু ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহাকে স্বীয়কর্ম্মে ইস্তফা দিতে হইল বলিয়া তিনি আর এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তৎপরে জন ম্যাক্‌ফার্সন্ গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। কাপ্তেন টার্ণার তাঁহার সহিত পুরণগিরির পরিচয় করাইয়া দেন। নূতন গবর্ণর তখন তাঁহাকে তিব্বতে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। তিনিও তিব্বত হইতে নবদেহধারী বালক লামা ও তাঁহার অভিভাবকের পত্র আনিয়া নিজ বিবরণীসহ নূতন গবর্ণরকে প্রদান করেন। পুরণগিরি এইরূপে কয়েকবার তিব্বতে যাতায়াত করাতে তিব্বত রাজের সহিত ইংরাজের বেশ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে প্রথমবার দূতদলের প্রত্যাগমনেই ভোট-বাগানের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিরূপে কি হইয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। প্রথমবার যখন মিঃ বোগ্‌ল তশিলামার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তখন এক দিন তিনি মিঃ বোগ্‌লকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "আমি গঙ্গাতীরে একটু স্থান চাহি, সেই স্থানে আমার এইদেশের লোক গিয়া উপাসনাদি করিতে পারিবে। এ বিষয়ে আমি গবর্ণর সাহেবকে লিখিতে চাহি, আপনারা কি বলেন।* মিঃ বোগল তাহাতে সম্মতি দিয়া কলিকাতায় এই ডিসেম্বরে এক পত্র লিখিলেন। তাহাতে গবর্ণর জেনেরালকে লিখিয়া দিলেন যে "প্রায় ৭।৮ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের অনেকগুলি মঠ ছিল, এই সকল মঠে তিব্বতীয় বৌদ্ধ যাজকেরা আসিয়া বাস করিতেন ও হিন্দুশাস্ত্রাদি পাঠ করিতেন, হিন্দু ও বৌদ্ধতীর্থ সকলে ভ্রমণ করিতেন।

* তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস যে লামাগণ মৃত্যুর পর কোন না কোন সুলক্ষণাক্রান্ত বালক-দেহে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং নানা কারণে তিব্বতীয়েরা তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই বালককে পূর্ব্বলামার ন্যায় সমাদর ও ভক্তি করিতে থাকে।

মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়া সেই সকল মঠ ধ্বংস ও লুঠ করিয়া, তিব্বতীয়দিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। সেই অবধি বাঙ্গালার সহিত তিব্বতের সকল সম্পর্ক রহিত হইয়া গিয়াছে। লামা ভাবিতেছেন যে, যদি তিনি এখন এত দিনের পর বাঙ্গালায় আবার বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার যশ বৃদ্ধি ও কার্য্য-কুশলতার বিশেষ সুখ্যাতি হয়; এই জন্য তিনি এ বিষয়ে একটা কিছু উপায় করিতে বড়ই উপরোধ অনুরোধ করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে আগামী শীতকালে তিনি তাঁহার কয়েক জন লোককে আপনার নিকট পাঠাইয়া দেন, তাহারা আপনার সহিত দেখা করিয়া গয়ায় তীর্থ দর্শনে যাইবে। এ সম্বন্ধে তিনি চীন সম্রাটের বন্ধু জেটসন দম্পা বা তারানাথ লামাকে লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে লিখিয়াছেন যে ইংরাজেরা এখন বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা. ইহারা আমার সহিত বেশ সদয় ব্যবহার করিতেছে, ইহারা কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে না, নির্ব্বিবাদে সকলকে আপন আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে দিয়া থাকে. অতএব বাঙ্গালা দেশের বৌদ্ধতীর্থ দর্শনার্থী কতকগুলি লোককে স্থির করিবেন, তাহারা গিয়া প্রথমে গবর্ণর জেনেরালের সঙ্গে দেখা করিবে। আমি কলিকাতার আদেশের অপেক্ষা না করিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল ভাবিয়া লামার এই সকল প্রস্তাবে উৎসাহ দিয়াছি। আমি এখন এরূপ আশা করি না যে লামার প্রস্তাব মত চীন সম্রাট এখনই আপনার নিকট কোন লোককে দূত স্বরূপ পাঠাইবেন, তবে ইহা বিশ্বাস করি যে এই সূত্র হইতে একদিন না একদিন পিকিন দর্শন আমারই ভাগ্যে ঘটিবে।" ৩৫

মিঃ বোগলের নিকট আশ্বাস পাইয়া তশিলামা মহানন্দে পিকিনের প্রধান যাজক চাক্য লামাকে লিখিলেন যে ইংরাজেরা অতি ভদ্রলোক, অতএব ইহাদের অধিকার কালে তিনি বাঙ্গালার তীর্থ দর্শনার্থ লোক পাঠাইতে পারেন। গবর্ণর তাহাদিগকে সমাদরে গ্রহণ করিবেন। এই চাক্য লামার মধ্যস্থতায় তিব্বতীয় পণ্যজীবী সন্ন্যাসীদিগের বাঙ্গালায় অবাধে

ব্যবসা করিবার প্রস্তাব হয়। তৎপরে তশিলামা মিঃ বোগ্‌ল্‌কে বলিয়া দেন, দলই লামা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যেন আর এক বার দূত পাঠান। এই দূত যেন গঙ্গাতীরে নিশ্চয় স্থান দিবার কথা লইয়া আসে; তাহা হইলে দলই লামা, পূরণগিরিকে সেই স্থানের মঠাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিবেন এবং ইংরাজেরা বাধ্য হইয়া থাকিতে আদেশ দিবেন। পূরণগিরির সামান্য সামান্য বিষয়ে অভাব ঘটিলে, ইংরাজ গবর্ণর তাহা পূর্ণ করিবেন।

মিঃ বোগ্‌ল্ জিজ্ঞাসা করেন, গঙ্গাতীরে কোথায় স্থান আবশ্যক? তাহাতে লামা বলেন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে এখান হইতে যে সকল লোক সে দেশে যাইবে, তাহারা গবর্ণরের সহিত দেখা করিবার সুবিধা পাইবে। সেখানে আমি একটা বৃহৎ অট্টালিকা করিতে চাহি না, একটা সামান্য হইলেই চলিবে। বাঙ্গালায় সচরাচর যেমন গৃহাদি হয়, সেইরূপই হইবে। সে সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। পূরণ গিরি যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন। তৎপরে তিনি যে সকল দেব-প্রতিমা বাঙ্গালায় পাঠাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেগুলি মিঃ বোগ্‌ল্‌কে দেখান।

তৎপরে মিঃ বোগ্‌ল্ কলিকাতায় আসিলে লামার পত্র আসিল। মিঃ বোগ্‌ল্, হেষ্টিংস্‌কে বুঝাইয়া দিলেন, যে এই মঠ প্রস্তুত করিতে আদেশ দেওয়া ও জমী দেওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে তিব্বতীয় বণিকেরা স্বচ্ছন্দে এদেশে তীর্থ-দর্শন-ছলে যাতায়াত করিতে পারিবে। তারপর আগামী শীত-কালে লামা, যে এক দল তীর্থ-দর্শনাভিলাষী লোক পাঠাইতে মনঃস্থ করিয়াছেন, তাহারা এদেশে এক বার আসিয়া ঘুরিয়া গেলে, সে দেশের লোকের এদেশের অত্যন্ত উষ্ণতা-সম্বন্ধে যে কুসংস্কার আছে, তাহা দূর হইবে; সুতরাং কালে বাঙ্গালায় একটি তিব্বতীয় হাট বসিবে। সেখানে তিব্বতের লোক আসিয়া বাঙ্গালার উৎপন্ন দ্রব্য-সম্ভার ক্রয় করিতে থাকিবে।

মিঃ বোগ্‌লের সদ্‌যুক্তিতে তৃপ্ত হইয়া ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ গঙ্গাতীরে এক খণ্ড

ভূমি খরিদ করিলেন ও তাহা তশি লামাকে দান করিয়া মহা সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক মঠ-নির্ম্মাণে আদেশ দিলেন।

ঘুসুড়ির ভোট-মন্দিরের বর্ত্তমান মঠ-স্বামীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া এই বৌদ্ধ মঠের ইতিহাস-সম্বন্ধে যে সকল কাগজ পত্র পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চারি খানি সনন্দ আছে। এই সনন্দ চারি খানির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সনন্দ খানির তারিখ—সন ১১৮৫, ১লা আষাঢ় (১৭৭৮, ১২ জুন)। ইহার শিরোদেশে দুইটি চতুরস্র মোহর আছে। তন্মধ্যে বাম ভাগেরটি লাল কালিতে ছাবা ও দক্ষিণেরটি কালো কালিতে ছাবা। লাল মোহরটি কালো মোহর অপেক্ষা বড়। এই লাল মোহরটি তিব্বতের সর্ব্ব প্রধান দলই লামার মোহর। ইহাতে নাগরী (লাণ্টশান) অক্ষরে ঊর্দ্ধাধোভাবে "মগ্ন" (মঙ্গল) এই কথাটি লিখিত আছে। মধ্য বর্ণটিতে একটি নামের আদি বর্ণগুলির কূটগ্রন্থির আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মোহরটি তশি লামার দরবারের। সনন্দ খানি পারস্য ভাষায় ও পারসিক অক্ষরে লিখিত। লেখা পাঠে জানা যায়—সুবা বাঙ্গালা, চাকলা হুগলী, সরকার সপ্তগ্রাম, পরগণা বোবোর অন্তর্গত মৌজা দরিবাকর বাক্‌পুরের মধ্যে ৬৬ বিঘা এবং পরগণা পাইকানের অন্তর্গত মৌজা ঘুসুড়ির মধ্যে ৩৪ বিঘা ৮ বিশ্বা একুনে ১০০ বিঘা ৮ বিশ্বা গঙ্গার ঠিক্ তীরের উপরের জমী পূরণগিরি গোস্বামীকে দেওয়া গেল। তিনি বাঙ্গালা ১১৮৫ সালের প্রথম হইতেই ইহা বিনা করে ভোগ করিতে থাকিবেন এবং ইহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ ও উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারিবেন। এই সনন্দের পরবর্ত্তী আর এক খানি সনন্দের তারিখ,—সন ১১৮৯, ২ রা ফাল্গুন (ইং ১৭৮২, ১১ই ফেব্রুয়ারি)। এই সনন্দের উপরেও দলইলামার লাল মোহর ও তশি লামার কালো মোহর আছে। এ খানিও পারস্য ভাষায় পারসিক অক্ষরে লিখিত। এ খানিও অবিকল প্রথম খানির ন্যায়; কেবল প্রভেদ এই যে, প্রথম খানির যে স্থলে পূরণগিরির নাম, এখানিতে সে স্থলে কাহারও নাম নাই। আর জমীটির পরিমাণ, স্থলে লিখিত আছে যে, মৌজা বাগাকপুরের অন্তর্গত আবাদী ৫০ বিঘার মধ্যে ৯ বিঘা ৭ বিশ্বা জমী,

মহারাজ নবকৃষ্ণের সম্পত্তির অন্তর্গত; ২৯ বিঘা জমী রাজা রায়চাঁদ রায়ের সম্পত্তির অন্তর্গত এবং ১১ বিঘা ১৩ বিশ্বা রাজা রামলোচনের সম্পত্তির অন্তর্গত। এই মহারাজ নবকৃষ্ণ, শোভাবাজার রাজগোষ্ঠীর আদি-পুরুষ নবকৃষ্ণ। রাজা রায়চাঁদ রায় ও রাজা রামলোচন গবর্ণর মিঃ ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের দেওয়ান, রামচরণ রায় পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী। ইঁহাদের বংশধরেরা তৎপরে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া হাবড়ার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামে গিয়া বাস করেন ও আজিও তৎগ্রামের রাজা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইঁহারাও কায়স্থ। অবশিষ্ট আর দুই খানি সনন্দের মধ্যে এক খানির তারিখ প্রথম সনন্দের তরিখই দেওয়া আছে, কেবল প্রভেদ এই যে পূরণগিরির নামের পরিবর্ত্তে ইহাতে "তশিলামা পঞ্চন অর্দ্দনি বাকদেও পঞ্চন" (পণ্ডিতরত্ন বাক্যদেব পণ্ডিত) এই নাম লিখিত আছে। ইহাও পারস্য ভাষায় পারশিক অক্ষরে লিখিত। ইহার শীর্ষস্থানে দক্ষিণ দিকের কোণে, ইংরাজদিগের ডিম্বাকৃতি কালো মোহর ও তাহার বামে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের স্বহস্তকৃত স্বাক্ষর এবং দক্ষিণ দিকের কিনারায় ইংরাজের ঐ ডিম্বাকৃতি মোহর আছে। অবশিষ্ট খানি দ্বিতীয় সনন্দের অবিকল নকল; কেবল মোহর গুলি ইংরাজের। ইহাতে বোধ হয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সনন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয়ের নকল মাত্র; কিন্তু তাহা নহে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্, লামাদিগের অনুরোধে ও আপনার উদ্দেশ্য-সাধনার্থ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দেই কলিকাতার অপর পারে গঙ্গাতীরে পূর্ব্বোক্ত ৩ খানি সনন্দের লিখিত জমীগুলি খরিদ করিয়া তশি লামাকে দান করেন। মিঃ বোগ্‌ল্, হেষ্টিংসকে তিব্বত হইতে যে পত্র লেখেন, তাহার প্রত্যুত্তরে মিঃ হেষ্টিংস্, তশিলামাকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এই জমীগুলির দান-সম্বন্ধে কথা ছিল। তখন মিঃ বোগ্‌ল্ ও পূরণগিরি চলিয়া আসিয়াছেন। ইতি-মধ্যে হেষ্টিংসের পত্র পৌঁছিলে তশি লামা, কতকগুলি দেবপ্রতিমা ও মঠ-নির্ম্মাণার্থ টাকা পাঠাইয়া দেন এবং পূরণগিরির নামে এক খানি দানপত্র লিখিয়া তাহাতে নিজের ও দলই লামার মোহর করিয়া পাঠাইয়া দেন। সম্ভবতঃ এই খানি এখান হইতে লিখিত ও পঠিত হইয়া তিব্বতে মোহর হইবার

জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। তৃতীয় খানি উহারই নকল বটে, কিন্তু উহা এখান হইতে পূরণগিরিকে দেওয়া হয়। পূরণগিরি এইরূপে উভয় স্থল হইতে দলিল পাইয়া ঘুস্থড়ি গ্রামে ভোট-বাগানের পত্তন করিলেন। তশি লামার টাকায় পূরণগিরি ও মিঃ বোগলের উপদেশ-মত এই মঠ নির্ম্মিত হয়। তিব্বতীয়েরা নিজ-দেশকে আপনারা 'ভোট' বা 'ভোড়' বলে। তাহা হইতে পূরণগিরি কর্ত্তৃকই হউক বা এ দেশীয় লোকের মুখে মুখেই হউক, এই নূতন মঠের নাম 'ভোট-মন্দির' ও মন্দির-সংশ্লিষ্ট সমস্ত জমীর নাম 'ভোট বাগান' হইয়াছে এবং পূরণগিরি হইতে বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষ পর্য্যন্ত, 'ভোট-মোহান্ত' নাম পাইয়া আসিতেছেন। দ্বিতীয় সনন্দে যে ৫০ বিঘা জমীর কথা উল্লিখিত আছে, দেখা যায়, তাহা প্রথম সনন্দের ১০০ বিঘার অন্তর্গত নহে। ইহাও ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক অপর এক সময়ে, অপর এক জন লামাকে দেওয়া হয়। এই সময় তশি লামার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা, তখন দলইলামার অভিভাবক-রূপে কার্য্য করিতেছেন। বোধ হয়, তিনিই নিজ-ভ্রাতার "পণ্ডিত রত্ন বাক্যদেব" উপাধি গ্রহণ করিয়া কার্য্য চালাইতেছিলেন। সেই উপাধি ধরিয়াই বোধ হয়, এই দান-পত্র লিখিত হইয়া থাকিবে। কারণ টার্ণার, মার্থাম প্রভৃতির বর্ণনায় ইহা স্বতন্ত্র একখণ্ড জমী ও ভিন্ন সময়ে প্রদত্ত বলিয়া উল্লিখিত আছে। চতুর্থ সনন্দ খানি এই দ্বিতীয় সনন্দের নকল। ইহা তৃতীয় সনন্দের ন্যায় এখান হইতে পূরণগিরিকে দেওয়া হইয়াছিল। এই রূপে ভোটবাগানে ১৫০ বিঘা ৮ বিশ্বা জমী সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই মঠের একটি একটি অতিথি-শালা ছিল, কালে তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৺ তারকেশ্বরের মন্দির ও মঠ ব্যতীত সন্ন্যাসী মোহান্তের মঠ, বাঙ্গালায় এইটি, আর তৃতীয় নাই। পূর্ব্বে যখন অতিথিশালা ছিল, তখন ইহাতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী-ভিক্ষু ও শ্রমণেরা আসিয়া বাস করিত। লামার নিকট হইতে যাহারা গবর্ণর-গণের সহিত দেখা করিতে আসিত, তাহারাও থাকিত; মার্থামের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরে কলিকাতার নিকটে কেন বৌদ্ধ-মন্দির স্থাপিত

হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপতঃ উপরে উল্লিখিত হইল। এখন বোধ হয়, পাঠকগণের আর এক নূতন কৌতূহল হইয়াছে যে, বৌদ্ধ-মন্দিরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী দশনামী সম্প্রদায়-ভুক্ত "গিরি" উপাধিধারী শৈব সন্ন্যাসী পূরণ গিরি মঠাধ্যক্ষ হইলেন কেন? আর মঠের বর্ত্তমান অবস্থাই বা কি?

মঠের আধুনিক ইতিহাস।—কলিকাতার যে কোন ঘাট হইতে নৌকায় চড়িয়া উত্তর মুখে ক্রোশ দুই গেলেই নদীর দক্ষিণ তীরে একটি বৃহৎ বাঁধা ঘাট দেখা যায়। এই ঘাটের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি শিবমন্দির আছে। এই ঘাট, 'ভোট-মহান্তের' বা 'ভোট-গোসাঁঞির' ঘাট বলিয়া বিখ্যাত। এই ঘাটে উঠিয়া মন্দির গুলি অতিক্রম করিলেই কতকটা নূতন [illegible] এক পুরাতন অট্টালিকা নয়নগোচর হয়; ইহাই 'ভোট-মন্দির' বা মঠ। বাড়ীটির চারি দিক একটি প্রাচীরে ঘেরা। ঘাটের সম্মুখে এই প্রাচীরে প্রধান প্রবেশ-দ্বার। এই দ্বার দিয়া প্রধান উঠানে গিয়া পড়িতে হয়। বাড়ীটির বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহাতে একটিও খিলান নাই। তিব্বতীয় অট্টালিকার ইহা একটি লক্ষণ বটে। বাড়ীটি দুই মহল, বাহিরের মহলে দেবতার উৎসবাদি সম্পন্ন হয়, আর ভিতরের মহলে সেবাইতগণ অবস্থিতি করিয়া থাকে। যে ফটক দিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে হয়, তাহার উপরিভাগে যে মাথ্লা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু ভাঙিয়া গেলেও স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা তিব্বতীয় ধরণে প্রস্তুত। এই মাথ্লা বেশ বিস্তৃত। ইহার কার্ণিসের কতকাংশ নদীর দিকে বাহির করা আর কতকটা উঠানের দিকে বাহির করা। এই ফটকের গা-দিয়া বেষ্টন-প্রাচীর চারি দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রাচীর-গাত্রে অন্য দ্বার নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ ('ঘুলঘুলি') আছে। প্রাচীরের পরই দ্বিতল অট্টালিকা। অট্টালিকার নিম্নতলের গৃহগুলি উঠান হইতে এক হাত উচ্চ। গৃহগুলির সম্মুখে উঠানের দিকে বারাণ্ডা। বারাণ্ডার কোলে ৭ ফুট অর্থাৎ ৪ হাত ১৬ আঙ্গুল উচ্চ থাম। থামের মাথায় পাড় দিয়া বারাণ্ডার ছাদ হইয়াছে। দ্বিতলেও ঠিক এইরূপ গৃহ ও বারাণ্ডা।

মঠের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ দেব-প্রতিমা আছে। হিন্দু-প্রতিমার

মধ্যে বিষ্ণু, দুর্গা, বিন্ধ্যবাসিনী, গণেশ, গোপাল, শালগ্রাম্ এবং নানাবিধ শিবলিঙ্গ আছে। আর বৌদ্ধ দেবতার মধ্যে আর্য্যতারা, মহাকাল-ভৈরব, সম্বলচক্র, সমাজগুহ্য, বজ্রভ্রূকুটী ও পদ্মপাণির প্রতিমা আছে। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ পদচিহ্ন ও খড়ম আছে। একটি ক্ষুদ্র নিম্নায়তন গৃহে এই সকল প্রতিমা আছে। মঠে একটি সমাধি-স্থান আছে। এই সমাধি-মধ্যে পূরণ-গিরির দেহ সমাহিত আছে। পূরণগিরির প্রধান চেলা এই সমাধি-স্থান প্রস্তুত ও তদুপরি শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাধি-স্থানে যাইবার পথে দ্বারের উপর অতি অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে, "অতঃপর সকলেই এই পবিত্র স্থানের প্রতি ভক্তি করিবে এবং এই শিবের পূজা করিবে। হিন্দুতে ইহা অমান্য করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপে পড়িবেন এবং মুসলমান বা অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা অমান্য করিলে নরকে যাইবে। ইতি সংবৎ ১৮৫২, শকাব্দা ১৭১৭, বঙ্গাব্দা ১২০১, ২৩ শে বৈশাখ, রবিবার, পূর্ণিমা, দ্বাদশ দণ্ড মধ্যে (৩রা মে ১৭৯৫)।"

মন্দিরস্থ হিন্দু-দেব-দেবীর প্রতিমাগুলির পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। বৌদ্ধ-প্রতিমাগুলির বিবরণ একটু দেওয়া আবশ্যক।

আর্য্যতারা।—এই দেবী-প্রতিমাই মন্দিরের প্রধান দেবতা। নেপালী বৌদ্ধেরা এই দেবীকে প্রজ্ঞা পারমিতা বলিয়া থাকে। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-মতে ইনিই পূর্ব্বজাত সমস্ত বুদ্ধের বা তথাগতগণের জননী। উত্তর-প্রদেশের বৌদ্ধ-তন্ত্র-মতে ইনিই আবার ভূত ও ভবিষ্যৎ বুদ্ধগণের পত্নী। তিব্বতে ইঁহার নাম 'গ্রোলমা দেবী'। ইহা হিন্দু-তন্ত্রোক্ত মহাশক্তিরই রূপান্তর। এই প্রতিমা তাম্র-নির্ম্মিত ও চীন দেশীয় স্বর্ণে মণ্ডিত। সম্ভবতঃ পূরণগিরি, চীন রাজধানী পিকিন হইতে এই মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এই দেবীর বাম হস্তে কমণ্ডলু। কমণ্ডলু রত্ন-রাশিতে পূর্ণ। আর দক্ষিণ হস্তে পদ্ম। দেবীর মস্তকে পঞ্চশিখ মুকুট, কেশ-রাশি অলকার ন্যায় কুঞ্চিত, গাত্রে চীন দেশীয় আঙ্গিয়া, মাঞ্চুরিয়ার স্ত্রীলোকের পাদুকা, পরিধানে তিব্বতীয় স্ত্রী-পরিচ্ছদ। প্রতিমাটি উচ্চে এক হাত আট অঙ্গুলি। তঙ্গ-বংশীয় চীন সম্রাট

ঙৈ-চুঙ্গের কন্যার সহিত তদানীন্তন তিব্বত-রাজের ৬৩০ খৃষ্টাব্দে বিবাহ হয়। এই কন্যা, আর্য্যতারা দেবীর অবতার বলিয়া বিখ্যাতা।

মহাকাল ভৈরব।—এই দেবতা দশানন, ছত্রিশবাহু, অষ্টাদশপদ, মুণ্ডমালা-ধারী, ভয়ঙ্করমূর্ত্তি, নানাবিধ-অস্ত্র-শস্ত্র-সমন্বিত। ইঁহার সহিত ইঁহার শক্তি-মূর্ত্তি "মহাভৈরবী"ও আছে। তিব্বতীয় লামা বিশেষতঃ তশিলামার ইনিই রক্ষক।

সম্বলচক্র।—তিব্বতে বৌদ্ধ-তন্ত্রোক্ত এই দেবতাই প্রধান। ইনি একমুণ্ড, দশবাহু। ইঁহার শক্তিও ইঁহার সহিত অবস্থিত। ইনি এক অসুরকে (সম্ভবতঃ মার) পরাজিত করিয়া তাহার বক্ষের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। ইহার বর্ণ সুপীত বর্ণ। প্রতিমাটি অর্দ্ধ-হস্ত ও তাম্র-নির্ম্মিত।

সমাজগুহ—বৌদ্ধ-তন্ত্রোক্ত আর একটি দেবতা। ইনি ত্রিমুখ, ষড়বাহু। ইঁহার সহিতও ইঁহার শক্তি অবস্থিত। শক্তিদেবীও ত্রিমুখী, ষড়ভুজা।

বজ্রভ্রকুটী—আর্য্যতারা দেবীর অপর এক প্রকার মূর্ত্তি। তিব্বতরাজ স্রঙৎসান গম্পের মহিষীর মূর্ত্তি হইতে এই মূর্ত্তি প্রস্তুত। নেপালরাজ প্রভাবর্ম্মা (৬৩০—৬৪০ খৃষ্টাব্দ) এই মহিষীর পিতা ছিলেন। ইনিও আর্য্যতারা দেবীর অবতার বলিয়া প্রথিতা। এই প্রতিমার মুখের চতুর্দ্দিকে ছটা-চক্র আছে।

পূরণগিরির কথা।—পূরণগিরি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দণ্ডী সন্ন্যাসী, কিন্তু উপবীত-ত্যাগী ছিলেন। তিনি যোশী-মঠে দীক্ষিত হইয়া দশনামী-সম্প্রদায়-ভুক্ত 'গিরি' উপাধিধারী ছিলেন। বাল্যকালে দীক্ষিত হইয়াই তিনি মানস-সরোবর-দর্শনার্থী হইয়া তিব্বতে উপস্থিত হন। মানস-সরোবর-দর্শনার্থী-দিগকে তিব্বতীয় লামার নিকট হইতে 'ছাড়' লইতে হইত। পূরণগিরি সেই অল্প বয়সেই একাকী তশি লামার সহিত দেখা করিয়া ছাড় লেখাইয়া লন। এই হইতে তশি লামার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ছাড়ে সন্ন্যাসীকে তশি লামা 'আচার্য্য পূরণগিরি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (তিব্বতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লিখিত এই ছাড় ভোট-বাগানের বর্ত্তমান মঠাধ্যক্ষের নিকট পাওয়া

গিয়াছে।)" পূরণগিরি গৌরবর্ণ, সুগঠিত, দীর্ঘচ্ছন্দ, দৃঢ়কায় ছিলেন। সচরাচর তাঁহার পরিধানে কৌপীন ও পৃষ্ঠে ব্যাঘ্রচর্ম্ম থাকিত। তবে সময়ে সময়ে 'চোগা' নামক সন্ন্যাসীদিগের অঙ্গরাখা ও পাগড়ি ব্যবহার করিতেন। পূরণগিরি অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিলেন। 'প্রত্যহ অতিথিভোজন শেষ হইলে নিজে আহার করিতেন।' তাঁহার মঠে সকল শ্রেণীর সন্ন্যাসী, ফকির ও ধর্ম্মাত্মা আসিয়া আশ্রয় লইতেন। তিনি তিব্বতীয় স্বর্ণ-বিক্রয়ের গোমস্তা ছিলেন এবং নিজ নামেও কিছু কিছু ব্যবসায় চালাইতেন। এই ব্যবসায়ের লাভের ধন অতিথিসেবায় ও দীন-সৎকারে ব্যয়িত হইত। তিব্বতীয় সন্ন্যাসীরা, তাঁহারই ব্যয়ে বাঙ্গালায় তীর্থদর্শন ও অন্নপানীয়াদি ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। পূরণগিরি যখন তিব্বতে রাজ-কার্য্যোপলক্ষে থাকিতেন, তখন তাঁহার প্রধান চেলা দলজিৎ গিরি, মঠের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এক বার এইরূপ অনুপস্থিতির সময় রাজচাঁদ রায় (রাজা রায়চাঁদ রায় ?) -নামক এক জন জমীদার তাঁহাকে মৃত ভাবিয়া তাঁহার ১৫০ বিঘা জমীর মধ্যে ৫০ বিঘা জমী বল পূর্ব্বক নিজাধিকার-ভুক্ত করিয়া লন। পূরণগিরি, ফিরিয়া আসিয়া টার্ণার ও হেষ্টিংসের মধ্যস্থতায় তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পূরণগিরি, স্বীয় ও বিদেশীয় ব্যবসায় লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মঠে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তিনি স্বর্ণরেণু, বাঁশের ডোল, মৃগনাভি প্রভৃতি তিব্বত হইতে আমদানী করিতেন; আর তুলা, কাপড়, চন্দন, নীল, ছুরী, নস্যধানী ইত্যাদি রপ্তানী করিতেন। প্রবাদ আছে, তিব্বত হইতে প্রতি বৎসর এক মণ স্বর্ণ-রেণু আসিত। ১৬ টাকা ভরি ধরিলে ইহার মূল্য ৫১,২০০ টাকা হইত। তিনি বরাবর ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রিয় ও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর ইতিহাস, অতি শোচনীয়। তিব্বতীয় স্বর্ণের ব্যবসায় হইতে দেশের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল যে ভোটবাগানের মঠে অপর্য্যাপ্ত স্বর্ণ সঞ্চিত আছে।' তখন ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর প্রবল প্রতাপে দেশ-মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। চারি দিকে ডাকাইতির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সন্ন্যাসীর পোষাকে দলে দলে ডাকাইতেরা

দেশের মধ্যে আজ এখানে, কাল ওখানে সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে এক দল ডাকাইত, ভোটবাগানের ধন-লোভে লুব্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া এক রাত্রিতে আসিয়া ঐ মঠে অতিথি হইল। শেষে গভীর রাত্রিতে মঠ-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইলে, পূরণগিরি অমিত সাহসে এক তরবারি হস্তে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু শেষে বহু লোকের আক্রমণে শড়্কি-বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ডাকাইতেরা তাঁহাকে মৃত-জ্ঞানে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিল। কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরাল তন্মুহূর্ত্তে সংবাদ পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ এক দল সেনা পাঠাইলেন। তখন ডাকাইতেরা পলাইয়াছে। রাজ-ব্যয়ে পূরণগিরির চিকিৎসা চলিল, কোন ফল ফলিল না, সাংঘাতিক আঘাতে ১২০২ সালে ২৩ বৈশাখে পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে পূরণগিরির মৃত্যু হইল।

পূরণগিরির পর তাঁহার প্রধান চেলা দলজিৎ গিরি, মঠাধ্যক্ষ হন। তাঁহার যত্নে চারি জন ডাকাইত ধৃত ও ভোটবাগানের মধ্যে ফাঁসিতে হত হয়। ইনিই পূর্ব্বোক্ত সমাধি-স্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৪৩ সালের ৬ই মাঘে ইঁহার মৃত্যু হইলে, ইঁহার প্রধান চেলা কালীগিরি, মোহান্ত হন। ১২৫৪ সালের ১৫ই আশ্বিনে কালীগিরি এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৬৪ সালের ২রা বৈশাখে স্বর্গলাভ করেন। তৎপরে বিলাসগিরি মোহান্ত হন। ১২৬৫ সালে বিলাসগিরিও এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার সহিত মঠাধ্যক্ষতা লইয়া উমারাও গিরি নামক কালীগিরির আর এক চেলার মোকদ্দমা বাধে। মোকদ্দমায় উমারাও গিরি, জয়লাভ করিয়া গদি লাভ করেন। ইনিই বর্ত্তমান মোহান্ত। এখন আর মঠের সে প্রতিপত্তি কিছুই নাই, তিব্বতের সহিত ইহার আর কোন সম্পর্কও নাই। এখানকার পূজাদি এখন অর্দ্ধ-বৌদ্ধ অর্দ্ধ-হিন্দু প্রথায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

চন্দ্রা।

"ছি ছি এমন মেয়েও ঘরে আনে—আমার বাছার সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে"— প্রফুল্লের মা, এই প্রকারে চীৎকার করিয়া পাড়া মাত্‌ করিতেছিলেন, এমন সময় এক প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইল; ন-গিন্নীর ক্রোধের কারণ জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলি, দিদি! কে কি ক'রেছে?"

ন-গিন্নী মুখ ভার করিয়া বলিলেন "আবার কে কর্‌বে? তখনই তাঁকে বলেছিলুম, অমন মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিও না, দিও না; যার বাপ্‌ অমন ছোট লোক, সে কি কখনও ভাল হয়? তোমরাই বাছা বিবেচনা কর, আমার প্রফুল্ল কিছু মন্দ ছেলে নয়; বিয়ের সময় দুটো পাশ করেছিল। তা জীবন ঘোষ বলেছিল, আট শ টাকা নগদ দেবে, আর এ দিকের যেমন দেওয়া নেওয়া আছে—তা বল্‌ব কি, এই টাকার এখনও ৩০০ টাকা বাকী। বলে, আমার বাড়ী বাঁধা পড়েছে—চোর জুয়াচোর"।

প্রতিবেশিনী কহিল—"হাঁ তা বৈ কি, যদি দিতে না পার্‌বে, তা বল্‌লেই তো হ'ত—অমন ভাঁড়া-ভাঁড়ির দরকার কি ছিল?" ন-গিন্নী পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন—"হাঁ বুঝ্‌তেম যদি মেয়েটা ভাল, তা হ'লেও বা কোন কথাই থাক্‌ত না; কিন্তু মেয়েটা এমনই অ-পয়া যে, আমার প্রফুল্ল বিয়ের পর তিন বার একজামিন দিলে, তা তিন বারই ফেল্‌ হ'ল?"

প্রতিবেশিনী বলিল—"ওমা বল কি গো; এমন?"

গিন্নী বলিলেন "সাধে কি আর বলি, আবাগের বেটীকে ঘরে এনে সংসারটা ছারখার হ'য়ে গেল। যে দিন লক্ষ্মীছাড়ীকে ঘরে নিয়েছি, সেই দিন থেকে মা লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে চলে গেছেন। তা' না হ'লে আমার এমন দৈন্যাবস্থা?"

প্রতিবেশিনী গম্ভীর স্বরে বলিল, "তা যা বল, আমার যদি অমন

বৌ হ'ত, আমি ঝাঁটা মেরে' বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতেম—তোমার দয়ার শরীর, তাই ঘরে রেখে চারটি খেতে দিচ্ছ।"

গিন্নী, নরম সুরে বল্লিলেন, "কি করব, মা, মেয়েটার বাপের অবস্থা যা হ'য়েছে, তাতে সে, মেয়ে নিয়ে যেতে চায় না। প্রফুল্লকে এত করে' বলি, তুই আর একটা বিয়ে কর্, তা সে বলে, মা আমায় জলে ভাসিয়ে দিতে চাচ্ছ কেন?"

প্রতিবেশিনী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "ও মা সে কি কথা! লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে, একটি লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ঘরে নিয়ে এখন আবার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করুক—"

গিন্নী, দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"কি ক'রব বল, রোজ-রোজই প্রফুল্লকে ঐ কথা বলি, ও কথা কানেই তোলে না। আর বলব কি, মেয়েটা কি গুণ করেছে। কে জানে, আগেকার মত প্রফুল্লের সে হাসি নাই; সে কথা-বার্ত্তা নাই। দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে, শরীর তো কালী হ'য়ে গেছে।"

প্রতিবেশিনী অনুচ্চ-স্বরে বলিল—"হাঁ গা মেয়েটা তো ভাল নয়? দেখো বাছা, ছেলেকে সাবধানে রেখো, ও বেটীদের অসাধ্য কিছু নাই।" দূরে পদশব্দ হইল। গিন্নী বলিলেন, ঐ বুঝি প্রফুল্ল আসছে, তিন তিন বার ফেল্ হ'য়ে এক বারে মুসড়ে গেছে। আমি বলি, অত ভাবনা চিন্তায় দরকার কি, যদিও নিতান্ত গরীব হ'য়ে পড়েছি, এখন তো এক বেলার খাবার সংস্থান আছে—আমার উর্ম্মিকে চারটি খেতে দিতে পারি তো।"

প্রতিবেশিনী মস্তক নাড়িয়া বলিল—"হাঁ তা বৈ কি।"

প্রফুল্লকে আসিতে দেখিয়া প্রতিবেশিনী, প্রস্থান করিল। প্রফুল্লের বয়স প্রায় দ্বাবিংশ বৎসর; দেখিতে পরম সুন্দর; মুখ খানি সদাই হাসি-হাসি; ইদানীং কিছু গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে।

প্রফুল্ল আসিয়া শান্তভাবে বলিল, "মা কোথাও তো যোগাড় করিতে পারিলাম না। একটা সওদাগরী আফিসে মাইনে মাসে ১২৲ টাকা, কিন্তু এপ্রেণ্টিস খাটিতে হইবে দু-বৎসর; সেখানে তো কাজ করা হয় না। গবর্ণমেণ্ট আফিসে বড় বড় বি এ, এম এ চাকরী পায় না, তা আমি পাব?"

প্রফুল্লের মাতা বলিলেন, "তাই তো, কি হ'বে ভেবে পাচ্ছি না—তাই তো, সে কাজটা না কর্‌লে আর ভাল হ'বার উপায় নাই। আচ্ছা এখন থাক্—তোকে সে কথাটা বল্‌ব এখন, এখন খাবি চল্।"

প্রফুল্ল, আহারার্থে মাতার সহিত চলিয়া গেল।

(২)

রামশরণ মিত্র, একটা সওদাগরী আফিসে কার্য্য করিতেন। মাসে বেতন যাহা পাইতেন; তাহার উপর "উপরি" কিছু থাকাতে সংসারটা এক রকম করিয়া চলিয়া যাইত। প্রফুল্ল এবং উর্ম্মিলা তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং কন্যা। উর্ম্মিলার বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন সে বিধবা হয়। সে কষ্ট, রামশরণ বাবু সহ্য করিতে পারিলেন না। একমাত্র কন্যার বৈধব্য-দশায় তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তিনি প্রবল-হৃদয়বেগে এবং শিরঃ-পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর পরে প্রফুল্লের বিবাহ দিলেন। তিনি কন্যার পিতার নিকট হইতে আদৌ টাকা লইতে অস্বীকৃত হইলেন। উর্ম্মিলা বিধবা হইবার পর হইতেই অর্থের উপর তাঁহার কেমন একটা বিতৃষ্ণা হইয়া গিয়াছিল। উর্ম্মিলার শ্বশুর, জোর করিয়া রামশরণের নিকট হইতে অনেক টাকা আদায় করিয়াছিলেন। এ দিকে গৃহিণী, উর্ম্মিলার বিবাহের সময় অনেক টাকা খরচ হওয়াতে, প্রফুল্লের বিবাহে তাহা আদায় করিয়া লইতে হইবে স্থির করিয়া অনেক টাকা চাহিয়া বসিলেন; প্রফুল্ল ভাল ছেলে, অমন পাত্র প্রায় পাওয়া যায় না, সুতরাং বাটী বন্ধক রাখিয়া ও কর্জ্জ করিয়া জীবন বাবু কন্যা চন্দ্রার বিবাহ দিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া প্রতিশ্রুত সমস্ত টাকা দিতে পারেন নাই। গৃহিণী, সে রাগ কখন ভুলিতে পারেন নাই। যখন তখন সেই কথা উত্থাপন করিয়া চন্দ্রার পিতাকে গালি দিতেন। রামশরণ বাবু দুঃখিত হইয়া বলিতেন, দেখ ও টাকায় কি বড়মানুষ হ'তে চাও, যথাসাধ্য চেষ্টা করে' যা, তিনি দিয়েছেন; তাই আমরা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব কি না, সন্দেহ! উর্ম্মিলার বিয়ের কথা মনে নাই? তোমার গয়না বাঁধা

দিয়েও টাকা হয় না, শেষে বাটী বেচ্‌তে যাচ্ছিলাম, হরি বাবু টাকা ধার দিলেন, তাই ভদ্রাসনটা রক্ষা হ'ল।"

গৃহিণী অত্যন্ত চটিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই তো বলি, উর্ম্মির বেলা আমাদিগে যেমন যন্ত্রণা দিয়েছে, প্রফুল্লের বেলা সেই রকম যন্ত্রণা দিতে পারি, তবে রাগ যায়।"

রামশরণ বাবু হাস্য করিয়া বলিলেন—"কার রাগ কার উপর ফেলেছ? উর্ম্মির শ্বশুরের উপর রাগটা কি প্রফুল্লের শ্বশুরের উপর ফেল্‌বে?"

গৃহিণী পরাস্ত হইয়া বলিলেন, "তা কি, তা কি—আমার প্রফুল্ল"—

রামশরণ বাবু গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "দেখ গিন্নী, ব্যবসাদারের মত এমন ক'রে টাকা নিলে কি কখন কারও ভোগে আসে? তুমি জান না বোধ হয়, আমি জানি। যে যত গুলি টাকা জোর করিয়া লয়, তাহার একটি টাকা এক একটি অশ্রুবিন্দু! পাপের পয়সা কি সয়? দেখ দেখি, আজ বিধাতার নির্ব্বন্ধে উর্ম্মি আমার বিধবা; উর্ম্মি'র শ্বশুর এখন টাকার কথা ভাব্‌ছে, না ছেলের কথা ভাব্‌ছে—"ও টাকা কারও সয় না, কারও সয় না।"

গৃহিণী লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "ও মা তুমি ও কি অলক্ষুণে কথা মুখে আন্‌ছ? আমি কি তাই বলেছিলেম?"

রামশরণ বাবু পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন, "তুমি যদি বল আর নাই বল, টাকা টাকা ক'রে ক্ষেপ না। লোকটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক'রে টাকা যোগাড় করেছিল বল তো? রূপ তো অমন দেখা যায় না, কাজ-কর্ম্মের দোষ ধর্‌বার যো নাই। কেবল তোমার কথাতেই টাকা নিতে হ'ল।"

গৃহিণী অভিমানে ও ক্রোধ-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন—"আমার যত দোষ। কে তোমায় টাকা নিতে বলেছিল? মেয়ে ভাল হ'লে কি হয়? টাকা না হ'লে কি হ'বে? আমার ছেলে ছটো পাশ ক'রে তিনটে পাশ দিয়েছিল, লোকের কাছে কি ক'রে মুখ দেখাতুম বল তো।"

রামশরণ বাবু বলিলেন, "থাক্‌ ও সব কথায় আর দরকার নাই। একটী

কথা বলি, পরের টাকার জন্য অমন ক'রে আর ভেবো না।" "আমি নিজে "খেটে দু পয়সা আনতে পারি, তাই যথেষ্ট ব'লে মেনো। জোর ক'রে টাকা নেওয়া যা, আর এক জনের বুকে ছুরি মেরে তার টাকা কড়ি কেড়ে নেওয়াও তা।"

গৃহিণী, বেগতিক দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

রামশরণ বাবু কি ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

(৩)

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রামশরণ বাবুর যে হৃদ্‌রোগ হইয়াছিল, তাহাই কাল-ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখান হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। প্রায় ছয় মাস রোগে ভুগিয়া রামশরণ বাবু ইহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন; প্রফুল্লকে বলিয়া গেলেন, "বাবা চিরকাল ধর্ম্ম-পথে থেক, সকলকেই সমান যত্ন আদর করিও; উর্ম্মিকে দেখো। বাছা আমার বড় অভাগিনী।

ক্রন্দনের রোল উঠিল। উর্ম্মিলার ক্রন্দন বড়ই হৃদয়-বিদারক হইল। প্রফুল্ল দেখিল, তাহার মস্তকে সংসারের দারুণ ভার পতিত হইল। সকলের আকুল ক্রন্দন তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলিল।

শোক চিরকাল থাকে না। দেখিতে দেখিতে শোক চলিয়া গেল। রামশরণ বাবুর নাম অনেকে ভুলিয়া গেল; কিন্তু সেই অবধি প্রফুল্লের মুখ আর প্রফুল্ল হইল না।

যে বৎসর বিবাহ হয়, সে বৎসর প্রফুল্ল বিএ পরীক্ষা দেয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে সে বৎসর ফেল হয়। পরীক্ষার দিন কতক পূর্ব্বে জোর করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। যে সময় আত্মীয়-স্বজন পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল—"দেখিব ক'নের কেমন গুণ, যদি পাশ হ'য়ে যায়, তবেই জানব মেয়ে পয়া।" এ কথাটি বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছিল প্রফুল্লের মাতা কর্ত্তৃক। তাঁহার ধারণা ছিল, প্রফুল্ল ভাল ছেলে, কোন বারে ফেল হয় নাই, সুতরাং

এই বারও পাশ হইয়া গেলে ভাল বৌ ঘরে আনিয়াছি বলিয়া লোকের নিকট জোর করিয়া গর্ব্ব করিতে পারিব।

কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, তাঁহাদের দম্ভ একবারে বিলুপ্ত হইল; যাহারা তাঁহাদিগের ভাল দেখিতে পারিত না, তাহারা এখন উচ্চকণ্ঠে হিংসা-বশবর্ত্তী হইয়া বৌর নিন্দা করিতে লাগিল। প্রফুল্লের মাতাও দিবা-রাত্র ঐ সমস্ত গঞ্জনা সহ্য করিয়া নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন।

পর বৎসর রামশরণ বাবুর অত্যন্ত পীড়া হইল, সুতরাং ভাল রকম পাঠাভ্যাস করিতে না পারিয়া প্রফুল্ল সে বার পরীক্ষা দিতে পারিল না এবং দিন কয়েক পরে রামশরণ বাবুর মৃত্যু হওয়াতে, লোকে আরও বৌর নিন্দা করিতে লাগিল। প্রফুল্লের মাতার এখন যাহারা খুব আত্মীয়, কেবল তাহাদিগের নিকট বৌর গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া প্রফুল্লের পিতার দোষ দিতে লাগিলেন। প্রফুল্লের কর্ণে মধ্যে মধ্যে এ সমস্ত কথা উঠিত।

তৃতীয় বৎসরে প্রফুল্ল প্রাণপণে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। দিবারাত্র গুরুতর পরিশ্রম করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। পরীক্ষালয়ে উত্তম রূপে পরীক্ষা দিয়া আসিল। সকলেই বলিতে লাগিল, এবার অনুত্তীর্ণ হইবার কোন শঙ্কা নাই।

কিন্তু ফল বাহির হইল; গেজেটে নাম পাওয়া গেল না। মাতা যত ক্রোধ বৌর উপর নিক্ষেপ করিলেন। এখন সকল লোকেরই নিকট চীৎকার করিয়া বৌর নিন্দাবাদ করেন। প্রফুল্ল আগেও ভাল রকম দুটো পাশ করেছে; যেমন ওটাকে বিয়ে করেছে এক বার নয়, দুই বার নয়, তিন বার।

প্রফুল্ল কথাগুলি শুনিতে পায়, কিছুই বলে না। পরীক্ষার প্রতি তাহার কেমন বিতৃষ্ণা হইয়া পড়িল। ও দিকে দারিদ্র্য দেখা দিল। রামশরণ বাবু সামান্য যা কিছু সংস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার পীড়ায় তাহা সমুদয় ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। অধিকন্তু বাটীটিও বাঁধা পড়িয়াছিল। সুতরাং প্রফুল্লকে বাধ্য হইয়া এখন সামান্য চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল।

প্রফুল্লের মনে কত উচ্চ আশা, কত উৎসাহ ছিল। এই একটি পরীক্ষা, তাহা চিরকালের নিমিত্ত নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ করিয়া দিল।

আজ কাল যে রূপ অবস্থা হইয়াছে, বিদ্যালাভ করিলেও সামান্য একটি চাকুরি পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষতঃ প্রফুল্লের মুরুব্বি কেহ ছিল না; সুতরাং অনেক যত্ন চেষ্টা করিয়াও একটি চাকুরির যোগাড় হইল না।

কিন্তু এ দিকে মাতার গঞ্জনার নিবৃত্তি হইল না।

(৪)

প্রফুল্ল বিষন্ন মনে ঘরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রা মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। ভারি কষ্ট হইল, ধীরে ধীরে বলিল, "চন্দ্রা!"

চন্দ্রা শুনিতে পাইল না; প্রফুল্ল আবার বলিল, "চন্দ্রা কেন কাঁদ্‌ছ ?"

চন্দ্রা শুনিতে পাইয়া চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, তাড়াতাড়ি মুখ মুছিয়া বলিল—"তুমি কত ক্ষণ এসেছ ?"

প্রফুল্ল বলিল, আমি এইমাত্র আস্‌ছি—চন্দ্রা! তুমি কাঁদ্‌ছিলে কেন বল না ?"

চন্দ্রা কিছু বলিল না, মুখ নত করিয়া রহিল।

প্রফুল্ল তাহার হাত খানি ধরিয়া বলিল, "চন্দ্রা, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি কেন তুমি কাঁদ্‌ছিলে, কি ক'র্‌ব, বল এত চেষ্টা পরিশ্রম কর্‌লে, তা এক বারও কেউ ভাব্‌লে না, যত দোষ তোমার উপর ? তা আমি সহ্য কর্‌তে পারি না"—

চন্দ্রা চক্ষের জল বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না—দর-দর-বেগে অশ্রুবারি পতিত হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কেঁদ না, তুমি কেঁদ না। তুমিই আমার আশা-ভরসা, তুমিই আমার উৎসাহ। তোমাকে কাঁদ্‌তে দেখ্‌লে আমার কোন কাজে প্রবৃত্তি হয় না।"

চন্দ্রা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুমি কেন আমায় বিয়ে ক'র্‌লে ?"

বালিকার সরল কথা শুনিয়া এত দুঃখেও প্রফুল্লের হাসি আসিল, বলিল—"তা হ'লে বল, আমায় তোমার মনে ধরে না ?"

চন্দ্রা, জিভ্ কেটে ব'ললে—"আ! ছি, ও কি কথা! আমি কি তাই বল্‌ছি ? আমি বল্‌ছি, তা' হ'লে তোমাকে এত যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে হ'ত না।"

প্রফুল্ল গম্ভীর স্বরে বলিল—"দেখ, আমি নিজের জন্য কিছু চিন্তা করি না, মা যা বলেন, তা যতদূর পারি সহ্য কর্‌ব, কিন্তু আমার দোষের সঙ্গে তোমার নাম শুনলে বাস্তবিক ভারি কষ্ট হয়। তোমায় বিয়ে করেছি ব'লে কি সব দোষ তোমার ?"

চন্দ্রা কিছু বলিতে পারিল না। অজস্র অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রফুল্ল বলিল—"আবার বলি, তুমি কেঁদ না। মা যতই কেন বলুন না, তা নীরবে সহ্য কর্‌বে—এটা মনে রেখো, এক দিন না এক দিন আমাদের কষ্ট দূর হবেই। আমি তো চেষ্টার কিছু ত্রুটি কর্‌ছি না। এ বার ২ নম্বরের জন্য ফেল হইয়াছি, তাতে কম কষ্ট হয় ? চাকুরির জন্য এত লোকের খোসামোদ কর্‌ছি, কিন্তু কেউ তো চাকুরি দিতে চায় না। মা কেবল টাকা টাকা ক'র্‌ছেন—টাকা রোজগার করা বড় কষ্টকর, তা' তো তিনি জানেন না ?"

চন্দ্রা চক্ষু মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আজ যেখানে গেছ্‌লে, সেখানে কি হ'ল ?" প্রফুল্ল বিষন্ন-বদনে বলিল, যা হবার, তাই হ'ল। কেও চাকুরী দিতে চায় না।" কাল্ এক জায়গায় যাই, দেখি কি হয়। কিন্তু এ যন্ত্রণা তো আর সহ্য হয় না।"

এমন সময় মাতা আহার করিতে ডাকিলেন। প্রফুল্ল উঠিয়া গেল—চন্দ্রা একমনে কি চিন্তা করিতে লাগিল।

(৫)

"ডান্ বেটী নিশ্চয়ই আমার ছেলেকে খেয়ে ফেলেছে" প্রফুল্লের মাতা চীৎকার করিয়া চন্দ্রার উদ্দেশে এই কথাগুলি বলিলেন। ঊর্ম্মিলা কাছে বসিয়াছিল। সে বলিল "ও কি কথা মা! তোমার কথার কি ঠিক নাই, আপনার বৌকে যা তা বল্‌ছ ?"

মাতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যা যা ছুঁড়ী তোকে আর কথা কইতে হ'বে না। এমন মেয়ে কেন ঘরে নিয়ে এলুম, আমার ছেলের সর্ব্বনাশ কর্‌লে—আমি ব'লে দিচ্ছি। ও থাকৃতে সংসারের কখনও ভাল হ'বে না—ওর দৃষ্টি পড়েছে, দৃষ্টি পড়েছে—।"

ঊর্ম্মিলা বকুনি খাইয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না। বিষণ্ণ বদনে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

মাতা ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হতভাগী! এ সংসারে কেন ঢুকেছিলি? বাপের বাড়ীতে তো মর্‌তে কেউ নাই যে সেখানে ফেলে দিয়ে আস্‌ব। ঝাঁটা মেরে, তাড়িয়ে দাও, রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে থাক্—"এমন সময় সমস্ত দিন চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত হইয়া প্রফুল্ল বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সে আসিতে আসিতে বুঝিতে পারিয়াছিল, ব্যাপার কি—মাতার শেষের দু এক কথা শুনিতেও পাইয়াছিল।

আজ কেন কি জানি এ কথাগুলি তাহার হৃদয়ে বড় বাজিল। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই অভিমান-ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা! কি হ'য়েছে—কে কি ক'রেছে?"

মাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান ছিল না, বৌর উপর যা ক্রোধ হইয়াছিল, সমস্ত পুনরুদ্দীপিত করিয়া বলিলেন, "হবে আবার কি, তুই কোথাকার এক্‌টা অপয়া, রাস্তার মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে সংসারটাকে ছার খার কর্‌লি।"

মাতা, পরোক্ষে নিন্দা করিলেও কখন প্রত্যক্ষে—প্রফুল্লের সম্মুখে—চন্দ্রার নিন্দা করিতে সাহসিনী হইতেন না। আজ অত্যধিক ক্রোধেই তিনি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

সে দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রফুল্লের মস্তক উত্তপ্ত হইয়াছিল; বিশেষতঃ নির্দ্দোষিণী চন্দ্রার প্রতি গালি-বর্ষণ শুনিয়া তাঁহার মনে ভয়ানক ক্রোধ ও অভিমান হইল, বলিল "ও কি কথা মা! তোমরা দেখে শুনেই বিয়ে দিয়েছিলে; ওর কি দোষ, ও কখনও তোমার অবাধ্য হয় নাই, কখনও

তোমাকে কটু কথা বলেনি, কোন ও দোষ নেই। তুমি কত দিন থেকে ওকে যা'চ্ছে তাই বল্‌ছ, তার কারণ কি বলত? যা' কিছু দোষ সব আমার; ওকে অমন মিথ্যা গালাগালি দাও কেন?"

মাতা এতটা উত্তর কখনও আশা করেন নাই, সুতরাং তাঁহার ক্রোধও শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, বলিলেন "ওর দোষ নয়ত কার দোষ? তুইও যেমন ওও তেম্‌নি! কথার জবাব দিচ্ছিস কি,? জানিস্‌ আজ খাবার কিছু নেই? তিন বচ্ছর তোকে পড়ালুম,তাতে কত দেনা হয়েছে, সুদ্‌ বে.কে? তিন তিন বার ফেল হ'লি,তাতে লজ্জা নেই,টাকাও রোজ্‌গার কর্ত্তে পাল্লিনে।ও ছুঁড়ির দোষ নয় ত' কার দোষ? আ মর্‌—।"

প্রফুল্লের মনে বড় কষ্ট হইল। আরও কিছু বলিবে মনে করিয়াছিল এমন সময় ঊর্ম্মিলা আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল।

প্রফুল্লের মাতা এত দূর যাইতেন না, তবে রাগের মাথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—রাগে গর্‌ গর্‌ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রফুল্ল ঘরে গিয়া দেখিলেন চন্দ্রা ভয়ে ম্রিয়মান হইয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল যাইতেই চন্দ্রা নিকটে আসিয়া বলিল "কেন মার সঙ্গে তুমি ঝগ্‌ড়া ক'র্‌লে—উনি খালি রাগের মাথায় বলেছিলেন বৈ তো নয়?"

প্রফুল্ল গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল—"কি ক'র্‌ব বল? যত দূর সহ্য কর্‌বার করেছি—আজ খেটে খুটে আস্‌ছিলাম, হঠাৎ এই অত্যাচার দেখে আর সহ্য ক'র্‌তে পারলুম না, মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে গেল। কিন্তু দেখ চন্দ্রা, তোমার কষ্ট আর আমি সহ্য কর্‌তে পারি না।"

প্রফুল্ল আজ বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। ইহা কেবল মাতার প্রতি অভিমানাশ্রু-মাত্র!

চন্দ্রা চোখ মুছাইয়া বলিল, "দেখ তুমি,কেঁদ না। যা হবার হ'য়ে গেছে, এর জন্য আর ভাবনা কি?"

প্রফুল্ল কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"না চন্দ্রা, আর নয়! আর

আমি এখানে থাক্‌ব না। আজ আমার মনে ভারি কষ্ট হয়েছে। আজই আমি এখান থেকে চাকরির চেষ্টায় বিদেশে চ'লে যাব।'

চন্দ্রা আকাশ থেকে পড়িল। সে এতটা মনে করে নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল "ওগো সে কি কথা"—

আর কথা বাহির হইল না।

প্রফুল্ল পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল—"শোন চন্দ্রা, আমি পশ্চিমে যাব; সেখানে গিয়ে টাকা রোজগার ক'রে তবে দেশে ফির্‌ব, এতে তুমি বাধা দিও না।"

চন্দ্রা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—ও গো তুমি ও কথা আর ব'লো না, তুমি এই খানে থাক, আর কোথাও যেও না। আমার যে ১২ বার খানা গয়না আছে, সেই কখান বেচে বরং এই খানে থেকেই চাকরির চেষ্টা দেখ।"

প্রফুল্ল বলিল—"চাকরির চেষ্টা!—এই খানে থেকে চাকরির চেষ্টা! না না তুমি জান না, আমি কত পরিশ্রম ক'রে চাকরির চেষ্টা করেছি, লোকের দ্বারে দ্বারে কেবল ভিক্ষা কর্‌তে বাকী রেখেছি মাত্র। সকলে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার মুখ খানি ভেবে সে সমস্ত দারুণ অপমান সহ্য ক'রেছি। কিন্তু আজ তার যে পুরস্কার পেয়েছি, তাতে এক দণ্ড আর এ বাড়ীতে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। কোন দূর দেশে গিয়ে টাকা উপার্জ্জন ক'রে নিয়ে আস্‌ব।"

চন্দ্রা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—"ওরা বল্‌লেই বা, তা ব'লে তোমার রাগ করা উচিত নয়।"

প্রফুল্ল বলিল—"রাগ? আমি কারও উপর রাগ করি নাই, আমার নিজের উপর রাগ করেছি মাত্র। সত্যিই বলি চন্দ্রা! আমি এত বড় হয়েছি, আমি আজ পর্য্যন্ত এক পয়সা উপার্জ্জন কর্‌তে পার্‌লেম না! এ কি কম লজ্জার কথা? তাই বলি, আর এখানে থাক্‌ব না; তুমি বাধা দিও না। তুমিই আমার উৎসাহ। আজই এ বাড়ী ছেড়ে যাব।"

অনেক কথা বার্ত্তার পর চন্দ্রা স্বীকৃতা হইল।

চন্দ্রা নিজের খানকয়েক গহনা বাহির করিয়া স্বামীকে দিতে গেল। প্রফুল্ল বলিল, "না, তা নিতে পার্‌ব না ; তা কখনই নেব না।"

চন্দ্রা বলিল, দেখ আমি তোমার কথা রাখ্‌লুম, আমার একটা সামান্য কথা রাখ। এই ক'খানা নিয়ে যেতে হ'বে। পথে কত টাকার দরকার হবে, কে দেবে ? আর তুমি শেষে শোধ দিলে দিতে পার্‌বে, এখন নিয়ে যাও।"

প্রফুল্ল গহনা ক'খানি লইল। আস্তে আস্তে উর্ম্মিলাকে ডাকিয়া সব কথা বলিল। উর্ম্মিলা অনেক নিষেধ করিল এবং কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু প্রফুল্ল অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা দিয়া মত করাইল। বলিল—"উর্ম্মি, চন্দ্রাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুমিই ওর যত্ন ক'রো, দেখো শুনো। মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে ব'লো, আমার জন্য যেন চিন্তিতা না হন, আমি শীঘ্রই ফিরে আস্‌ব।"

প্রফুল্ল এক বার ঘরে গেল ; দেখিল চন্দ্রা কাঁদিতেছে। প্রফুল্ল বলিল "চন্দ্রা তা হ'লে আমার যাওয়া হয় না—সৎকাজে তুমি আমাকে উৎসাহ দাও। তুমি কাঁদ্‌লে আমি যেতে পার্‌ব না।" কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, চন্দ্রা আমার জন্য ভাব্‌বে না বল, আমি শীঘ্রই আস্‌ব।" চন্দ্রা, চক্ষু মুদিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল—তুমি "শিগ্‌গির শিগ্‌গির চিঠি লিখ্‌বে বল।"

প্রফুল্ল বলিল—"হাঁ।"

প্রফুল্ল, পত্নীকে এক বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া একটি সস্নেহ চুম্বন করিয়া বলিল—"তবে যাই চন্দ্রা—"। চন্দ্রা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বলিল—"আচ্ছা।"

দ্বিপ্রহর রাত্রে প্রফুল্ল বাড়ী পরিত্যাগ করিল। জানালার সম্মুখে রাস্তা। চন্দ্রা দেখিল, স্বামী একবস্ত্রে ধীর পদে রাস্তা দিয়া চলিয়াছেন—চন্দ্রের আলোকে তাঁহার বসন শুভ্রতর দেখাইতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রফুল্লের কেবল শ্বেত বস্ত্র দেখা যাইতে লাগিল—অল্প পরে আর তাহাকে দেখা গেল না।

চন্দ্রার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইল। চন্দ্রা, কাঁদিতে লাগিল। কুসুমিত মাধবী-লতা পবন-তাড়িত হইয়া সহকার-শাখা-বিচ্যুতা হইয়া পড়িল। কে বুঝিবে, সেই বালিকা-হৃদয়ের

যাতনা কত! চন্দ্রার সমদুঃখ-ভাগিনী ধরিত্রীর সুগভীর নিশ্বাসের ন্যায় মলয়-সমীরণ, চন্দ্রকিরণ বিধৌত বৃক্ষ-পত্র কম্পিত করিয়া বহিয়া গেল। চন্দ্রা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল। চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু, চন্দ্র-কিরণে মুক্তাবৎ প্রতিফলিত হইল। সুন্দরী হইতে সুন্দরীর নয়নে অশ্রু কি মধুরতর!

যতীন্দ্রনাথ বসু।

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত।

(সখের থিয়েটার।)

১। বিদ্যাসুন্দর—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ (১২৪৭ সাল)।

—অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটক প্রচলিত ছিল। সুতরাং সে সকল নাটকের অভিনয়ও যে হইত,ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিলেও চলে। ভবভূতি প্রভৃতি গ্রন্থকারের প্রণীত নাটকগুলির ভারতবর্ষে যে অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহারি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। সময়-ক্রমে আমরা সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিব। ইয়ুরোপীয়েরা তাহার বহু-কাল-পরে নাটকাভিনয় করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কোন কোন ইয়ুরোপীয়ের মতে, ভারতীয় নাটকাভিনয়, ইয়ুরোপীয় নাটকাভিনয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী নয়, বরং পরবর্ত্তী। অবকাশ-ক্রমে,আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিব। সম্প্রতি এই প্রবন্ধে, বঙ্গীয় নাটকাভিনয়ের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইতেছে। এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে আমরা যথা-সাধ্য-পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করি নাই। এই সূত্রে আমরা কতিপয় ব্যক্তির নিকট, অনেক সাহায্য পাইয়াছি। বর্ত্তমান রাজকীয় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট, অবৈতনিক নাট্য-সমাজ-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রথম ও প্রধান সাহায্য পাইয়াছি। প্রাচীন নটকুল-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও, আমাদিগকে বিস্তর বিবরণ দিয়াছেন। এ জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। "কৈলাস-কুসুম"-"বিমুক্ত-বেণীবন্ধন"-"মণিমন্দির"-

প্রভৃতি-প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মৎ-সম্পাদিত "পুরোহিত" পত্রিকার অন্যতম লেখক বাবু নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ও চোর বাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরির সম্পাদক ও নানাগ্রন্থ প্রণেতা বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার* এই তিন ব্যক্তির সকাশেও ও কোন না কোন বিষয়ে আনুকূল্য লইতে হইতেছে। পেশাদার থিয়েটার-সমুদায় সম্বন্ধে অধ্যক্ষগণের নিকট হইতে যে পরিমাণে সাহায্য পাইতেছি, তাহা এখনও অসম্পূর্ণ। সুতরাং কাহার নিকট, কি পরিমাণে শেষ পর্য্যন্ত উপকার পাওয়া যাইবে, তাহা না পাইলে ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে না। যথাস্থানে ও যথাসময়ে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করিতে বিমুখ হইব না।

১২৪৭ সালে (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গ-দেশে নাট্যাভিনয়ের প্রথম সূচনা হয়। তৎপূর্ব্বে রঙ্গভূমির গন্ধ-বাস্পও ছিল না। বঙ্গীয় সমাজে তখন তাহার নামো-চ্চারণ-মাত্রও ঘটে নাই। ক্রমে ক্রমে উত্তর কালে নানা জনপদে যে সকল অবৈতনিক নাট্য-সমাজ স্থাপিত ও সুখ্যাতি-সহকারে অভিনীত হয় তাহাদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ক্রমোন্নতির পরিচায়ক নিয়মিত ইতিহাস লেখা দুঃসাধ্য। বিশেষ মাদৃশ হীন-জনের পক্ষে তাহা দুরূহ। সালের পর সাল, মাসের পর মাস, তারিখের পর তারিখ, ঘটনার পর ঘটনা, ধারাবাহিক নিয়মে নিবদ্ধ করা অসম্ভব। সেই প্রাচীন কালের বৃত্তান্ত যথাযথ লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা, মানবের অনায়ত্ত। চেষ্টা করিয়া তাহাতে কৃতার্থ হওয়ার অভিলাষ বিফল-প্রয়াস। কার্য্য যেমন গুরুতর, তাহার কর্ত্তা, তেমন প্রবীণ বা নিপুণ নহেন।

পূর্ব্বোক্ত সময়ে (অর্থাৎ ১২৪৭ সালে) বঙ্গীয় মহাকবি ভারতচন্দ্র রায়ের সর্ব্বজনপ্রিয়, বিশ্রুত-কীর্ত্তি "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যের অভিনয়ের সূত্রপাত হয়। শ্যামবাজার-নিবাসী বাবু নবীনচন্দ্র বসু, কলিকাতা-স্থিত কোন উদ্যানকে "বিদ্যাসুন্দর" অভিনয়ের তৎকালের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার এই তৎকালোচিত নির্ব্বাচন, সময়োচিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। ইহাই কলিকাতায় বঙ্গীয় নাট্যের সর্ব্ব-প্রথম অভিনয়। সে সময় দৃশ্য-পট কি বস্তু, নাটকীয় পাত্রগণের সাজ-সজ্জা কিরূপ হওয়া উচিত,

* শ্রীমান্ শরচ্চন্দ্র সরকারও, "পুরোহিত" পত্রের লেখক ও প্রকাশক।

ঐকতান-বাদন-প্রবর্ত্তন, ঐকতান-বাদনই বা কি ইত্যাদি বিষয়ের বঙ্গীয় সমাজে কোন আলোচনা হইয়াছিল কি না সন্দেহ।

সেই প্রাচীন সময়ের পক্ষে প্রকৃতি-দেবীর অনুগ্রহ বিনা সুকুমার-কারু-কার্য্য-সম্পন্ন শিল্প-নৈপুণ্য সম্ভব হইতে পারে না। তাই উদ্যানস্থ তরু-গুল্ম-লতা-শষ্প-সরোবর ইত্যাদি নৈসর্গিক বস্তুকে দৃশ্য-পটের স্থানীয় করিতে হইয়াছিল। এখন চিত্র দ্বারা অঙ্কিত করিয়া কৃত্রিম উপায়ে যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে, তখন তাহা স্বাভাবিক বস্তুর উপর নির্ভর করিয়াছিল। ঐ অভিনয়ের সময়ে মৃত্তিকা খনন করিয়া যথার্থ-সুড়ঙ্গ করা হইয়াছিল। জলাশয় যে দৃশ্যের অন্তর্গত, সেই দৃশ্যে উদ্যানের একদেশে দর্শকদিগকে প্রকৃত পুষ্করিণী দেখান হইত। দর্শকগণ পুস্তকপাঠে জানিতেন, কাহার পর কি হইবে, সে জন্য একাংশের অভিনয়ের পর অপরাংশের অভিনয়ের সময় উক্ত দৃশ্য স্থানে তাঁহারা উঠিয়া যাইতেন। একটা কোন আশ্চর্য্য বিষয় সংঘটিত হইবার সময়ে আমরা যেমন উদ্গ্রীব হইয়া থাকি, তখনও সেইরূপ হইত এবং উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইবার সময়, দর্শক-বৃন্দ তথায় উপস্থিত হইতেন। আবার যখন বৈঠকখানা বা রাজপ্রাসাদ, অপর সুরম্য হর্ম্ম্য, দুঃখিনী মালিনীর অসুন্দর কুটীর দেখাইতে হইবে, তখনও স্থানে স্থানে যথাবৎ প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল নৈসর্গিক দৃশ্য, এক স্থানে আসীন হইয়া দ্রষ্টাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং ঐ অভিনয়ে দর্শকেরা উপবেশন-স্থান হইতে উঠিয়া গিয়া, কখন স্থানান্তরে 'সুন্দর'-খনিত সুন্দর সুড়ঙ্গ দেখিতে যাইতেন, আবার নিজ নিজ আসনে আসিয়া উপবেশন করিতেন। তথা হইতে কখন রাজপ্রাসাদ, কখন বা জলাশয়, কখনও প্রান্তর, কখনও বা শস্য-শ্যামল শাদ্বল ক্ষেত্র ইত্যাদি নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া পুলকিত হইতেন। এ এক বড় মজার অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

সেই নাট্যাভিনয়ে অভিনেতৃ ও অভিনেত্রীদের একত্র সম্মিলন প্রথম ঘটিয়াছিল। যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করা

অসম্ভব মনে করিয়াছিলাম। তদ্বিষয়ানুসন্ধানে সেই পুরাতন কাহিনীর যত দূর উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, নর-নারী-সম্মিলন সে অভিনয়ের অবিষয়ীভূত নয়। প্রথমাবস্থায় কোন কার্য্য, সচারাচর সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন হয় না। সুতরাং এখনকার তুলাদণ্ডে তখনকার কার্য্য-গুলি, ওজন করিলে এক দিকে যেমন কোন কোন অংশে নাটকীয় হীনতা, অসম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হইবে, তেমনই অপর দিকে নয়নারাম কোন কোন বিষয় দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা অণুবীক্ষণের সাহায্যে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঐ ঘটনা দেখিতে চান, তাঁহাদের নিকট কোন কোন দোষ প্রতীয়মান হইবে বটে, কিন্তু যাঁহারা দূরবীক্ষণের সাহায্যে সেই দৃশ্য-পট প্রভৃতির আকৃতি দেখিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট ঐ অভিনয়ের এমন কতকগুলি সুন্দর দৃশ্য প্রতীয়মান হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ের উন্নত কারুকার্য্যে ও বিপুল অর্থব্যয়ে তাহা সম্পাদিত হইবে না। এইরূপে নাটকোচিত ও অ-নাটকোচিত কতিপয় বিষয়ের সংযোগে ঐ অভিনয়-ক্রিয়া, সাধিত হইয়াছিল।

প্রবাদ আছে, এই অভিনয়ে উক্ত উদ্‌যোক্তা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতার প্রাচীন খানাবাড়ী নামক স্থান—বর্ত্তমান মিলিটারি একাউণ্টস্ (Military Accounts) এই ব্যক্তির অধিকৃত ছিল। উক্ত অভিনয়ের ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য এরূপ বিস্তৃত আয়ের সুবিশাল সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া যায়। এই রূপ কিংবদন্তী, বজ্র বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুর প্রদর্শনার্থে বিলাত হইতে নাকি তড়িৎ-সংক্রান্ত দ্রব্যাদি এবং নানাবিধ কল-কারখানা আনয়ন করিতে বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়ে নাটকের এক এক অংশ, এক এক দিন অভিনীত হইত।

শ্যামবাজারে যেখানে এখন ট্রামওয়ে আস্তাবল হইয়াছে, ঠিক ঐ স্থানে কিংবা উহার খুব নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ধনাঢ্য ব্যক্তি ঐ বিষয়ের উদ্যোগী বাবু নবীনকৃষ্ণ বসু বসতি করিতেন। রঙ্গমঞ্চে বা কোন দৃশ্যপটের সাহায্যে তখন অভিনয় হইত না। প্রকৃতিকে, দৃশ্যপটের স্থানীয় করিয়া একটি বৃহৎ উদ্যানে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, অভিনেতৃবর্গ ও অভিনেত্রীগণ, অভিনয়

করিতেন। ইহাতে অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় হইত। নবীন বাবুর বিষয় আশয় ভূরি-প্রমাণ ছিল। কি ভূমি-সম্পত্তি, কি নগদ টাকা, কি বাড়ী-ভাড়ার আয়—সকল বিষয়েই লক্ষ্মী যেমন অচলা। কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী কত কাল একের নিকট স্থির থাকিতে পারেন? কখন কোন্ দুর্লক্ষ্য উপলক্ষে তিনি বাহির হন! তাঁহার আগমন ও গমন বোঝে, মানুষের এমন সাধ্য কোথায়?

যাঁহারা বিদ্যাসুন্দরাভিনয়কে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা তাহার অভিনয়কেও তদর্থেই অসফল বলিবেন। প্রকৃত কারণ কিন্তু তাহা নয়। একে কঠোর শ্রম, তাহাতে অর্থ-হানি, এইরূপ নানাবিধ কারণে "বিদ্যাসুন্দরের" পুনঃ পুনঃ অভিনয় হইতে পায় নাই।

ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বসাকের পিতা বাবু রাজকৃষ্ণ বসাক ২৮ বৎসর বয়সে এখানে অভিনয় দেখেন। তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবরে ৬৫ বর্ষে গতাসু হন। অতএব ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেই এই ঘটনার সূচনা।

আনুমানিক দ্বিলক্ষ মুদ্রা, এই মহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হয়। সংবৎসর ক্রমাগত না হউক, মধ্যে মধ্যে ইহার অভিনয় চলিয়াছিল। বিদ্যার গৃহে সুড়ঙ্গ-পথে সুন্দরের গমন কি সুন্দর, কেমন শোভন! সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বারনারীকে যে গৃহে বিদ্যার স্থানীয় করিয়া শায়িত রাখা হয়, তাহার চমৎকার বাহার। সে গৃহের ঝাড়, লণ্ঠন, দেয়াল গিরি, মখমল, কার্পেট, শয্যা প্রভৃতি ইত্যাদি পরিপাটী। সুন্দর, বিদ্যার সঙ্গে আলাপও করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের অংশ এ অভিনয়ে স্ত্রীলোকেই করিয়াছিল।

২। রিশির নাট্যাভিনয়-চেষ্টা।

বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অধ্যয়ন-কালে (১৮৩৬-৪২ খৃঃ) লর্ড অক্ল্যাণ্ড, উক্ত স্কুল পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। এই সময়ে হারমান্ জেফ্রয় নামক জনৈক ফরাসি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হারমান জেফ্রয় এক জন সদ্বিদ্বান্। তিনি প্রথমে বারিষ্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন; কিন্তু তাঁহার মন্দ স্বভাবের জন্য ধর্ম্মাধিকরণ হইতে তাড়িত হন। তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ

সার এড্‌ওয়ার্ড রায়নী, তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন উক্ত কার্য্য করিতে পারেন নাই। সেই সময়ে রিশি নামক জনৈক ফরাসি এস্থানে আগমন করেন। ইনি রঙ্গালয়-সম্বন্ধে বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন এবং হার্‌মান্‌ জেফ্রয়ের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। হার্‌মান, ওরিয়েণ্টাল্‌ সেমিনারির ছাত্রগণকে লইয়া সেক্ষপীরের জুলিয়াস্‌ সীজর নাটকের অভিনয় করিবার সঙ্কল্প করিয়া এতৎসম্বন্ধে রিশিকে বলেন। রিশি, এই অভিনয় করিতে ১৫০০ দেড় হাজার টাকা ব্যয় হইবে, অনুমান করেন। সেমিনারির কর্ত্তা গৌরমোহন আঢ্যকে বলায়, তিনি ৫০০ শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। অবশেষে অর্থাভাবে এই অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়।

৩। উত্তরচরিত্রের ইংরেজি-অভিনয়—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্ব।

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের প্রযত্নে সংস্কৃত উত্তরচরিতের ইংরাজি অনুবাদ অবলম্বনে শুঁড়োর বাগানে উক্ত ঠাকুর এক অভিনয় করান। সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ হোরেস্‌ হেমান্‌ উইল্‌সন্‌ সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে উহা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। হিন্দু-কালেজের অধ্যাপক, সংস্কৃত কালেজের ও হিন্দু কালেজের বিদ্যার্থীরা তাহাতে অভিনেতৃত্ব করেন। ইহার সহিত বঙ্গীয় নাট্যমন্দিরের বিশেষ সম্পর্ক নাই।

"It is perhaps scarcely known that the earliest attempts towards the revival of our Hindu Drama was made by the late Babu Prosonno Coomar Tagore. The Drama Uttarcharita translated by Dr. Horace Hayman Wilson from the original Sanskrit of Bhababhuti was acted on the stage set up by the former, under the direction and personal superintendence of the Doctor."—*Babu Gourdas Basak's letter.*

৪। বসুদের উদ্যোগ।

সেই সময় বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটনিবাসী বাবু পিয়ারীমোহন বসুর পুত্রেরা একটি অভিনয় করিবার উদ্যোগ করেন। তাঁহারা বহু অর্থব্যয় পূর্ব্বক নাট্যানুশীলন করিয়াছিলেন।

৫। বটতলায় জুলিয়স্ সীজর।

ইতিমধ্যে, বটতলায় এক অভিনয় আরম্ভ হয়। এই স্থানে পূর্ব্বে ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি স্থাপিত ছিল। পরে হাটখোলার দত্ত-বংশীয় গুরুচাঁদ দত্ত, এই স্থানে একটি স্কুল স্থাপিত করেন। এই স্কুলের ছাত্র লইয়া ইনি সেক্ষপীরের জুলিয়স্ সীজর নাটক অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে ক্লিঙ্গার নামক জনৈক সাহেব বিশেষ সাহায্য করেন। মাজিষ্ট্রেট্ হিউম, ইংলিশম্যান্ সম্পাদক ষ্টকুউলার প্রভৃতি বড় লোকও এই অভিনয়ের সংশ্রবে ছিলেন। ইহাতে দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল।

৬। পিয়ারী বসুর বাটীতে থিয়েটার।

ইহার পর পিয়ারীমোহন বসুর বাটীতে থিয়েটার খুলিবার অনুষ্ঠান হয় এবং উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত অনেক চাঁদা তোলা হয়। এই থিয়েটারে নিম্নলিখিত কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়।

	নাম।	তারিখ।	যত বার অভিনীত।
১।	ওথেলো	১৮৫৩	তিন রাত্রি।
২।	মার্চেণ্ট অব্ ভিনিস্	১৮৫৪	দুই রাত্রি।
৩।	চতুর্থ হেনরি, এমেটিউরস্	১৮৫৫	দুই রাত্রি।

শেষোক্ত এমেটউরস্ (Amateurs) নামক প্রহসন খানি, পার্কার সাহেব কর্ত্তৃক বিরচিত। পার্কার সাহেব পূর্ব্বে সাঁসুসি থিয়েটারে ছিলেন। বাবু দীননাথ ঘোষ, প্রিয়নাথ দত্ত, রাধাপ্রসাদ বসাক প্রভৃতি ইহাতে অভিনেতা ছিলেন। বাবু প্রিয়নাথ দত্ত কণ্ট্রোলার জেনারেলের আফিসে কার্য্য করিতেন। বাবু দীননাথ ঘোষও সরকারী চাকরী করিতেন। রাধাপ্রসাদ বাবু এমিলিয়ার অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। বাবু কেবলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় চতুর্থ হেন্‌রীর অংশ অভিনয় করেন।

৭। (প্রথম) ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার—১৮৫৪-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

পূর্ব্বোক্ত সাড়ম্বর বিদ্যাসুন্দরের প্রথম অভিনয় ও তৎপরবর্ত্তী প্রসন্নকুমার

ঠাকুরের উত্তরচরিতের অভিনয়, ইহার মধ্যবর্ত্তী কাল যেন অচঞ্চল। চপল কাল এখানে যেন নিশ্চল নিষ্ক্রিয়। অনেক বৎসর উহাদের ব্যবধানে অবস্থিত। এইবার ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারের কার্য্য। গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি হইতে উহার অভিনয়ানুষ্ঠান হয়। সেক্ষপীরের কয়েকখানি নাটক ঐ অভিনয়ের অবলম্বন। শুনিতে পাই, ব্রজনাথ বসু (প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীমহেন্দ্রলাল বসুর পিতা) জুলিয়স্ সীজর্ নামক নাটকের উত্তম অভিনয় করিতেন। তাঁহাদের অভিনয় তদানীন্তন লোকের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর মাতা, মরকত রঙ্গভূমিতে (এমারেল্ড থিয়েটারে) "নন্দবিদায়ের" উৎকৃষ্ট অভিনয় দর্শন করিয়াও একদিন বলিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামীর জীবৎকালে যেরূপ অভিনয় হইত, এক্ষণে সেরূপ উৎকৃষ্ট অভিনয় আর হয় না।

কাহারা ইহাতে অভিনয়ের কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহার তালিকা এ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই ইংরাজি থিয়েটারের অনুকরণে তখন অনেক রঙ্গমঞ্চ হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজি ভাবানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহাতে কেবল অঙ্গভঙ্গী, রঙ্গভঙ্গ এবং সাজসজ্জা দেখিতে আসিতেন মাত্র। থিয়েটারের প্রকৃত স্বাদ তাহারা জানিতেন না।

বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উদ্যমে উক্ত "ওরিয়েণ্টাল্ থিয়েটারে" বাঙ্গালা অভিনয়ের আরম্ভ মাত্র হইয়াছিল। সে বারে তাঁহারা "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের" অভিনয় করাইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পুস্তক রচিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর ও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে এই অভিনয় ঘটনার সূত্রপাত। নাটকাভাবে অন্য লক্ষ্য তাঁহার অন্তরে উদিত হইতে পায় নাই। এক "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বেই" তাঁহাদের তৃপ্তি হইল।

"Next in 1853-54 some of the ex-students of the Oriental Seminary formed a Dramatic Corps under the drilling of Messrs Clinger and Roberts who belonged to the old *Sans-Souci* Theatre, and opened a stage called the "Oriental Theatre" in

the premises of the Seminary, where they acted the plays of "Othelo" "Merchant of Venice" &c &c. It was Babu (since Maharaja Sir) Jotindramohan Tagore, who first of all suggested to them that they should introduce Native dramatic representations and organise a native orchestra on the basis of our native instruments. Acting upon this hint they produced the sensational play of "Kulin Kul Sarvasva" and then the theatre abruptly became defunct in 1856." *

৮। কেশবচন্দ্র সেনের হাম্লেট অভিনয়—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কেশব বাবু তাঁহার পৈতৃক পূর্ব্ব বাসস্থান গৌরীভা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কবি সেকস্‌পিয়ার প্রণীত "হাম্‌লেট" (Hamlet) নামক জগদ্বিখ্যাত নাটক অভিনয় করেন। প্রসিদ্ধ বক্তা ও ধর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহচর ও সহযোগী ছিলেন। এই গৌরীভা গ্রামে তিনি এক বার বাজীকর সাহেব সাজিয়া এমন আশ্চর্য্য বাজী দেখাইয়াছিলেন ও ইংরেজী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয়গণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ইউরোপীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।" †

এই অভিনয়-সম্বন্ধে বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন,—

"But Kesbab was content not only to read, but wanted to act, a desire in which we all warmly seconded him. We were also supported by our elder relatives. So a stage was improvised, cast-away European clothes were speedily pro-

* Babu Gourdas Basak's letter published in the life of Michael Modhusudan Dutta.

† কেশবচন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ৫ পৃষ্ঠা।

cured from the Bazars and we painted our faces, and got up our parts as best as we could. Keshub played Hamlet most successfully, he had the constitution of the Danish Prince by nature. The present writer (Protap chandra Mazumdar) took the part of Laertes, while Narendro Nath Sen, who had thin girlish voice at the time, played Ophelia very feelingly. Considering our age and training, the performance was successful. We kept up the play from time to time, till Keshub's theatrical propensities developed into the *Bidhaba Bibaha Natak* a little while afterwards." *

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সমালোচন।

নব্যভারত, ১১শ খণ্ড, ১৩০০ সাল।

আজ ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ-প্রায়—পাশ্চাত্য সভ্যতার তীব্র আলোক-রশ্মিতে কত দেশ প্লাবিত হইয়াছে, কত দেশে সভ্যতার নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছে। এই সভ্যতা আমাদের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা আমাদের যেমন কতক উপকার সাধিত হইয়াছে, সেইরূপ কতকগুলি অপকার হইয়াছে। বর্ত্তমান কালের লোকগণের মধ্যে আর সরলতা নাই, ব্যক্তিগত জীবনে সেরূপ একটা প্রসন্নতা নাই। সকলেই যেন কুটিল কঠোর; স্থির মনে আপন আপন স্থানে অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে বসিয়া আছেন, কখন সুবিধা পাইবেন, অপরের উপর ছোঁ মারিবেন। এইরূপ বাজ-ধর্ম্মী লোকের এ সময় বড়ই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে

* Life and Teachings of Keshub Chandra Sen, pp 101-2.

হৃদয় ব্যথিত হয়,—বড়ই ক্লেশ হয়—এই ভাব আমাদের সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সমালোচকগণের মধ্যে বড় একটা স্থিরমতি দেখিতে পাই না: একই কারণে এক লেখককে, যিনি একবার প্রশংস করিয়াছেন, সেই কারণে সেই লেখককে আবার নিন্দা করিতে শুনিতে পাই। ইহার গূঢ় রহস্য অনেক সময় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময় সমালোচকের সহৃদয়তার অভাব দেখিতে পাই। তখন "The toad's highest idea of beauty is his toadess* কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। ইহার কারণ একটি ইংরাজি কবির এক ছত্র কবিতায় বেশ বুঝা যায়, "with a rival's or eunch's pride‡ যাঁহার নিজের হৃদয় সঙ্কীর্ণ, তিনি কখন অপরের মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থকার এমার্সন্ বলেন, অপরের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে হইলে নিজের হৃদয় কিছু মহৎ ও উন্নত হওয়া আবশ্যক। এখন যে সমালোচনায় প্রশংসা করা হয় না,তাহা বলিতেছি না; কিন্তু তাহাতে কেমন অস্বাভাবিকতার, কৃত্রিমতার স্থান রহিয়াছে! সমালোচক যেন কর্ত্তব্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া লিখেন নাই, লিখিতে হয়, বলিয়া লিখিয়াছেন। তিনি যেন উদ্দেশ্য আঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইচ্ছামত নিন্দা অথবা প্রশংসা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এক্ষণে এই বলিয়া নব্যভারতের সমালোচনা করিলে যথেষ্ট হইবে, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বৎসরে ইহার উন্নতি লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু দুই এক বিষয়ে নব্যভারতের গাম্ভীর্য্যেরহানি হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাহার কারণ পরে বিবৃত করিব। এ বৎসরের প্রারম্ভেই সম্পাদকের "সান্ত ও অনন্ত" প্রবন্ধ। ইহার উদ্দেশ্য উচ্চ এবং ইহা পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে মোহিত হইয়াছি; কিন্তু এরূপ দার্শনিক বিষয়ের ভাষা

* Smile's Character'

‡ Pope's Essay on Criticism.

যেন আর একটু সংযত হওয়া উচিত ছিল। এ বৎসর নব্যভারতের কোন দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। স্বাধীন চিন্তা না থাকিলে দর্শনে হস্তক্ষেপ করা অন্যায়। নব্যভারতের অনেক লেখকের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সে চিন্তা যেন চর্ব্বিতচর্ব্বণ। আমাদের দেশে এখন হিউম কাণ্ট, মিল প্রভৃতি নাই বলিয়া দুঃখিত হইতেছি, না। কিন্তু স্বাধীনচিন্তার মাত্রা কম দেখিয়া বড় ব্যথিত হইয়াছি। বাবু জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "অদৃষ্ট" বেশ হইতেছে। ইহা দ্বারা অনেক ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠক অনেক নূতন বিষয় শিখিতে পারিবেন। এ বৎসর নব্যভারতে ধর্ম্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে প্রবন্ধ গুলি অতীব মনোরম হইয়াছে। বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, চন্দ্রনাথ বাবুর "হিন্দুত্ব" ও ভূদেব বাবুর "সামাজিক প্রবন্ধ" লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়াছেন এবং ইহাতে বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার মাননীয় বিপক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক জন স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন—অপর নীরব। জ্ঞানেন্দ্র বাবু তর্কশাস্ত্রানুসারে যে সকল ভ্রম প্রদর্শিত করিয়াছেন, চন্দ্রনাথ বাবু সে সম্বন্ধে কি বলিতে চান? ইহাঁরা "ইতিহাসের প্রাচীন গৌরবের সুখময় স্মৃতিতে বিভোর হইয়া মহাদেবের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন।" আমরা আশা করি, সুদর্শন-চক্র অদূরে। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর এই সমস্ত প্রতিবাদের প্রবন্ধগুলি তীব্র অথচ কোমল ভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার "নূতন ব্রাহ্মণরাজ্য" বেশ চিন্তাশীলতা ও সহৃদয়তার পরিচায়ক। এইরূপ কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা যতই ধর্ম্মালোচনা হয়, ততই মঙ্গল। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "অনাত্মবাদের অযৌক্তিকতা" নব্যভারতের গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছে। তাঁহার প্রবন্ধগুলি, অত্যন্ত চিন্তা এবং যত্নের সহিত লিখিত। তাঁহার দার্শনিক মতের সহিত আমাদের দুই এক স্থলে অনৈক্য থাকিলেও তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি, এ নগেন্দ্র বাবুর 'সাকার ও নিরাকার উপাসনার' প্রতিবাদ করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু তাহার কি উত্তর দেন, জানিতে বাসনা রহিল। ঐ বৎসর

"চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম" একবার-মাত্র বাহির হইয়াছে। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ গুলি সংগ্রহ করিয়া বাবু রাজকৃষ্ণ বসু সাধারণের বড়ই উপকার করিয়াছেন। বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী এম,এ, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-বিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। মহামুনি শাক্যসিংহের ধর্ম্ম যাহা এক্ষণে জগতের অর্দ্ধাধিক অধিবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে এবং যাহার ছায়া পাশ্চাত্য মহাদেশে অগষ্ট কোমৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে সেই মহান্ উদার ধর্ম্মের বিষয় যতই আলোচনা হয়, ততই হৃদয় উন্নত ও মহৎ হইবে। ক্ষীরোদ বাবু বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন, বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে তদপেক্ষা কিছু কম দেন নাই। তাঁহার নিকট হইতে আমরা আরও আশা করি। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি স্বীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রের অগাধ জ্ঞান হইতে আমাদিগকে যে দুই একটি রত্ন উপহার দিয়াছেন, তাহা বহুমূল্য, তাহা 'নব্যভারতের'ও গৌরবের বিষয়। আশা করি, ইহাঁরা দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করুন। এ বৎসর 'নব্য-ভারতে' কয়টি উল্লেখ-যোগ্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রহিয়াছে। (১) গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ-কোমল-পতি শ্রীহর্ষদেব, (২) অতীশ বা দীপঙ্কর (৩) হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস, (৪) মগধের রাজবংশ। প্রথম দুইটি বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, তৃতীয়টী বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, চতুর্থটী বাবু সখারাম গণেশ দেউস্করের। কৈলাস বাবু প্রথম প্রবন্ধে যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়টি সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বাবু শরচ্চন্দ্র দাসের 'বঙ্গের আদিগৌরব দীপঙ্কর' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ। "হিন্দু আর্য্য-দিগের প্রাচীন ইতিহাস" রমেশবাবুর নামের উপযুক্ত হইয়াছে। গোপাল-চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের 'কর্ণেল টড' এবং 'পঞ্চনদ প্রদেশ' অতি প্রীতিকর হইয়াছে। বাবু যোগেশচন্দ্র রায়ের "মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহের সিদ্ধান্তদর্পণ," "পঞ্জিকা-বিভ্রাট" ও "মঙ্গল লোক," অতীব উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ। এইরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া লেখকের মানসিক উন্নতি সাধিত হয়, তাহাতে পাঠক-বর্গের বিশেষ উপকার হইবে। চন্দ্রশেখর সিংহ আমাদের দেশীয় এক জন

জ্যোতির্ব্বিদ্। যোগেশ বাবু তাঁহার বিষয় প্রকাশিত করিয়া আমাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। শ্রীধর্ম্মদাস বসুর 'খাদ্য' বেশ সময়োপযোগী হইয়াছে।

বাবু নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "কৃষিকার্য্যের উন্নতি" এবং বাবু জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়ের "রায়তের সুখে জমিদারের মঙ্গল" দুইটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। এ দেশীয় জমীদারগণ এই দুইটি প্রবন্ধের মতানুসারে কার্য্য করিলে অনেক পরিমাণে সুখী হইবেন। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে এই দুইটি প্রবন্ধে যথেষ্ট উপদেশ রহিয়াছে এবং সে গুলি পালন করাও সহজ। এ দেশীয় জমীদারগণের এ সমস্ত বিষয়ে মনোযোগ প্রার্থনীয়। বাবু নৃত্যকৃষ্ণ বসু এম,এ. এবারে 'চতুর্দ্দশ পদী কবিতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা কাহারও কাহারও প্রাণে শলাকা বিদ্ধ করিলেও উক্ত প্রবন্ধ বিশেষ উপদেশ-প্রদ। যিনি দীর্ঘকেশধারী দিগের উপর খড়্গহস্ত, তিনি যে কিরূপে অর্দ্ধ-বিবসনা কোমলাঙ্গী কবিতায় আকৃষ্ট হন, তাহা আমরা অরসিক বলিয়া বুঝি বুঝিতে পারি না। নৃত্যকৃষ্ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে সত্য।

এই বারে নব্যভারতের কবিতা-সম্বন্ধে কিছু বলিব। নব্যভারতে সাধারণতঃ কবিতার নির্ব্বাচন বড় ভাল হয় নাই—এবারে কবিতার মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "মধুনিশীথে" সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখ্য। কবির সে 'মধু-যামিনী' পাঠকের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া এক নব ভাব সঞ্চারিত করিয়া দেয়। "বিবাহোৎসব" আনন্দের খবর লইলেও, সাময়িক পত্রিকায় স্থান পাইবার উপযুক্ত নয়। ইহাতে পত্রিকার গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব নষ্ট হয়। বাবু নৃত্যকৃষ্ণ বসুর "যুগল-কবিতা" বেশ হৃদয়স্পর্শিনী। যাঁহারা সমস্ত কবিতাটিকে ভাল বলা প্রথাবিরুদ্ধ মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে কিয়দংশ খারাপ লাগিতে পারে বটে, কিন্তু কবিতার উদ্দেশ্য লইয়াই কবিতার সমালোচনা হওয়া আবশ্যক। বাবু অনঙ্গমোহন ঘোষের 'জ্ঞান ও প্রেমিক' অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে প্রেম ও জ্ঞানের দুইটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বাবু বরদাচরণ মিত্রের একখানি "ফটো" ও "জাগরণ" বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। কবির ভাষা এবং ভাবের উচ্ছ্বাস দেখিয়া তাঁহার

হৃদয় বেশ উপলব্ধ হয়। তিনি মেঘদূতের অনুবাদক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ভরসা করি, তিনি বঙ্গভাষার আরও উপকার করিবেন। কাব্যকুসুমাঞ্জলির রচয়িত্রীর শুটিকয়েক পদ্যে বড় সুখী হইতে পারিলাম নাই, 'সুখ' ও 'অনলের প্রতি পতঙ্গ' কবিতাদ্বয়ে সে প্রতিভার বিস্ফুরণ -নাই। বাবু চুণীলাল গুপ্তের 'পরিত্যক্তা' অপরিত্যাজ্য, সুতরাং বেশ চিত্তাকর্ষক।

উপসংহারে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্যের "কলিকাতায় ইংরাজি চর্চ্চা" ও বাবু ঈশানচন্দ্র বসুর "স্ত্রীশিক্ষা" বেশ সময়োপযোগী সন্দর্ভ। বাবু বীরেশ্বর গোস্বামী যে বীরাঙ্গনা কাব্যের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ইহাতে দুই একটি অদ্ভুত প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"তখন সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা বীরকেশরী অগষ্টাস্ সীজর, সিংহাসনে সমাসীনা।" কোন্ দোষে সীজর স্ত্রীলিঙ্গ হইলেন, বুঝিতে পারিলাম নাই। ইহাতে আরও অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। স্থানাভাববশতঃ সমস্ত উল্লিখিত হইল না। বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের "কার্লাইল ও বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম" বেশ উপদেশ-প্রদ হইয়াছে। আরও কিছু বিস্তৃত হইলে, ভাল হইত। "সটীক ভবিষ্যৎ মহাকাব্য" কোন্ মহাকবির লেখনী-প্রসূত, জানিতে ইচ্ছা হয়। নব্যভারতে এই কবির অমানুষী কবিতা কেন স্থান পাইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম নাই। মেকলের অনুকরণে ইহা বোধ হয় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কবি আর এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছেন। এবারে মুসলমান-সাহিত্য-সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বড় সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। বাবু কিশোরীলাল রায়ের 'জাতীয় সাহিত্য' অতি মনোরম। তিনি সাহিত্যের পরিপুষ্টির প্রতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত দ্বারা বেশ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উচ্ছ্বাসময়ী ভাষা কল কল নাদে হৃদয় প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রবাহিত হইয়া যায়। সম্পাদকের "রামমোহন রায়" "পরিণাম চিন্তা" বেশ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। আমরা আশা করি, নব্যভারত দীর্ঘজীবী হইয়া, স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বজাতীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতে থাকুক।

জন্মভূমি।

(৩য় বৎসর ১২৯৯—১৩০০ সাল)

আমরা দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তৃতীয় বৎসরের "জন্মভূমি" অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের "জন্মভূমিতে" অনেক কৃতী লেখকের নাম দেখিতে পাই এবং এতদ্ভিন্ন অনেক উৎসাহশীল নবীন লেখকের লেখাও আছে। এই বৎসরের জন্মভূমিতে সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টি কবিতা, গল্প ১২টি এবং ৮টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রহিয়াছে। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেনের "বুদ্ধদেব" বাহির হইয়াও হইতেছে না। অনেক দিন এরূপ কবিতা পাঠ করি নাই। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত "জয়দেব" নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি সঙ্গীতপূর্ণ এবং সুমধুর। হীরেন্দ্র বাবু সদ্বিদ্বান; তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত "জীবন-সমাধি" শীর্ষক কবিতাটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শিনী এবং করুণ-রসপূর্ণ। শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নবীন লেখক, তাঁহার ক্ষমতা আছে। তিনি অবিচলিত-চিত্তে স্বজাতীয় ভাষার সেবা করিলে আমরা অনেক তৃপ্তি পাইব। তাঁহার "প্রেমের চিত্র" বেশ হইয়াছে। শ্রীচুণীলাল গুপ্ত বিরচিত "আঁখিজল" মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ। এ বৎসর "জন্মভূমিতে" ভাল করিয়া পদ্য নির্ব্বাচন করা হয় নাই।

জন্মভূমিতে গল্পের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। "মানব জীবনের তিনটি চিত্র" শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় বিরচিত, ইহাতে একটি সত্য অথচ হৃদয়-স্পর্শী দৃশ্য, পাঠকের সম্মুখে ধৃত হইয়াছে। এ বৎসরের জন্মভূমিতে "মোহন বাঁশী" নামক একটী গল্প বাহির হইয়াছে। ইহার যে উদ্দেশ্য কি তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে অবগত হইতে পারিলাম না। লেখক কি ভলটেয়ারের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করেন? বাবু নারায়ণচন্দ্র সেনের "মুরলা" শীর্ষক গল্পটি অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। হারাণচন্দ্র বাবুর "স্বপ্ন" নামক গল্পটী বেশ হইয়াছে। এ বৎসর জন্মভূমিতে শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত নামক একটি নূতন লেখক দেখিতে পাই। তাঁহার "চিত্রদর্শন' নামক দুইটি প্রবন্ধ অতীব

চিত্তাকর্ষক। তিনি চেষ্টা করিলে এক জন ভাল লেখক হইতে পারিবেন। শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত দুইটি প্রবন্ধ "জ্ঞানের প্রমাণ" এবং "সৌন্দর্য্য তত্ত্ব" তাঁহার উন্নত জ্ঞান এবং চিন্তার পরিচায়ক। তাঁহার মন, "প্রাণিবিদ্যা" লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নয়। "জ্ঞানের প্রমাণ" নামক প্রবন্ধ আর একটু বিস্তৃত হইলে ভাল হইত। এরূপ বিষয়ের যতই আলোচনা হয়, ততই ভাল। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "পাপের কি অনন্ত পরিণাম" নামক প্রবন্ধ দার্শনিক যুক্তিতর্কে পরিপূর্ণ। প্রফুল্লচন্দ্র বাবু "বাঞ্ছারাম"কে অবতারণা করাইয়া উত্তম কর্ম্মই করিয়াছেন। শ্রীইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মার "পুরুষার্থ" মনুষ্য জীবনের একটি গভীর-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। তল্লিখিত "পুরুষার্থ" পাঠ করিয়া অনেকেই বোধ হয়, পুরুষার্থ করিতে শিখিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরের জন্মভূমিতে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকারের "সহজ জ্ঞান ও সচ্ছন্দতা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু উহাতে তাঁহার অপ্রশংসা হয় নাই। জন্মভূমির ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-সমূহের মধ্যে শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের "মমতাজমহল" এবং "আকবর সাহের দরবার" বেশ সুখপাঠ্য এবং ইহা দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক বিষয় অবগত হওয়া যায়। বাবু বিহারিলাল সরকারের "আরকট অবরোধ"—তাঁহার 'পলাশীর' ন্যায় হয় নাই। 'পলাশী' নামক প্রবন্ধে বিহারিলাল বাবু যে ঐতিহাসিক জ্ঞান দেখাইয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্ত্তন" বেশ চিত্তাকর্ষক। "আমার জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ এখনও বাহির হইতেছে। অনেকে আগ্রহের সহিত এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকেন। এক্ষণে জন্মভূমিতে সমালোচনার বিষয় বলিব। এ বৎসরের সমালোচনার মধ্যে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত "নিরাশা কাব্য" ও শ্রীবিহারিলাল সরকারের "মুকুল-মুঞ্জরা" শীর্ষস্থানীয়। উভয় প্রবন্ধে উভয় লেখকই বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। "কুরুক্ষেত্র" বন্ধ হইল কেন? জন্মভূমিতে "পাথরে কয়লা" প্রভৃতি প্রবন্ধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাণি-বিদ্যা-

বিষয়ক প্রস্তাবগুলি সুখপাঠ্য হইলেও একটি উন্নতিশীল উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা আমাদের অভিপ্রায় নয়। "জন্মভূমি" অনেকগুলি দোষ অতিক্রম করিয়াছে, সাহিত্য ক্ষেত্রে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

সাহিত্য—১৩০০ সন।

বাঙ্গালায় সাময়িক সাহিত্যের স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে কোন সাময়িক পত্রিকা কিছু দিনের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আবার অদৃশ্য হইতেছেন। কাহারও আয়ু দুই বৎসর, কাহার এক বৎসর এবং কেহ বা সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাইতেছেন। এই স্রোতে পড়িয়া বঙ্গদর্শন আর্য্যদর্শন, নবজীবন প্রচার পত্রিকা একবারেই অদৃশ্য হইয়াছে। আছে কেবল নব্যভারত, সাধনা, প্রভৃতি গুটিকয়েক সাময়িক পত্রিকা। বলা বাহুল্য, যে সাহিত্য একটি এই শ্রেণীর পত্রিকা। সাহিত্য ইহার পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে কিন্তু ইহা অল্প-জীবনে যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। তৃতীয় বৎসর অপেক্ষা চতুর্থ বর্ষের সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চতুর্থ বর্ষে সাহিত্যের অনেক ভাল লেখককে সাহিত্যে লিখিতে দেখিতে পাই। চতুর্থ বর্ষের সাহিত্যে সহযোগী-সাহিত্য বলিয়া একটি অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে বিদেশীয় সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় সঙ্কলিত হইয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক অতীব হৃদয়গ্রাহী। ঐ প্রবন্ধ-লেখক সংগ্রহ করিয়া আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন। সাহিত্যানুরাগীর পক্ষে ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের সহযোগী সাহিত্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রবন্ধ-লেখক, বিদেশীয় সাহিত্য সমালোচনা করিতে যাইয়া স্বদেশীয় সাহিত্য সম্বন্ধে যে মত প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা সকল স্থানে সঙ্গত হয় নাই। যাহা হউক, আমরা আশা করি, সহযোগী সাহিত্য ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিবে। চতুর্থ বর্ষের সাহিত্যে, বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যালের বৈদিক প্রবন্ধাবলী, বাবু রমেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধাবলী প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় এবং রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতির লেখা ভাল

হইয়াছে। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, সাহিত্যের কলেবর কবিতার ছড়ার এবং চুটকি গল্পের ছড়াছড়িতে অনেক সময় পরিপূর্ণ থাকে। যাহার উদ্দেশ্য লোক শিক্ষা, সমাজের উন্নতি সাধন এবং সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি, তাহাতে এত গল্প কবিতার ছড়াছড়ি ভাল দেখায় না। সাহিত্যে মৌলিক এবং চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। চতুর্থ বর্ষের সাহিত্যে পাঁচটি গল্প এবং অন্যূন দশটি নিম্ন-শ্রেণীর কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য-সম্পাদক কি এই স্থান অপর কোন চিন্তাশীল লেখকের লিখা দিয়া পূরণ করিতে পারিতেন না? এই সমস্ত নিকৃষ্ট-শ্রেণীর গল্প ও কবিতা প্রকাশ করিবার জন্য অপরাপর পত্রিকা রহিয়াছে। সাহিত্যে তাহাদের স্থান কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "হিয়োন সাঙ" শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে। কৈলাস বাবুর মতে শরৎ বাবু "থান-সেন-সান" "হিয়োন সাঙ" ভিন্ন আর কেহই নহে। তিনি যে সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারই জয় বলিয়া বোধ হয়। সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব কিংবা ইতিহাস সংক্রান্ত প্রবন্ধ অতি অল্প পরিমাণে থাকে। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্তের "জীবন ও মৃত্যু" শীর্ষক প্রবন্ধ উত্তম হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত "মাধুরী" বেশ চলিতেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ না হইলে ইহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা যাইতে পারে না। সাহিত্যে, শ্রীপ্রিয়নাথ সেন কৃত, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত মানসীর সমালোচনা অতি উত্তম। বাস্তবিক এরূপ সমালোচনা বাঙ্গালায় খুব অল্পই দেখিয়াছি, বলিয়া বোধ হয়। বাবু শরচ্চন্দ্রদাস রচিত 'শিরোর্ব্বশী' একটি জাপানীগল্প। আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি, গল্পটি ভাল হয় নাই। যাঁহার প্রতিভা যে দিকে, তাঁহাকে সে বিষয়ের অনুশীলন করিতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হই। কোন ঐতিহাসিক অথবা শব্দশাস্ত্রবিৎকে কবি হইতে দেখিলে আমাদের ভয় করে। বর্ত্তমান বৎসরের সাহিত্যে প্রকৃত কবিতার ভাগ অতি অল্প। শ্রীঅক্ষয়কুমার

বড়াল-রচিত "আবাহন" ও "বিদায়" "গিরীন্দ্র মোহিনীর ঈপ্সিত মিলন" এবং আর গুটিকয়েক কবিতা ভিন্ন আর সমস্তই 'আহা মরি মরি' শ্রেণীর। বস্তুতঃ তৃতীয় বৎসরের সাহিত্য হইতে চতুর্থ বৎসরের সাহিত্যে আমরা কিছু উন্নতি দেখিতে পাই, কিন্তু সাহিত্যের উচ্চ উদ্দেশ্য অথবা আশা সফল হইবার এখনও বিলম্ব রহিয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। সাহিত্যে আমরা অধিকতর চিন্তাশীল সুলিখিত প্রবন্ধ দেখিবার একান্ত ইচ্ছা করি। ইহার মাসিক পত্রাদির সমালোচনা একদেশ-দর্শিতাময়।

দুইটি সনেট্।

(১)

হতভাগ্য এ জীবনে কি আছে সম্বল ?
কিছু নাই—ফোটা কত তপ্ত অশ্রু বই !
কঠিন মাটীর ধরা—কঠিন সকল
পড়িতে শুকায়ে যায়, দেখে না কেহই !
সকলে চলিয়া যায়, শুধু অশ্রু রয়
জুড়াইতে তাপ-দগ্ধ মানব-হৃদয়।
ভেবেছিনু কেঁদে কেঁদে এমনি না হয়
অবশিষ্ট দিন গুলি হইবে বিলয় !
অর্দ্ধেক জীবন ধরি' নিত্য—অবিরাম
ঢালিয়াছি অশ্রু কত, কি লভিনু তায় ?
কাঁদিয়াও এ জীবনে নাহিক আরাম
ধৌত নাহি হয় চিত্ত-মলিনতা হায় !
তোমারি আদেশে ভ্রমি জগতে তোমার
আনিয়াছি 'অশ্রু' আজ ধর উপহার !

---

(২)

'অদর্শনে আঁখি-জলে দিন কত ঝ'রে
মরিবে যে ভালবাসা; মুছিবে যে স্মৃতি,
তার লাগি ও হৃদয়ে, কেন সাধ ক'রে
রচি' চিতা,—দগ্ধ হবে মরণ অবধি ?
ভালবাসা এ সংসারে উন্মত্ত-প্রলাপ ;
প্রথমে আঁখিতে শেষে দেহের মিলনে !
না মিটালে সে পিপাসা হ'ল ঘোর পাপ
হ'ল না প্রেমের ধর্ম্ম, সুখ সে জীবনে !
নিজ নিজ ক্ষতিলাভ স্বার্থ-গণনায়,
যথায় বিব্রত নর, নিয়ত যথায়
শুধুই দোকানদারী চটকে ভুলায়,
নীরব প্রেমের কথা গভীর ব্যথায়
নীরবে মুছিয়া ফেলা ব্যথা-ভরা সদা
দুই বিন্দু অশ্রু তব কে বুঝিবে সেথা।

———

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

এমারেল্ড থিয়েটারের পুনরভিনয়।

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনের সহিত স্পন্দহীন "এমারেল্ড" পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। (বিগত ৭ই আশ্বিন ২২শে সেপ্টেম্বর শনিবার ইহার নবজীবনের প্রথমাভিনয় হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান অভিনয় পূর্ব্বতন প্রায় সমুদয় অভিনয়কে সৌন্দর্য্যে ও মনোহারিত্বে অতিক্রম করিয়াছে।

অভিনীত পুস্তকখানি বঙ্গের সুপরিচিত "কবিকঙ্কণের" অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী-প্রসূত চণ্ডী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।) চণ্ডী, বঙ্গের প্রতি গৃহে অধীত হইয়া থাকে। সমগ্র পুস্তক খানি যেন সুন্দর ও ললিত পদাবলি-শোভিত একখানি

চিত্র। (কবি এই প্রতিমাতে "জীবনী-শক্তি" সঞ্চার করিতে পারেন নাই। কিন্তু "এমারেল্ডের" অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের গুণে আজ প্রতিমা সঞ্জীবিত হইয়া কবিত্বের অবিনশ্বরত্ব ঘোষণা করিতেছে) কবির চৈতন্য-বিহীনা প্রতিমা, আজ নবমাল্য-সুশোভিতা কন্যার ন্যায় সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। নায়ক কালকেতু এবং নায়িকা ফুল্লরা, আজ যেন সশরীরে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জগৎস্রষ্ট্রী আদ্যাশক্তির সার্ব্বজনীন প্রেম লাভের জন্য তপস্যা করিতেছে। অভিনয় দেখিতে দেখিতে আমরা আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম,—বোধ হয়, যেন শতাব্দী পূর্ব্বে পরলোকগত মহাত্ম-গণের মধ্যে আমরা বিচরণ করিতেছি। আমরা যেন তাঁহাদের সমসাময়িক। যেন তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান করিতেছি, এবং তৎকালের ন্যায় যেন স্থূলবুদ্ধির অবোধ্যা, অপরিজ্ঞেয়া, মহতী সদয়-হৃদয়া আদ্যাশক্তি, আমাদের মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন এবং প্রেম-দুগ্ধদানে মাতার ন্যায় যেন আমা-দিগকে লালন পালন করিতেছেন। বাস্তবিকই হৃদয়ের গূঢ়তম অন্তস্তল—আধ্যাত্মিক বাসনার একমাত্র অধিবেশন-স্থান পর্য্যন্তও যেন এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব আবেগে আপ্লুত হইয়া উঠে; ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কর্ত্তব্যচ্যুত হইয়া স্তম্ভিত ভাব ধারণ করে।

প্রলয়, মহাপ্রলয়, দিগন্তব্যাপী প্লাবনে, দেশ মহাদেশ, গ্রাম নগর জলমগ্ন! চক্ষু সলিল সাগরের ইয়ত্তা করিতে পারিতেছে না! উত্তাল তরঙ্গমালা, শ্রবণ-ভেদী মহারবে জগৎ গ্রাস করিতে অগ্রসর হইতেছে! কাহার সাধ্য উহার গতিরোধ করে! ধ্বংস, অপরিহার্য্য! ভীষণ-প্রবাহ স্রোতে সর্ব্ব ভাসিয়া গেল! ও কি! ঐ অর্দ্ধনিমজ্জিত মহীরুহের কাণ্ডসংলগ্ন ওটি কি? অনিন্দ্য-সুষমা লাবণ্যময়ী যুবতীর শবদেহ! কোন প্রেমিক জীবনের ধ্রুবতারা। কবিকঙ্কণের চণ্ডী অভিনয় করিতে হইলে এইরূপ দৃশ্যপটই প্রথমে প্রদর্শিত করা উচিত। এ দেশীয় নাট্যশালাসমূহে যত প্রকার দৃশ্যপট প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ভাবময়। চিত্রকর কল্পনাকারক প্রশংসা ধন্যবাদের পাত্র। আমরা কায়মনোবাক্যে তাঁহার উন্নতি কামনা করি।

প্রথম দৃশ্য—বিজন শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে ব্যাধ কালকেতু মৃগান্বেষণে ব্যস্ত কথনও বা নিজ ভাগ্যদেবীকে বার বার অভিশপ্ত করিতেছে, কথনও বা জগজ্জননীর নিকট করুণস্বরে কৃপা ভিক্ষা করিতেছে, ভক্তের ক্রন্দনে মাতৃ-হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিলেন না। দেবীর কৃপায় সামান্ত ব্যাধ রাজ্যেশ্বর হইল।

কিন্তু প্রেমালোকে আলোকিত চিত্তে, রাজ্য-সম্পদ কত ক্ষণ স্থান পায়? কালকেতু ঐহিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে জগন্মাতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। (ঈশ্বরসৃষ্টি, স্বর্গীয় প্রেম, এবং ভূলোকে স্বর্গসুখ কি বুঝাইবার জন্য লেখক একটী অভিনব "চরিত্রের" অবতারণা করিয়াছেন। "সাধনা" মূর্ত্তিমতী ভক্তি, ইহার মধুময় সঙ্গীত শ্রবণ করিলে হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কার করিয়া উঠে এবং চিত্ত আনন্দদোলায় দোলায়িত হয়। তবে দোষের মধ্যে কোন কোন স্থানে বোধ হয়, যেন মূল ঘটনার সঙ্গে ইহাদের সংস্রব দূরস্থ হইতেছে।

অভিনয়ের অবসান যথাযোগ্যই হইয়াছে। মোহিনী গাহিকা, সুন্দরী অপ্সরা, ভক্তিময়ী "সাধনা", প্রস্তরময়ী হইয়া মন্দিরস্থিতা জগন্মাতার প্রতিমা পার্শ্বে শোভা পাইতে লাগিলেন। নায়ক নায়িকা প্রজাবৃন্দ,সমস্ত জগৎ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে গললগ্নীকৃতবাসে সমস্বরে, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ঙ্করীর উদ্দেশ্যে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় *।

* যেমনি সদ্ভাব-সম্পন্ন, তাল-লয় বিশুদ্ধ, শ্রুতি-মধুর সঙ্গীত,—তেমনই উত্তম অভিনয়। নাটকাংশে পুস্তখানির রচনা-নৈপুণ্য, বর্ণনা পারিপাট্য, বর্ণ বিন্যাস, ভাব-গাম্ভীর্য্য, রস-প্রাচুর্য্য সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য আদিগুণে অতুল। তবে ইহা বলিতে হইবে, কোন কোন অংশ দীর্ঘ, অতএব কতকটা ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়াছে। বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির প্রশংসা এই, তিনি প্রায় এই নূতন সম্প্রদায়কে এমন সুশিক্ষিত করিয়াছেন যে, কার সাধ্য নব-শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া কল্পনাতেও আনিতে পারে?

সম্পাদকগণের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল, এই নূতন ব্যবস্থার জন্য অধ্যক্ষগণ বিশেষ ধন্যবাদভাজন।—সম্পাদক।)

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০১ সাল, কার্ত্তিক। { দ্বিতীয় সংখ্যা।

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত।

সখের থিয়েটার।

১২৪০সালে বঙ্গীয় নাট্যালয়ের স্থচনা। ঐ স্থলে অসাবধানতায় দৈবযোগে ১৮৪০খৃষ্টাব্দ লিখিত হয়। সুতরাং তাহার সহিত লেখা হইয়াছিল,১২৪৭ সালে বঙ্গদেশীয় রঙ্গভূমির সূত্রপাত। ঐ বিষয়ের প্রমাণ তত্‍-সঙ্গে কিছু কিছু বর্ণনার সহিত এমন এক বিশ্বাস্য প্রমাণ অথচ প্রাচীন ঘটনা প্রাপ্ত হইয়াছি, যদ্দ্বারা পূর্ব্বের মত যে ভ্রান্ত, তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

যে বৎসর রাজা রামমোহন রায়, বিলাতে বৃষ্টলনগরে শরীর ত্যাগ করেন, যে বৎসরে ভারতে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের শাসনদণ্ড চলিতেছিল, সেই বৎসর—সেই ১২৪০ সালে অর্থাৎ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেই বঙ্গদেশে প্রথম নাটকাভিনয় হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে "হিন্দু পায়োনিয়ার" (Hindu Pioneer) নামে এক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। তাহার দ্বিতীয় সংখ্যায় (অর্থাৎ অক্টোবর মাসে) দি নেটিভ থিয়েটর (The Native Theatre) অর্থাৎ স্বদেশীয় রঙ্গালয় এই নামে এক প্রবন্ধ, উক্ত পত্রিকায় প্রকটিত হয়।

তাহার মূল ইংরেজি ও বাঙ্গালায় তাহার তাৎপর্য্য, যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে। আমরা গত বারে যে প্রথম অভিনয়ের (১২৪০ সালের ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের) বর্ণনা করিয়াছি, তাহার দুই বৎসর পরেও (১২৪২ সালে অর্থাৎ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দেও) সেই অভিনয়ই চলিয়াছিল। প্রথমকার অভিনয়ে ও এই অভিনয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে।

বিদ্যাসুন্দরের অন্য অভিনয়।

১২৪২ সাল—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ।

"THE NATIVE THEATRE.

"This private theatre, got up about two years ago, is still supported by Babu Nobin Chander Bose. It is situated in the residence of the proprietor at Sham Bazar, where four or five plays were acted during the year. These are native performances, by people entirely Hindus, after the English fashion, in the vernacular language of their country; and what elates us with joy, as it should do all the friends of Indian improvement, is that the fair sex of Bengal are always seen on the stage, as the female parts are almost exclusively performed by Hindu women.

We had the pleasure of attending at a play one evening during the last full moon; and we must acknowledge that we were highly delighted. The house was crowded by upwards of a thousand visitors, of all sorts, Hindus, Mahammadans, and some Europeans and East Indians, who were equally

delighted. The play commenced a little before 12 O' clock, and continued the next day, till half past six in the morning. We were present from the beginning and witnessed almost the whole representation with the exception of the last two scenes. The subject of the performance was Bidya Sundar. It is tragi-comic, and one of the master-pieces in Bengali, by the celebrated Bharat Chandar. I need scarcely explain the details of the play which is commonly known by every person who can read a little of Bengali, yet for the sake of our English readers we must observe that this play is much like that of Romeo and Juliet in Shakespeare. It commenced with the music of the Orchestra which was very pleasing. The native musical instruments, such as the Sitar, the Saranghi, the Pakhwaj, and others, were played by Hindus almost all Brahmans, and among them the violin was admirably managed by Babu Brojonath Goshain, who received frequent applauses from the surrounding visitors; but unfortunately he was but imperfectly heard by the assembly. Before the curtain was drawn a prayer was sung to the Almighty, a Hindu custom in such ceremonies and prologues were chanted likewise previous to the opening of every scene, explaining the subject of the representation. The scenery was generally imperfect, the perspective of the pictures, the clouds, the water, were all failures; they denoted both want of taste and sacrifice of judicious principles, and the latter were scarcely distinguished except by the one being placed above the other. Though framed by native printers they would have been much superior had they been executed by careful hands. The house of Raja Bira Singha and the apartment of his daughter were however done tolerably well. The part of Sundar, the hero of the poem, was played by a young lad, Shamacharan Bannerji of Barranagore, who inspite of his praise-worthy efforts did not do entire justice to his perfor-

mance. It is a character which affords sufficient opportunity to display theatrical talents by the frequent and sudden change of pantomime, and by playing such tricks as to prevent the Raja, who is the father of the heroine of the play from detecting the amorous plot. Young Shama Charan tried occasionally to vary the expression of his feelings, but his gestures seemed to be studied, and his motions stiff. The parts of the Raja and others were performed to the satisfaction of the whole audience.

"The female characters in particular were excellent. The part of Bidya (the daughter of Raja Bira Singha) the lover of Sundar was played by Radha Moni (generally called 'Moni) a girl of nearly sixteen years of age, was very ably sustained; her graceful motions, her sweet voice and her love tricks with Sunder filled the minds of the audience with rapture and delight. She never failed as long as she was on the stage. The sudden change of her countenance amidst her joys and her lamentations, her words so pathetic, and her motions so truly expressive, when informed that her lover was detected and when he was dragged before her father, were highly creditable to herself and to the stage. When apprised that Sunder was ordered to be executed her attendants tried in vain to console her; she dropped down and fainted, and on recovering, through the care of her attendants, fell senseless again, and the audience was left for some time in "awful silence." That a person, uneducated as she is and unacquainted with the niceties of her vernacular language, should perform a part so difficult with general satisfaction and receive loud and frequent applauses, was indeed quite unexpected. The other female characters were equally well performed, and amongst the rest we must not omit to mention that the part of the Rani or wife of Raja Bira Singha, and that of Malini (a name applied to women who deal in flowers) were acted by an

elderly woman Joy Durga, who did justice to both characters in the two-fold capacity; she eminently appeared amongst the other performers, and delighted the hearers with her songs; and another woman Raj Cumari usually called Raju played the part of a maid servant to Bidya, if not in a superior manner, yet as ably as Joy Durga.

"We rejoice that in the midst of ignorance such examples are produced which are beyond what we could have expected. Ought not the very sight of these girls induce our native visitors present on this occasion to spare no time in educating their wives and daughters? Had this girl, who made such a capital figure on the stage, been educated in the study of her vernacular language, I, as a Hindu, beg my countrymen to consider how her talents would have shown! Was not her ingenuity, though she only spoke by rote, sufficient to convince those who charge Nature for being partial to men that Hindu females are as well fitted to receive education as their superior Lords? Was not this display sufficient to convince the Hindu visitors that a woman, as long as she is devoid of education is a perfect blank in society? If they still neglect this important consideration after noble and fresh examples of the mental power of our females their hearts must be cold and their minds without feeling.

"Such is the Native Theatre, and such is the way in which it is conducted. The proprietor, Babu Nobinchunder Bosu deserves our highest praise for endeavouring to raise the character of our mistaken though truly praiseworthy women. Although such private exhibitions are generally expensive, yet we see the Babu encouraging it both with personal exertions and pecuniary assistance. It is a matter of joy that a rich native has thus come forward to further active measures for the improvement of the friends of India. May his example be followed by an oppulent community. Let us behold a great

moral revolution in our country, which in time must needs raise India to a state of merited renown.

"We wish every success to this praiseworthy undertaking. We entertain no doubt of its continuance as long as the proprietor preserves in his zealous exertions. Let him employ effectual means for the prevention of the debasing system now existing in regard to Hindu females. Let him devise new methods of improvement; and above all resolutely keep his Theatre up and, like the Hindu Theatre, not suffer it to meet with a death-blow in its very origin. This will be doing much real good to society and earning the unqualified praise from the public. Such deeds speak for themselves; they attract glory from all quarters, and thus are worthy men crowned with unfading splendour!" (1)

উহার তাৎপর্য্য এই :—

উল্লিখিত থিয়েটরটী প্রায় বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা প্রকাশ্য নাট্যভূমি নহে। এই রঙ্গশালার প্রবর্ত্তক শ্যামবাজারাধিবাসী(২)বাবু নবীনচন্দ্র বসু। বর্ষমধ্যে চারি পাঁচ বার প্রবর্ত্তকের শ্যামবাজারস্থ নিলয়ে বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হইয়া থাকে। ইংরেজি পদ্ধতি-ক্রমে এখানে হিন্দুদের কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অভিনয় হয়। অত্রত্য নাট্যাঙ্গনে বঙ্গাঙ্গনাদিগকে স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিতে দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছি।

বিগত পূর্ণিমায় (৩) অত্রত্য একটী মাত্র অভিনয়ে উপস্থিত ছিলাম। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কেমন পুলকিত হইয়াছিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত।

(1) Hindu Pioneer, October, 1835.

এই লিপির জন্য বাবু সনৎকুমার ও অটলকুমার সেন এই দুই ভ্রাতা আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইঁহারা দুই জনেই নবীনচন্দ্র বাবুর দৌহিত্র।

(২) গত সংখ্যায় ভ্রম ক্রমে এক স্থানে শ্যামবাজার ও এক স্থানে বাগবাজার এবং নবীনচন্দ্র ও নবীনকৃষ্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

(৩) সম্ভবতঃ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায়।

প্রায় অগণ্য-দর্শক-সমাগমে গৃহ, যেন লোকারণ্য। সহস্রাধিক লোক, অভিনয়-ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিলেন। দর্শকগণের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ইয়ুরোপীয়, ফিরিঙ্গী সকল শ্রেণীরই নানা জাতীয় লোক ছিলেন। শেষোক্ত দুই জাতিও হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে সমসুখ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার কিয়ৎ পূর্ব্বে অভিনয় ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া তৎপর দিন সার্দ্ধ-ষট্ ঘটিকাবধি (৬ টা পর্য্যন্ত) স্থায়ী হইয়াছিল। আমি শেষ দুই দৃশ্য ব্যতিরেকে সকলই অবলোকন করিয়াছি। সুতরাং প্রায় আদ্যোপান্তই আমার দৃষ্ট, অল্পই আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর। বিদ্যাসুন্দর এখানে অভিনীত হয়। বিদ্যাসুন্দর বিয়োগ-মিলনান্ত। যাঁহারা কিছুমাত্রও লিখিতে পড়িতে পারেন, বঙ্গের তথাবিধ আবালবৃদ্ধবনিতা, বিদ্যাসুন্দরের বৃত্তান্ত সাধারণতঃ জ্ঞাত। কেবল, ইংরেজ-পাঠকবৃন্দের গোচরার্থে আমাকে এ স্থলে বলিতে হইতেছে, বঙ্গের বিদ্যাসুন্দর, শ্বেত-দ্বীপীয় সেক্ষপীয়রের রোমিও-জুলিয়েটের প্রায় প্রতিরূপ।

উক্ত অভিনয়ের পূর্ব্বে সুমধুর বাদ্যারম্ভ হইল। সেতার, সারঙ্গ, পাখোয়াজাদি বিবিধ এতদ্দেশীয় বাদ্য-যন্ত্র-গুলি হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বাদিত হইল। বাদক-সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী অতি সুন্দররূপে বেহালা বাদন করিয়াছিলেন। তিনি দর্শক-মণ্ডলীর মধ্য হইতে অনবরতই সুখ্যাতি-দ্যোতক করতালি ধ্বনি দ্বারা প্রোৎসাহিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অসৌভাগ্যক্রমে তাঁহার বাদ্যধ্বনি সমবেত শ্রোতৃবর্গের শ্রুতিগোচর হয় নাই। পটোত্তোলনের পূর্ব্বেই একটী পরমেশ-স্তুতি গীত হইল। এবম্ভূত মহোৎসবে ঐরূপ না করিলে, হিন্দু-রীতির ব্যতিক্রম করা হইত। প্রত্যেক দৃশ্যের প্রারম্ভে প্রস্তাবনা প্রগীত হইতে থাকিল। প্রস্তাবনায় প্রত্যেক দৃশ্যের প্রতিপাদ্য বিষয় স্পষ্টীকৃত হইতে লাগিল। দৃশ্যপট গুলি সাধারণতঃ নির্দ্দোষ নয়। চিত্রগুলির চিত্রণ-কৌশলও প্রশংসনীয় নয়। ছবি দেখিয়া স্থানের দূরত্ব বা নৈকট্য বোঝা যায় না। মেঘ ও জল চিত্রপটে যথারীতি অঙ্কিত হয় নাই। তাহাতে সুরুচির ও ভাবুকতার অসদ্ভাব। পয়োবাহে ও পয়োরাশিতে কি প্রভেদ, তাহা হৃদয়ঙ্গম

হয় না—উহাদিগকে প্রায়ই পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয় না। উপরের যাহা, তাহা মেঘ, হরিয়ে তের—এই অনুভব বিনা তদুভয়ের বৈলক্ষণ্য নির্ণয় অসম্ভব। 'অস্মদ্দেশীয় চিত্রকরেই-পটগুলি প্রস্তুত করিয়াছে' বলিয়াও, কতক মার্জনীয় হইতে পারে; কিন্তু এদেশীয় অপর নিপুণতর হস্তে চিত্রাঙ্কনের ভার অর্পিত হইলে, তদপেক্ষা উত্তম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাজা বীরসিংহ ও রাজবালা বিদ্যার আলয়ে চিত্রকরের রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বরাহনগর-নিবাসী তরুণ বয়স্ক শ্রীশ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দরের সজ্জায় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যম উত্তম ও প্রাণপণ চেষ্টার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে, তাঁহার কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই। সুন্দরের অভিনয়ে সহসা ভাব-ভঙ্গী এত পরিবর্ত্তিত করিতে হয় যে, তাহার জন্য নাট্যমন্দির-সংক্রান্ত অনেক সূক্ষ্ম শিক্ষার প্রয়োজন। যুবক শ্যামাচরণ স্বকীয় মনোভাব-পরিবর্ত্তনে সময়ে সময়ে প্রয়াস পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে নৈসর্গিক বলা যাইতে পারে না; কেননা, তাহা শিক্ষা-লব্ধ বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার অঙ্গভঙ্গীও অকৃত্রিম নয়। রাজার ও অপরাপরের অভিনয়ে শ্রোতৃ-সমাজ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নারী-চরিত্রাভিনয় অশেষ সৌন্দর্য্যের খনি, মনোহারিত্বের আলয়। উহা উল্লেখের উপযুক্ত। রাধামণি নাম্নী এক ভামিনী, বিদ্যার অভিনয়-কারিণী। রাধামণি সচরাচর মণি নামেই সমধিক পরিচিত। মণি ষোড়শী রূপসী। অভিনয়াংশে সে আপন প্রকৃতি, বরাবর রক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং অভিনয়ে সে যশস্বিনী হইয়াছিল, বলিতে পারি। তাহার সুচারু হাব-ভাব, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের সহিত প্রেমালাপ, প্রণয়-কৌশল ইত্যাদি অবলোকনে সভ্যবৃন্দ আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন,—মহোৎসাহে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানেই তাহাকে অকৃতকার্য্য হইতে হয় নাই। বিদ্যা যখন শুনিতে পাইল, তাহার পতি, ধৃত ও বন্দীকৃত হইয়া তৎপিতার সম্মুখে আনীত হইয়াছে, তাহার তখনকার অকস্মাৎ আকার-বিভ্রম, নিতান্তই মনোরম। তাহার তৎকালীন বাণী, বড়ই করুণ-রসোদ্দীপিনী—যার পর নাই

মর্ম্মস্পর্শিনী। তদীয় তদানীন্তন আকারেঙ্গিত সুসঙ্গত—সময়োচিত। তাহার তাৎকালিক আকৃতি-প্রকৃতি, হৃদয়ভাব-প্রকাশক হইয়াছিল। তাহার বিলাপে—আর্ত্তনাদে সকলকেই মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল। এতন্নিবন্ধন সে ও নাট্য-সম্প্রদায় শ্লাঘনীয়; তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদ-যোগ্য। বিদ্যা যখন সুন্দরের বধাজ্ঞা শুনিল, তখন সে ছিন্ন-মূল তরুর ন্যায় ভূ-নিপতিত ও লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া গেল। তাহাকে সান্ত্বনা করিতে তাঁহার সঙ্গিনীদের অশেষবিধ চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সুহৃদ্‌দের পরিচর্য্যায় সে লব্ধচেতন হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুনরায় বিচেতন হইল। তখন দ্রষ্টৃগণ স্পন্দহীন—নিবাত-নিকম্প প্রদীপবৎ নিশ্চল। নিরক্ষরা বালা, বঙ্গভাষায় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মনোহারিত্বে অনভিজ্ঞা হইয়া যেরূপ অভিনয় দেখাইল, তাহাতে বাস্তবিকই সভাস্থ সকলকে আশার অধিক, কল্পনার অতীত তৃপ্তি প্রদান করিয়াছে। রাণী ও মালিনী তুল্য প্রশংসা-সৌভাগ্য-ভাগিনী। জয়দুর্গা নামক এক অপেক্ষাকৃত বয়স্থা বামা কর্ত্তৃক রাণী ও মালিনীর অংশ সম্পাদিত হইয়াছিল। দুই স্বতন্ত্র আকারে সেও সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল। তাহার গান কি শোভন, কেমন মনোমোহন! রাজকুমারী নামে অপর এক নারী, বিদ্যার একতম সহচরী সাজিয়াছিল। অত্যুত্তম না হইলেও সেও জয়দুর্গার তুল্যমূল্য। রাজকুমারী, রাজু বলিয়াই সর্ব্বত্র জ্ঞাত।

এই দৃশ্য দর্শনে কি আমাদের পত্নী-পুত্রীদিগকে সুশিক্ষিত করিতে ইচ্ছা হয় না? রঙ্গমঞ্চে যে বালিকা এত গুণপনা প্রদর্শন করিল, সে যদি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত, তবে না জানি, তাহার আরও কত শোভা হইত! সেই বালিকাটী যাহা বলিয়াছে, তাহা মুখস্থ করিয়াই বলিয়াছিল; কিন্তু সে রীতিমত সুশিক্ষা পাইলে কি আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিত না যে, হিন্দুরমণী স্বীয় স্বামীর ন্যায় সুশিক্ষার আধার? হিন্দুনারী, শিক্ষাভাবে সমাজে নগণ্যের মধ্যে। (৪)

এই হিন্দু-নাট্যাভিনয়ের প্রবর্ত্তয়িতা বাবু নবীনচন্দ্র বসু প্রশংসা-ভাজন। তিনি যে উপায়ে আমাদের নারীদের অবস্থা সমুন্নত করিতে সমুৎসুক, সেজন্য

(৪) এই মতামতের সকল কথার সায় দিতে পারি না।

তিনি ধন্যবাদের পাত্র। এইরূপ নাটকাভিনয় অতীব বহুলব্যয়-সাপেক্ষ বটে, কিন্তু নবীনচন্দ্র বাবু স্বীয় উদ্যমে ও বিপুল বিত্তব্যয়ে ইহা নির্ব্বাহিত করিতেছেন। এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি ভারত-বন্ধুদের উন্নতি-কর্ম্মে বদ্ধপরিকর; ইহা কি অপার আনন্দের বিষয়! অপর বিভবশালীরা তাঁহার পদ-রজ অনুসরণ করেন, এই আমার বাসনা।

এই প্রশংসনীয় ক্রিয়ার সাফল্য প্রার্থনা করিতেছি। যত কাল এই অধ্যবসায়ী উদ্যোক্তা জীবিত থাকিবেন, তত কাল ইহার স্থায়িত্বে সন্দিহান নহি। হিন্দু-কামিনীদের মধ্যে যে কুপ্রথা বর্ত্তমান, তাহার প্রতি-বিধানার্থে তিনি যেন ফলপ্রদ কোন পন্থা আবিষ্কার করেন। তিনি নাট্য-শালাকে সজীব রাখুন হিন্দু নাট্যভূমির সদৃশ, যেন ইহার অঙ্কুরেই কোন ব্যাঘাত না ঘটে। এতদ্দ্বারা সমাজের নানা উপকার সংসাধিত হইবে ও সাধারণ্যে ইহার ভূয়সী সুখ্যাতি চলিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রিয়ার আব-শ্যকতা কি, কার্য্যেই প্রকাশিত।

৮। কেশবচন্দ্রের হামলেট-অভিনয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ—১২৬৩ সাল।

কেশবচন্দ্র, সেক্ষপীয়রের গ্রন্থগুলির সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি ঐ সকল পাঠ করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন না,—অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়া উঠিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাদের দলস্থ বয়স্যেরা একমত হইলেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের অনুরাগেও তাঁহারা বঞ্চিত হন নাই; সুতরাং দৃশ্য-পটাদি সাজ-সজ্জা সকল সংগ্রহ করিবার সূত্রপাত হইল। বাজার হইতে সাহেবগণের পরি ত্যক্ত পরিচ্ছদ ত্বরায় সংগৃহীত হইল। অভিনেতারা আপনাপন বদন চিত্রিত করিলেন। তাঁহাদের নিজ নিজ অভিনেতব্য অংশ যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে, হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র হামলেটের বিষয় সুন্দর অভিনয় করিয়া কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ডেন্‌মার্ক দেশীয় রাজকুমার হামলেটের প্রকৃতির সহিত কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সৌসাদৃশ্য বিলক্ষণ ছিল। বাবু

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, লেয়ার্টেসের (৫) বেশে উত্তম অভিনয় করিয়াছিলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ওফিলিয়া সাজিয়া অতি পরিপাটীযুক্ত অভিনয় করেন। অভিনয়ে তাঁহার সহৃদয়তা প্রকটিত হইয়াছিল। তখন বাবু নরেন্দ্রনাথের বালিকা-সুলভ সূক্ষ্ম, কোমল কণ্ঠধ্বনি ছিল। যেমন শিক্ষা, যেরূপ সুকুমার বয়স, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অভিনয়টীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিতে পারা যায়। ঐ অভিনয়, সময়ে সময়ে চলিয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে ইহাঁরা বিধবাবিবাহ-নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত করেন। বিধবাবিবাহ নাটক না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ অভিনয় চলিত। (৬)

৯। কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ—১২৬৩ সাল।

বাবু জয়রাম বসাকের ভবনে প্রথমতঃ ভদ্রার্জ্জুন নামক পুস্তকের আখ-ড়াই চলিতেছিল। যোড়াসাঁকোতে জয়রাম বসাকের বাটী ছিল। ভদ্রা-র্জ্জুনকে নাটক না বলিয়া পুস্তক বলার অভিপ্রায় কি, পাঠকগণের মনে এই প্রশ্ন উদিত হইতে পারে।

উহা প্রকৃত প্রস্তাবে নাটক আখ্যার উপযুক্ত হয় নাই। পুস্তক খানি পদ্যময়। "ভদ্রার্জ্জুন" এখন দুষ্প্রাপ্য—অপ্রাপ্য বলিলেও চলে। বাবু তারাচাঁদ শিক্‌দার, ঐ পুস্তক-প্রণেতা। কিছু দিন, ইহার অভিনয়-শিক্ষা চলিতে থাকে; কিন্তু এতৎ-সম্বন্ধে সকলের মত সমান না হওয়ায়, উহার অভিনয়-সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয় এবং কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকের রিহার্সেল চলিতে থাকে।

অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উক্ত বসাকের অনুষ্ঠানে এক রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হয় এবং তদীয় উদ্যানে উহার অভিনয় হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাস, ১২৬৩ সালের ফাল্গুনের শেষার্দ্ধ ও চৈত্রের প্রথমার্দ্ধ। ফাল্গুনের ১৬ই হইতে চৈত্রের ১৪।১৫ই নাং মার্চ্চ। মার্চ মাসের কোন্ তারিখে ঐ অভিনয় হয়, জানিতে পারিতেছি না। নতুবা ঠিক্ করিয়া বলিয়া দিতে

(৫) তিনি লর্ড চেম্বারলেন পলোনিয়সের পুত্র। পলোনিয়স কঞ্চুকী।

(৬) গত বারের শেষাংশে প্রকাশিত ইংরেজির ভাবার্কর্ষণে ইহা লিখিত হইল।

পারা যাইত, ফাল্গুনের বা চৈত্রের কোন্ নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ অভিনয়ের ঘটনা। মার্চ মাস, ফাল্গুন-চৈত্র-ব্যাপক। স্থূল হিসাব ধরিলে, খৃষ্টাব্দে ও সালে ৫৯৩ বৎসরের অন্তর; সূক্ষ্ম গণনায় ৫৯৪ বৎসরের ব্যবধান। অতএব ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ=১২৬৪ সাল, এইরূপ মোটামুটি গণনার এখানে আবশ্যকতা হইতেছে না।

"কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" এস্থলে বারদ্বয় অভিনীত হয়। এখানে সুপ্রসিদ্ধ সুনাম-খ্যাত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, দীননাথ ঘোষ (১), প্রিয়নাথ দত্ত প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রধান অভিনেতারা উপস্থিত থাকেন। প্রিয়নাথ দত্তের আগ্রহে প্রথমোক্ত ভদ্র লোকেরা এস্থলে অভিনয়-দর্শনের নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই জয়রাম বসাক, প্রিয়নাথ দত্তের মাতুল।

যাঁহারা এই অভিনয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের প্রধান-গণের নাম এই,—

(১) জয়রাম বসাক।—ইনিই গৃহস্বামী, অভিনয়ের প্রবর্ত্তক ও এক জন অভিনেতা।

(২) জগদ্দুর্লভ বসাক।—ইনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির অন্যতম শিক্ষক ছিলেন।

(৩) নারায়ণচন্দ্র বসাক। ইহাঁর পরিচয় অজ্ঞাত।

(৪) শ্রীরাধাপ্রসাদ বসাক। ইনি এখনও ঈশ্বর-কৃপায় জীবিত রহিয়াছেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ইনি এক জন পারিষদ্।

(৫) শ্রীমহেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়।—আর বুথনট্ কোম্পানীর আফিসের জনৈক বর্ত্তমান কর্ম্মচারী।

(৬) শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।—এজেণ্ট আফিসে কর্ম্ম করিতেন, এখন কণ্ট্রাক্টরী করিতেছেন। ইনি বাগ্‌বাজার-নিবাসী।

(৭) শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়।—ইনি বর্ত্তমান রাজকীয় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির কার্য্যাধ্যক্ষ। ইনি ঐ অভিনয়ে স্ত্রীলোক সাজিয়াছিলেন। তখন

(১) গতবারে অন্যত্র ইহাঁর পরিচয় দিয়া আসিয়াছি।

ইহাঁর বয়স ১৭ সপ্তদশ বর্ষ মাত্র (৮)। ইহাঁকে অভিনয়-ক্ষেত্রে এই প্রথম অবতীর্ণ হইতে দৃষ্ট হইল, পাঠকবৃন্দ. তাহা মনে রাখিবেন।

জয়রাম বাবুর প্রযত্নে যে কুলীন-কুলসর্ব্বস্বের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের রচিত। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে ১৮৫৪—৫৫ খ্রীষ্টাব্দে (১২৬১—৬২ সালে) বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের যত্নে ঐ নাটকের এক অভিনয় হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (৯)। তাহাই উহার প্রথমাভিনয়; সুতরাং এবারকার দুইটী অভিনয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয়।

১০। শকুন্তলার বাঙ্গালায় প্রথম অভিনয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে—১২৬৪ সাল।

উক্ত অভিনয়ের এক দিন পরে ছাতু বাবুর নিকেতনে বাঙ্গালা "শকুন্তলা" অভিনীত হয়। শকুন্তলার একটীমাত্র অঙ্কের অভিনয় হয়। ওরিয়েণ্টাল থিয়েটর ও বসাক বাটীর থিয়েটর এই রঙ্গশালাদ্বয়ের অভিনয়-সন্দর্শনই, এই অভিনয়ের উত্তেজক কারণ। এই অভিনয়ে জাতীয় ভাব, ~~কোন~~ আনা রক্ষিত হইয়াছিল। এক বার মাত্র এই অভিনয় হইয়াছিল এই "শকুন্তলা" কোন খ্যাতনামা লেখকের লেখনী-প্রসূত নয়; যাঁহারা অভিনয়-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদেরই কোন না কোন ব্যক্তির চেষ্টায় সমাহিত হইয়াছিল। ইহাতে শরচ্চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, মণিমোহন সরকার প্রভৃতি অভিনেতৃত্ব-কার্য্য গ্রহণ করেন। শরচ্চন্দ্র বাবু উত্তর কালে বঙ্গ-রঙ্গভূমি স্থাপন করেন। ইনি বিখ্যাত ছাতু বাবুর দৌহিত্র। প্রিয়মাধব বসু মল্লিক হোগলকুঁড়িয়া-নিবাসী। তিনি এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতামোদী। তৎকালে তিনি যাত্রার সাট প্রস্তুত করিয়া দিতেন। সুতরাং কি সঙ্গীত-রচনা, কি কথাবার্ত্তার গাঁথুনি, কি সুরজ্ঞান—সকল তত্ত্বেই তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত দুই স্থানের অভিনয়ের পর কাপ্তেন পামার, হিন্দু-কলেজের

(৮) ১২৪৭ সালে ২৬শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারে ইহাঁর জন্ম হয়।

(৯) গত বারের "অনুশীলনের" ৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

মাষ্টার রিচার্ডসন, সাহেব, রসিকলাল সরকার ইত্যাদি অনেক গণ্য-মান্য ব্যক্তি ইংরাজিতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডীয় মহাকবি সেক্সপীয়রের নাটকাবলী এই সময়ে বাঙ্গালী দ্বারা অভিনীত হইতে থাকে। মহাসমারোহে এই অভিনয় সম্পন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য মহা-মান্য লোকের মধ্যে অভিনয়-ক্ষেত্রে রাজা প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বাবু যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। এখানে নির্ব্বাচন করিয়া ইঁহাদের নাম উল্লেখের কারণ পাঠক দেখিতে পাইবেন, এই থিয়েটারের আকর্ষণে ইঁহারা আকৃষ্ট হইলেন। বঙ্গভাষানুরাগীদের এইটীই রীতিমত আনন্দ-প্রস্রবণ-স্বরূপ হইয়াছিল। কি ইংরাজি-শিক্ষিত, কি বিজ্ঞ, কি মধ্যবিধ,—সর্ব্ব-শ্রেণীর ইহা মনোরঞ্জন করে। ইহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অভিনয়ের স্বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই হইতেই কালীপ্রসন্ন সিংহের হৃদয়-কন্দর, নাট্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল।

কলিকাতার দেখাদেখি রাজধানীর বাহিরে বাঙ্গালা রঙ্গালয়-স্থাপনের আয়োজন ও অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন অংশে যথা—বহুবাজার, ঝামাপুকুর শুঁড়ী-পাড়া ইত্যাদি স্থানে অভিনয় হইতে লাগিল। এই অভিনয়-তরঙ্গ, রাজধানীকে প্লাবিত করিয়া, নগর, উপনগর, মফঃস্বলের প্রধান প্রধান স্থানে, চুঁচুড়ায় ও জনায়ে—অধিক কি গণ্ডগ্রামে না—অর্দ্ধোন্নত পল্লীগ্রামেও, দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" অভিনয়ের ধুম পড়িয়া গেল (১০)। পাঠক দেখিতে পাইলেন, তখন "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" নাটকের আদরের সীমা ছিল না। বাঙ্গলা-থিয়েটারের অভিনয়ের এই এক যুগ। তখন কেহই নূতন নাটক অভিনয় করিতে সাহস করিতেন না। এক "কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব" ও "শকুন্তলা" লইয়াই তখনকার অভিনয়-ক্ষেত্রে তুমুল আন্দোলন চলিয়া ছিল। আবার এক খানি নূতন যে জন্মিতে পারে, বা শকুন্তলা ও কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে, ইহা বোধ হয়, কাহারও ধারণা হইত না। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে সকল বিষয়ের উত্থান ও পতন

(১০) ভবানীপুরে ও শিবপুরেও ক্রমে অভিনয়ের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

আছে। এক জিনিষ চিরকাল ভাল লাগে না। সুতরাং কেবল শকুন্তলা কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয়ও চিরকাল চলিল না? যখন উক্ত দুই খানি নাটকের অভিনয় বার বার দেখিয়া লোকের বিরক্তি জন্মিল, তখন নূতন পুস্তকের অভিনয় আবশ্যক বোধে ছাতু বাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্বীয় বর্ত্তমান বীডন ষ্ট্রীটস্থ সিমলার বাটীতে কাদম্বরী অভিনয় করান। ক্রমে ক্রমে পুরাতন নাটকের আদর, সাধারণের নিকট কমিতে লাগিল। এই সময়ে জয়রাম বসাকের বাটীতে 'বেণী-সংহার' নাটকের অভিনয় পরম সমারোহে আরম্ভ হয়। বেণীসংহার সংস্কৃত নাটক। সংস্কৃত সাহিত্যে এক বেণী-সংহারই বীররসাশ্রিত নাটক। মহাভারতীয় আখ্যায়িকা ইহার অবলম্বন। ইহা ভট্টনারায়ণ-রচিত। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। কান্যকুব্জ হইতে যে দ্বিজ-পঞ্চক, গৌড়ে সমাগত হন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম। বঙ্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায়দের তিনি মূল পুরুষ।

১১। বেণীসংহারের ও বিক্রমোর্ব্বশীর অভিনয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ—১২৬৪ সাল।

এই সময়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ, নিজ-বাটীতে "বেণীসংহার" নাটক খানি অভিনীত করান। তিনিও ছাতু বাবুর ন্যায় ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার দর্শনে উত্তেজিত হইয়া এই বিপুল-ব্যয়-সাধ্য ব্যাপারে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। ইহা স্বজাতীয় ভাবোদ্দীপক হইয়াছিল। সিংহ, যেমনি স্বয়ং বিদ্যামোদী, তেমনই অন্যের বিদ্যোৎসাহ-দাতা ছিলেন। বর্ত্তমান কালের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, এই অভিনয়-কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন।

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি স্বয়ং রাজার অংশ অভিনয় করিতেন।

২। বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি এখনকার স্বনামধন্য এক জন সুপ্রসিদ্ধ বারিষ্টার।

৩। শ্রীবিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি ইহাতে স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করিতেন। (১১)

(১১) পূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, ইনি কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে প্রথমতঃ স্ত্রীজনের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহার পর ন্যূনাধিক অষ্ট মাস অতীত হইলে কালীপ্রসন্ন বাবু বিক্রমো-র্ব্বশীর অনুবাদ,পণ্ডিতের সহায়তায় প্রণয়ন করিয়া তাহারই অভিনয় করান। পুরুরবা ও উর্ব্বশীর বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত। উচ্চ-রাজ-কর্ম্মচারীদের রঙ্গ-নাট্যশালা-দর্শনে কৌতূহল অনল, প্রজ্বলিত হওয়ায় তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া ইহার কার্য্যে সমবেদনা প্রকাশ করেন। বীডন সাহেবও অন্যতম দর্শক। ইনি তাৎকালিক গবর্ণর জেনারলের এক প্রধান সেক্রেটরি। ইনি পরে বঙ্গেশ্বর হন। অভিনয়-দর্শনে ও সঙ্গীত-শ্রবণে দর্শকবৃন্দ বিমোহিত হইয়া ধন্যবাদ দেন। সেই প্রশংসাবাদ সর্ব্ববাদি-সম্মত। সকলেই উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে একবাক্য হইয়া অভিনয়ের ভূয়সী সুখ্যাতি করেন। সভ্য ভব্য,নবীন প্রাচীন, ভদ্র অভদ্র, শিষ্ট অশিষ্ট, প্রৌঢ় যুবা সকলেই নাটকের সুমধুর রস পানে উত্তেজিত হইয়াছিলেন।

১২। চুঁচুড়ায় কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ—১২৬৪ সাল।

কুলীনকুলসর্ব্বস্বের এতই তখন আদর হইয়াছিল যে, রাজধানীর বাহি-র্ভাগে উহার অধিকার স্থাপিত হইবার উপক্রম হইল। কেবল উপক্রম নয়—জাহ্নবী-জল অতিক্রম করিয়া অন্যত্র তাহার গতি হইল। ভাগীরথী-নীর-সংস্পর্শে যেন তাহার পবিত্রতা ও উজ্জ্বলতা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিয়া দিল!

যে সময়ে ভারত-মণ্ডলে ইংরেজ-মহলে প্রবল ক্রন্দন-কোলাহল—হুলস্থূল, —ইংলণ্ডে ভয়ানক রোল,তুমুল গণ্ডগোল, সুতরাং ইংরেজ-দল বিশৃঙ্খল—তজ্জন্য প্রায় সর্ব্বত্র গণ্ডগোল,—সেই দিনে মফঃস্বলবাসী বাঙ্গালী, আনন্দ-তুফানে তরী ভাসাইয়া মহাসুখের ক্রোড়ে নিমগ্ন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখের সিপাহী-বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়া এই কয় পঙ্ক্তি লিখিত হইল, বোধ হয়, তাহা অনুধাবন করিতে পাঠকের বাকী নাই।

১৩। পাইকপাড়ার রত্নাবলী।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ, ৩১ জুলাই—১২৬৫ সাল, ১৬ই শ্রাবণ শনিবার।

পাইকপাড়ার রাজগণ সাহিত্যানুমোদী বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের সত্বে

ও অধ্যবসায়ে তাঁহাদের বাটীতে এই সময়ে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হয়। ১৯১৪ সংবতে (১২) ২৮শে ফাল্গুনে উহা প্রকাশিত হয়। বৎস ভূপতি ও সাগরিকার বিবরণ, রত্নাবলীর অন্তর্গত। ইহার চারিটী অঙ্ক। বৎস রাজকে সন্দর্শন করিয়া সাগরিকা, বিরহ-বিধুরা হইয়াছিলেন। দৈবযোগে রাজার সঙ্গে সাগরিকার সাক্ষাৎ হয়। সাগরিকা রাজ-পত্নী বাসব-দত্তার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজমহিষীর বেশে রাজসম্মিলিত হন।

যাবতীয় গণনীয় লোক ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার হইতে এবারে অপেক্ষাকৃত ভাল অভিনয় হইয়াছিল, তাহা অসঙ্কোচে বলিতে হইবে। এই অভিনয়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লিপ্ত ছিলেন।

১। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

২। তারাচরণ গুহ (হোঁগোলকুঁড়িয়ার শিবগুহের দ্বিতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র)।

৩। প্রতাপনারায়ণ সিংহ।

৪। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ইত্যাদি।

ইংরাজি ১৮৫৮ সালের ঘটনা এই পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করা গেল। নাটকীয় রসাস্বাদে বাঙ্গালী ক্রমশঃ বিভোর হইতে লাগিলেন।

যে পর্য্যন্ত স্বদেশ-বৎসল রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ স্বদেশের মঙ্গল এবং উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত এদেশীয় কোন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঐক্যতান-বাদনও সংগঠিত হয় নাই। এই গীত-সম্প্রদায়-গঠনে সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এবং বাবু যদুনাথ পাল প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ই প্রথমে এদেশীয় রাগ রাগিণী সংযুক্ত করিয়া বেলগেছিয়া অবৈতনিক সম্প্রদায় নামক একটী দল গঠন করেন। বাবু যদুনাথ পাল ইহার অধিনেতা থাকেন। এই সম্প্রদায় এতদ্দেশীয় সঙ্গীত-বিরোধী ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কতক অপক্ষপাতী এবং ন্যায়দর্শী সাহেবের নিকট প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিল। আশা ছিল, এই সম্প্রদায়ই এদেশীয় সঙ্গীত সম্প্রদায়ের আদর্শ হইবে; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে ঐ সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী অধি-

(১২) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।

নেতারা উহার সহিত ইয়ুরোপীয় সুর মিশ্রিত করিয়া ইহাকে মিশ্রিত সম্প্রদায় করিয়া ফেলিয়াছেন। বেলগেছিয়া থিয়েটার যে, আশাতীত কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহা এক্ষণে প্রবাদ-স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কার্য্যসফলতা, এদেশীয় অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অতুলনীয়। উহার সুন্দর রঙ্গমঞ্চ, রমণীয় দৃশ্যপট, হৃদয়োন্মাদকারী সঙ্গীত, চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদ, বহুমূল্য উপকরণ, বিশাল আয়োজন সমস্তই দুই রাজার এবং তাঁহাদের প্রিয় বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ নাট্যামোদী বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপযুক্ত হইয়াছিল! শুদ্ধ রত্নাবলীর অভিনয়েই রাজাদিগের দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহা দ্বারা হিন্দু নাটকের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই উন্নতিশীলতায় লোকের মনে অভিনয়-রস জন্মাইয়া দিয়াছিল।

এই নাট্যসম্প্রদায়, আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত যুবকগণ দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। অভিনেতৃগণের মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলির নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হাস্যোদ্দীপক ক্ষমতা থাকায় তিনি বিদূষকের প্রকৃত অনুকরণ করিতে পারিতেন। তাঁহার এত হাস্যোদ্দীপক ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহাকে বাঙ্গালা-রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহের অবয়ব প্রকৃত রাজার ন্যায় ছিল। তিনি বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক রত্ন-খচিত তরবারি পার্শ্বে বিলম্বিত করিয়া যখন অভিনয় করিতেন, সে সময় তাঁহাকে প্রকৃত সেনাপতির ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সুতরাং দর্শকমণ্ডলী মোহিত হইতেন। সাগরোদ্ধৃতা নায়িকা সাগরিকা বিপত্তিকালে অসীম-ধৈর্য্যশালিনী, কোমলান্তঃকরণা এবং প্রেমময়ী বলিয়া নাটকে উল্লিখিত হইয়াছে। একটী সুন্দর বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ-বালক, ঐ অংশ অভিনয় করিত। উহার মধুর সঙ্গীতে দর্শকমণ্ডলী বিমোহিত হইতেন। রাজ্ঞী-বৎ প্রতীয়মানা রাণী বাসবদত্তার অংশ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী নামক জনৈক সুন্দর বালক অতি উত্তম রূপে অভিনয় করিত। তিনি মূল শ্লোকের প্রকৃত অনুকৃতি করিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন—প্রিয়তম জীবনের সমস্ত আশাই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ জীবন এখন তাঁহার পক্ষে অসহনীয়। যে দৃশ্যে ঐন্দ্রজালিক শ্রীনাথ রায়, তন্ত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক

কাশ্মীরাধিপতি রাজা উদয়নের গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন; এবং তৎকালে অজ্ঞাত এক বস্তু দ্বারা যখন লোহিত বর্ণ অগ্নি-শিখা উৎপাদিত হইতে-ছিল, সে দৃশ্য এবং যে দৃশ্যে কদলী-বনের পশ্চাদ্ভাগে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছিল, তাহা দর্শকমণ্ডলীকে একবারেই আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। যেরূপে প্রত্যেক অভিনেতা অতি দক্ষতার সহিত আপন্যাপন অংশ অভিনয় করেন, তাহা দর্শক-মণ্ডলী দর্শন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত দর্শকমণ্ডলী কলিকাতার ধনী সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত এবং ইয়ুরোপীয় সমস্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তির সমষ্টি। প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারিগণ এবং অপ-রাপর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই অভিনয় দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত-বিষয়ে ভারতবর্ষীয় রঙ্গালয়-সম্বন্ধে এই অভিনয়, তাঁহা-দের মনে অতি উচ্চ ধারণা করিয়া দিয়াছে।" বঙ্গের ছোট লাট স্যার ফ্রেডারিক হালিডে সপরিবার তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়ে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি কেশব বাবুকে নাটকীয় তত্ত্বে মহাগুণী বলিয়া ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "কেশব বাবুর শান্ত ও সুগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া এক জন কখনও অনুমান করিতে পারে না—তিনি এত দক্ষতার সহিত বিদূষকের অংশ অভিনয় করেন।" স্বদেশীয় দর্শক-মণ্ডলীও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। এই নূতন অভিনয়, এদেশীয়দের বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নব ভাব উপস্থিত করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে, বেলগেছিয়া থিয়েটার এক মহান্ আন্দোলন আনয়ন করিয়াছিল।

একটী সামান্য ঘটনা-স্বরূপে ইহা উল্লিখিত হইতে পারে। এক জন ধনী ব্যক্তি রাজাদিগের নিকট হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে নিমন্ত্রণ না পাইয়া এমন কি একখানি টিকিট ক্রয় করিবার নিমিত্ত শতাধিক মুদ্রা দান করিতে প্রস্তুত হই-য়াছিলেন। এই কথা কিছু অতিরঞ্জিত বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, তৎকালীন লোকে বেলগেছিয়া অভিনয়-দর্শনার্থ কিরূপ ব্যগ্র হই-য়াছিলেন। যে মাননীয় বৃদ্ধ ব্যক্তি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাবু নবীনচন্দ্র

বসুর শ্যামবাজার-স্থিত বাটীতে তাঁহার বিপুল অর্থ ব্যয়ে সংগঠিত, বিদ্যা-সুন্দরের অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন, যিনি কখনও ইংরাজি-অভিনয় দর্শন করেন নাই, এই অভিনয় দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার আশাতীত এবং রঙ্গমঞ্চে যে মানবকার্য্য এবং মানব-প্রকৃতির এরূপ প্রকৃত অনুকৃতি হইতে পারে, ইহা তাঁহার কল্পনার সীমা-বহির্ভূত। এই স্থানেই মাইকেলের কবিত্ব-শক্তির কর্ত্তব্য-বোধ জাগ্রৎ হইয়াছিল। এক খানি ইংরাজি পত্র ও তাহার বঙ্গানুবাদ, আবশ্যক বোধে প্রদত্ত হইল।

11 P. M
11th July, 1858
After the Rehearsal.

My dear Gour,

I am really astonished at your conduct. You are the friend who is determined to put me to shame, not only before the Amateur Company, with which we have identified ourselves but before the audience that we expect on the night of the performance. Barring yourself there is not a single individual who trifles or absents himself from the stage on the Rehearsal night. If you are unwilling to be the fool of an Actor (for there are some who really think Amateur Actors to be fools if not vagabonds) why not say that plain and plump? You must know that after so much trouble, anxiety, expense and what not, I am not the man to abandon the idea and throw the theatre and all to the dogs. No; call me fool, a vagabond or any name you wish, I am not so silly as to relinquish one of my favourite hobbies, the drama. I am in right earnest and must perform my part, and have the play acted out, notwithstanding the difficulties, friends like you put in the way. Now be plain once for all and tell me that you will not absent yourself again. * * *

I shall have every-thing ready by Thursday next, as we appear publicly on the 19th inst.

* * * * * * * *

Yours sincerely
Issur Chandra Singh.

P. S.—The next Rehearsal takes place on Tuesday; the four acts will be rehearsed.

প্রণয়াস্পদেষু—

তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছি। আমরা আখড়াই দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছি, তুমি আমার বন্ধু হইয়া আমাকে যে কেবল তাহাদের সম্মুখে অপদস্থ করিতেছ, তাহা নয়;—অভিনয়ের দিবস যে শ্রোতৃবর্গ আগমন করিবেন, তাঁহাদের নিকটও আমায় অপদস্থ করিবে। তুমি ব্যতীত এই আখড়াই রাত্রিতে অন্য কেহই রঙ্গমঞ্চে অনুপস্থিত হয় নাই অথবা ইহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে নাই। যদি তুমি নট হওয়া নির্ব্বোধের কার্য্য বলিয়া ইহা সম্পাদন করিতে অনিচ্ছু হইতেছ (বাস্তবিকই কতকগুলি ব্যক্তি সখের দলকে বোকার অর্থাৎ ভবঘুরের আড্ডা বলিয়া মনে করে) স্পষ্ট করিয়া মনের কথা বলিতেছ না কেন? তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, এত যত্ন, এত কষ্ট এবং এত ব্যয় স্বীকার করিবার পর আমি কখন এই আশা পরিত্যাগ করিব না অথবা রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতিকে উৎসন্ন হইতে দিব না। তুমি আমাকে নির্ব্বোধ, ভবঘুরে অথবা যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, কিন্তু আমি এত মূর্খ নই যে, আমার এত আদরের বস্তু, এই নাটক পরিত্যাগ করিব। তোমার ন্যায় বন্ধু যতই বাধা দিক না কেন আমি অটল অধ্যবসায়ের সহিত আমার কার্য্য ও অভিনয় সম্পাদন করিব। এক্ষণে এক বার মাত্র সরল হইয়া বল না আর কখন অনুপস্থিত হইবে কি না * * * আমায় বৃহস্পতিবারের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিতে হইবে কারণ ১৯শে অভিনয়ের দিবস ধার্য্য হইয়াছে।

* * * *

১৮৫৮। ১১ই জুলাই (১৩)

ত্বদীয় বিশ্বাসভাজন
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সিংহ।

পুনশ্চ।—মঙ্গল বারে আবার আখড়াই হইবে। ইহাতে চারিটী অঙ্কের পুনরায় রিহার্সেল হইবে।

ছাতু বাবুর বাটীতে অভিনয় সন্দর্শনের পর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রস্তাবে প্রতাপচন্দ্রের উদ্যোগে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগেছেস্থিত উদ্যানে

(১৩) ১২৬৫ সাল, ২৮শে আষাঢ় রবিবার।

স্থায়ী রঙ্গালয় স্থাপনের চেষ্টা হয়। প্রচুর ব্যয়ভার, প্রতাপচন্দ্রের উপর নিপতিত হইল। এই সময়ে ঐক্যতান বাদন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই সূত্রে সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ধন্যবাদ দিতে হইবে। অভিনয়োপযোগী সুনাটক না থাকায় সংস্কৃত কালেজের রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের উপর উত্তম নূতন বাঙ্গালা নাটক প্রণয়নের ভার ন্যস্ত হইল। সংস্কৃত "রত্নাবলী" হইতে এক নাটক প্রস্তুত হইল (১৪)।

বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট হালিডে (১৫), উচ্চ আদালতের বিচারকগণ প্রভৃতি গণ্যমান্য লোকেরা অভিনয়-দর্শনার্থে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এত সমারোহে অভিনয়—সাড়ম্বর ঘটা, নাট্যসমাজের অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। দৃশ্যপট, বেশ-বিন্যাস, আভরণ-বাহুল্য, সঙ্গীত, স্বাভাবিক অভিনয় এই সকল একত্র করিয়া বুঝিলে বলিতে হয়, তাহা অতুল্য, অদ্বিতীয়। দৃশ্যপটে দর্শক বিমুগ্ধ; শ্রোতা গানে বিমুগ্ধ।

এই সময় হইতেই বঙ্গে যথার্থ নাটকাভিনয়ের এক নূতন পথ প্রদর্শিত হইল। অর্থের অভাব ছিল না—অর্থ ব্যয়েও কেহ কুণ্ঠিত হইতেন না। মনোরম অভিনয় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সাজসজ্জা, ভাল পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটাদি যথেচ্ছ ব্যয়ে সুসমাহিত হইয়াছিল। অভিনয়কারীদের ও দর্শকগণের জন্যে এই যুগ সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া অনুমিত। ইহার পূর্ব্বে যে সকল স্থানে অভিনয় হইত, তাহা প্রায়ই দুই এক দিনের আমোদ-প্রমোদেই নিবৃত্ত হইত; কিন্তু বেলগেছিয়া-নাট্যশালার অভিনয় অনেক দিন ধরিয়া জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। ইহাদিগের অভিনয়-সন্দর্শনে বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই মোহিত হইতেন এবং সেই সময় হইতেই গীতাভিনয়ে নবযুগের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।

বেলগেছিয়া নাট্যশালায় কিরূপ সম্প্রদায়ের ধনী, গুণী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ

---

(১৪) মাইকেল কর্তৃক উহা ১৮৫৭—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ-মধ্যে ইংরাজিতে অনুবাদিত হয়। রাজভ্রাতৃগণ ৫০০ টাকা পারিশ্রমিক দেন। এই অভিনয়ে উহা সাহেবদিগকে প্রদত্ত হয়।

(১৫) ১৮৫৪—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ছোট লাট ছিলেন।

ব্যক্তি সকল অভিনয় করিতেন নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। বাবু প্রিয়নাথ দত্ত—রাজা উদয়ন।

২। „ কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—বিদূষক।

৩। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র—সেনাপতি রুমণ্বান্।

৪। বাবু গৌরদাস বসাক—রাজমন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ।

৫। „ দীননাথ ঘোষ—

৬। „ রমানাথ লাহা—নটী।

১। বাবু প্রিয়নাথ দত্ত।—গবর্ণমেণ্ট ফাইনান্সিয়াল বিভাগের আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলারের কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সে সময় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তখনকার অভিনয় এত সুন্দর এবং সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইত।

২। বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ইহার ন্যায় অভিনয়-কার্য্যে পারদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বেশি হয় সে সময়ে আর ছিলেন কি না সন্দেহ। কলিকাতা রিভিউ (Calcutta Review) নামক পত্রিকায় বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষয় কিরূপ প্রশংসার সহিত লিখিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত দুই চারি ছত্র পাঠ করিলেই সবিশেষ প্রতীয়মান হইবে।

"The Gem of the actors was Vasantaka who was represented by Babu Keshab Chandra Ganguly. His ready wit, his brilliant bonmots and inimitable Comic humour, may fairly entitle him to the praise of being the best actor in Bengal. He kept up the interest of the play most successfully and was the life and soul of the performance."

"মেঘনাদ-বধ"-রচয়িতা স্বর্গীয় কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কিভাবে দেখিতেন এবং তিনি তাঁহার গুণের কত দূর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা তিনি স্বরচিত "কৃষ্ণকুমারী" নাটক তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া নিজ মনোভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"মঙ্গলাচরণ।

"মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মহাশয় মহাশয়েষু

"মহাশয়!

"আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গ দেশীয় নটকুল-শিরোমণি, ইহার দোষ ও গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা, ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায় জানিতে পারেন, যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ এক জন মহোদয় ব্যক্তি, মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিতেন।

"আমাদের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শন কাব্যের উন্নতি-বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা দর্শনকাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি, যে মৃত রাজা মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার বৃদ্ধি-বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা মহাশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে, আর এ পথের পথিক হই! হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?

"এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্য রচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সুন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য, যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ-সমীপে আদরণীয় হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব, ইতি।

গ্রন্থকারস্য

নিবেদনমিতি।" (১৬)

(১৬) মাইকেলের জীবনচরিত-লেখক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু বি, এ, এই "মঙ্গলাচরণের" ভাষা পরিবর্ত্তিত কেন করিয়াছেন, বলিতে পারিলাম না।

৩। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র। পাইকপাড়ার রাজা। তিনিই এই অভিনয়ের উদ্যোগী।

৪। বাবু গৌরদাস বসাক। ইনি এক জন প্রবীণ ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট ও বিদ্বান্ ব্যক্তি।

৫। বাবু দীননাথ ঘোষ। তিনি যোগ্যতার সহিত গবর্ণমেণ্ট ফাইনান্সিয়াল বিভাগে কার্য্য করিয়া রায় বাহাদুর উপাধি ও স্পেসিয়াল পেন্‌সন্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৬। বাবু রমানাথ লাহা। হাইকোর্টের এক জন প্রধান এবং প্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন স্বর্গীয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ডাক্তার্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি দেশের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বেলগেছিয়া নাট্যশালার সহিত বিশেষ সমানুভূতি প্রদর্শন করিতেন।

মহারাজ সার্ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, ক্ষেত্রমোহনগোস্বামী, বাবু যদুনাথ পাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ঐকতান-বাদন-সম্প্রদায়ের নেতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন।

বেলগেছিয়ায় নাট্যশালা-স্থাপনের পূর্ব্বে যদিও অনেক স্থানে অভিনয় হইত এবং অনেকে এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু এরূপ পরিপাটী পূর্ব্বক অভিনয় কার্য্য আর কেহ তৎপূর্ব্বে করেন নাই। সেই সময় হইতেই বাস্তবিক নাট্যসমাজে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বর্ষান্তরে।

সারা বর্ষ গেছে চলে হেরি নাই সেই মুখ
সেদিন হেরেছি আমি তাহা,
জীবনে যাতনা সহি এত দিন সযতনে,
হৃদয়ে পুষিয়াছিনু যাহা।
হেরিব সে মুখ-প্রান্তে জীবন-সঞ্চারী হাসি
ভাসিবে সে নয়ন ইঙ্গিতে,

সে আশা বিফল হ'ল ফিরিলাম মহীত্বথে
আশা যেন ফুরাল চকিতে।
এক দিন সে নয়নে হেরেছিনু পূর্ণ জ্যোতি
আজ সে নয়ন জ্যোতির্হীন—
হাসি-ভরা মুখ-খানি, হয়ে আছে ম্রিয়মাণ
শুকাইছে দেহ দিন দিন।
না জানি কি ব্যথা তার পরাণ রেখেছে ছেয়ে
মুখে তাহা উঠিছে ফুটিয়া,
বার বার কত বার চাহিছে লুকাতে সে যে
হুতাশন অন্তরে চাপিয়া।
হৃদয়ে সে বল নাই, যাইতে তাহার কাছে
জিজ্ঞাসিতে বেদনা তাহার,
যদি সে কোমল প্রাণে অজানা-ব্যথাটি পায়
তবে সে যে বাঁচিবে না আর।
হা বিধাতা! তুমি কোথা, যেথা যত সুখ আছে
তোমার এ অনন্ত ভাণ্ডারে,
কাতর প্রার্থনা শুনি' একত্র সংগ্রহ করি'
উপহার দেও গো তাহারে।
সে যেন জানে না, আমি, তার সাথে সাথে আছি
তারে আমি কভু না ছাড়িব,
ভ্রমিবে অনন্ত সুখে অনন্ত আহ্লাদে সে গো
আমি তার ছায়া হ'য়ে রব।
এই কটি ছত্র যদি কভু তার হাতে পড়ে
জানিব এ জীবন সফল,
এতেও যদি না সে গো নয়ন তুলিয়া চায়,
জানিব এ জনম বিফল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত।

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ। } ১৩০১ সাল, অগ্রহায়ণ। { তৃতীয় সংখ্যা।

চন্দ্রা।

৬

বিগত ঘটনার পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসরে জগতে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! কত লোকের আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কত লোকে নবোদ্যমে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে! সুখ দুঃখ হাসি জগতের কাহারও নিকট চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ নয়। পরিবর্ত্তনশীল জগতে সকলই পরিবর্ত্তন-নিয়মের অনুগত।

প্রফুল্ল বাটী ত্যাগ করিয়া একেবারে গাজিপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে যে তাহার কোনও চাকরি পাইবার আশা ছিল, তাহা নয়। সেখানে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; তাঁহাকে নিজের দুরবস্থার কথা সমুদয় জ্ঞাপন করিল। অনেক কথাবার্ত্তার পর ভদ্রলোকটী বলিলেন—"কোন মাড়ওয়ারি মহাজন একটী সুদক্ষ বাঙ্গালী কর্ম্মচারী চাহেন। তাঁহার বিশ্বাস, বাঙ্গালীগণ অতি কর্ম্মপটু এবং বিশ্বাসী। সে মাড়ওয়ারির সহিত আমার আলাপ আছে। তাঁহাকে তোমার কথা বলিয়া দেখিব। প্রফুল্ল অন্য স্থানে যাইতে চাহিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কোন মতে রাজী হইলেন না।

যাহা হউক, কয়েক দিন পরে প্রফুল্ল মাড়ওয়ারির নিকট ৭৲ টাকা বেতনে একটী চাকরি পাইল। মাড়ওয়ারির নাম কিষণ দাস। তাঁহার

গোলাপের চাষ এবং আতরের প্রকাণ্ড ব্যবসা ছিল। তাহারই তত্ত্বাবধারণ করিতে সে নিযুক্ত হইল।

দুই বৎসরের মধ্যে প্রফুল্ল কার্য্যে বিশেষ উন্নতি করিল। এখন তাহার মাহিনা তিন শত টাকা। এই কার্য্যে প্রফুল্ল নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে কর্ম্মচারিগণ অত্যন্ত চুরি করিত; মাড়ওয়ারির বিশেষ ক্ষতি হইত। প্রফুল্ল আসিয়া সুদক্ষ, ভাবে তত্ত্বাবধারণ করাতে মহাজনের বিস্তর লাভ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ প্রফুল্লের নম্রতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং কারকারের যাবতীয় কার্য্য, প্রফুল্লের হস্তে দিলেন।

প্রফুল্ল মাসে মাসে বাড়ীতে টাকা পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু বাড়ী যাইতে চাহিলে কিষণ দাস, তাহাকে কোন মতেই যাইতে দিতে চাহেন না। তিনি বলিতেন, "তুমি এক দিনের জন্য গেলে ব্যবসা মাটী হইবে। তাহার কারণ এই আমি জানিতে পারিয়াছি, জনকয়েক লোক তোমার পশ্চাতে লাগিয়াছে।" সুতরাং প্রফুল্লের আর বাড়ী যাওয়া হয় না।

এক দিন কিষণদাস প্রফুল্লকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি তোমার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আজ যে আমার ব্যবসায় এত উন্নতি, সে কেবল তোমারই চেষ্টায়; সুতরাং ব'লতে গেলে, যে টাকা আমার লাভ হ'য়েছে, সে তোমারই চেষ্টায়। আমি অত টাকা আশা করি নাই। আমার দুই লক্ষ টাকা, অথচ আমার পুত্রকন্যা কেহই নাই—তোমাকে আমি পুত্রাপেক্ষা ভাল বাসি। কবে মরে' যাব, তার ঠিকানা নাই। এ কাগজ খানা রেখে দাও।" এই বলিয়া এক খানি কাগজ দিলেন। প্রফুল্ল তাহা পাঠ করিয়া দেখিল, কিষণদাস তাহাকে তাঁহার সমুদায় বিষয়ের অধিকারী করিয়াছেন। কৃতজ্ঞতায় ও আহ্লাদে তাহার চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে অনেক ক্ষণ পরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, আপনি আমাকে পুত্রের মত ভালবাসেন, তাতেই যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হ'য়েছে। আপনার কর্ম্মচারি-স্বরূপ আমি যা ক'রেছি, তা আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ব'লেই করেছি। সুতরাং এ টাকায় আমার আদৌ দাবী নাই।"

কিষণদাস প্রফুল্লের কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "সে কথার আলোচনার কাজ নাই। তোমার বিশ্বস্ততার পারিতোষিক-স্বরূপ তোমাকে এই সামান্য বিষয়টী দিলাম। এতে অমত ক'র্‌লে আমার ভারি কষ্ট হবে"।

প্রফুল্ল আর কিছু বলিতে পারিল না—কিষণদাসের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিল।

তারই কিছু দিন পরে প্রফুল্ল এক দিন এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইল, "চন্দ্রার ভয়ানক ওলাউঠা হইয়াছে, সুতরাং যত শীঘ্র পার, চলিয়া আসিবে"।

টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল অন্ধকার দেখিল।

তাড়াতাড়ি কিষণদাসের নিকট বিদায় লইয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ী করিয়া রওয়ানা হইল। প্রফুল্লের মনে তখন ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল।

প্রফুল্ল অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, শুনিয়া মাতার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। অপত্যস্নেহ বিনষ্ট হইবার নহে। প্রফুল্লের মাতা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; প্রফুল্লের ভাবনায় একপ্রকার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন, বলিলেই হয়। কেবল উর্ম্মিলার যত্নে সামান্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন।

চন্দ্রা, প্রথম প্রথম দিনরাত্রি কাঁদিত। উর্ম্মিলা অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিত; কিন্তু অনবরত স্বামীর নিমিত্ত চিন্তা করাতে চন্দ্রার শরীর রুগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আহারে তাহার রুচি বা রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না।

প্রথম প্রথম উর্ম্মিলারও যে কষ্ট হয় নাই, তাহা নয়। সে কাহারও সম্মুখে ক্রন্দন করিত না; কিন্তু চন্দ্রাকে কার্য্য করিতে করিতে উর্ম্মিলা অশ্রুত্যাগ করিতে দেখিয়াছে। এক দিন সন্ধ্যা বেলা বাটীর সম্মুখে পুকুর-ধারে উর্ম্মিলা, ভ্রাতার জন্য কাঁদিতেছিল, এমন সময় চন্দ্রা আসিয়া ধরিয়া ফেলে। সেই দিন অনেক রাত্রি অবধি দুজনে প্রফুল্লের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছিল। প্রফুল্লের মাতা নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বধূকে আর কিছু বলিতেন না; বরং তাহার যত্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এত যত্নে ও আদরেও চন্দ্রার হৃদয়ে চিন্তাবেদনা অপহৃত হয় নাই; মধ্যে মধ্যে প্রফুল্লের পত্র পাইলে

তাহা প্রশমিত হইত মাত্র। তাহার এই বদ্ধমূল ধারণা ছিল, কেবল তাহারই জন্য স্বামী, বিদেশে গিয়া কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। তাহারই জন্য শ্বশ্রূঠাকুরাণীর মনে এত বেদনা এবং উর্ম্মিলার এত কষ্ট করিয়া তাহার যত্ন ও শুশ্রূষা করা। এই আত্ম-দোষ-বোধে তাহার শরীর, দিন দিন জীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার মুখে আর হাসি দেখা যায় না। দুরন্ত ভাবনায় শরীর এমনই বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না।

প্রায়ই প্রফুল্ল চিঠি লিখিত। চিঠির কাগজের উপর অনেকগুলি অশ্রুবিন্দু ফেলিয়া, কালী মাখাইয়া, "মাথা খাও, শীঘ্র আসিবে" পাঁচ ছয় বার লিখিয়া চন্দ্রা তাহার উত্তর দিত। কিন্তু প্রফুল্ল নানাপ্রকার কারণ দর্শাইয়া লিখিত—"প্রভু, এখন আমাকে এক দিনের নিমিত্তও ছাড়িতে চাহেন না, সুতরাং এখন যাওয়া হয় না; শীঘ্রই যাইব।"

চন্দ্রা স্বামীর আগমন-প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিত। যে দিন রাত্রিতে প্রফুল্ল বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেদিন চন্দ্রালোকে অবলোকিত তাহার বিষণ্ণ মুখ-খানি মনে পড়িলে তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সে সেই জানালার ধারে মস্তক রাখিয়া অধিক রজনী অবধি পথের পানে কেন কে জানে চাহিয়া থাকিত। স্বামীর ক্লিষ্ট মুখখানির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের খেলাধূলা ভালবাসার কথা এক এক করিয়া মনে জাগিয়া উঠিত! দূরাগত বসন্ত-সমীরণের সহিত তাহার প্রাণ উদাস হইয়া যাইত। সে কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া সেই জানালার নিকটেই ঘুমাইয়া পড়িত। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কত কষ্ট সহ্য হইবে?

দেখিতে দেখিতে সময় চলিয়া গেল। এক দুই তিন করিয়া পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি প্রফুল্ল বাটী ফিরিল না। চন্দ্রার চিন্তারও বিরাম হইল না।

এই প্রকার অনিয়ম, অত্যাচার ও অকারণ রাত্রি-জাগরণে এক দিন হঠাৎ চন্দ্রার ওলাউঠা হইল। একে ক্ষীণ শরীর, তাহাতে আবার ওলাউঠা হওয়াতে অল্প সময়ের মধ্যেই চন্দ্রা অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ডাক্তার আনা হইল। তিনি বলিলেন, "রোগটী সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তাহার কারণ, অনিয়ম ও অত্যাচার বলিয়াই বোধ হয়। আর একটা কথা। অনেক কাল হইতে ইহার হৃদ্‌রোগ ধরিয়াছে, সেই জন্য যাহা কিছু সামান্য আশা ছিল, তাহাও আর নাই। তবে চেষ্টা করিলে কি হয় বলিতে পারি না।"

অনেক চেষ্টা করা হইল, কিছুতেই কিছু হইল না। অগত্যা পাড়ার কোন ভদ্রলোক দ্বারা প্রফুল্লের নিকট তারে খবর করা হইল।

(৮)

গাড়ীতে প্রফুল্লের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। সে ভাবিল, "কেন আগে বাড়ী ফিরিয়া গেলাম না? বোধ করি, ভাল রকম চিকিৎসা হইতেছে না, সুতরাং রোগও সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইতেছে!" নিজেকে অনেক ধিক্কার দিল—ভাবিতে লাগিল, "চন্দ্রা এত করিয়া যাইবার জন্য লিখিয়াছিল, কেন যাই নাই? সেই দুঃখে হয় তো কত দিন সে আহার-নিদ্রা করে নাই।" শেষে তাহার বর্ত্তমান রোগের কথা ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, "আজ আমি ক্রোড়পতি। আমি চন্দ্রার জন্য সমস্ত টাকা দিতে রাজী আছি। কেউ কি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবে না?" ভাবিতে ভাবিতে সে অবসন্ন হইয়া রেলগাড়ীর জানালার ধারে মস্তক রাখিয়া শুইয়া পড়িল। ট্রেনের দ্রুতগতি, আজ তাহার মনোবেগের নিকট সামান্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল প্রত্যূষে গ্রামের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে পৌঁছিল; তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া বাটীর অভিমুখে যাইতে লাগিল।

তখনও সূর্য্য উঠেন নাই,—দূরে বাগান হইতে দু' একটা পাখী মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া শান্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। দু' এক জন কৃষক, সুমিষ্ট রসালাপ করিতে করিতে গরু লইয়া ক্ষেত্রে গমন করিতেছিল। দূর হইতে বসন্তের প্রভাতী মৃদু বায়ু প্রফুল্লের উত্তপ্ত কপালে ঝির্ ঝির্ করিয়া আসিয়া লাগিতেছিল। আজ স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে প্রফুল্লের অবসর ছিল না। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া আজ সে বাটীর দিকে চলিয়াছে।

যেদিন সে বাটী ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেদিনকার কথা মনে পড়িল।

মনে পড়িল, যাত্রার সম্মুখস্থ জানালায় আকুল-নেত্রে চন্দ্রা তাহার দিকে চাহিয়াছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এক বার মনে আশা হইল, তাহার প্রতীক্ষায় চন্দ্রা সেই প্রকার জানালায় বসিয়া আছে। তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া এক বার পাচ বৎসরের ঘটনাবলি বর্ণনা করিয়া কেন আসিতে পারে নাই, তাহার কারণ দেখাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! কিন্তু ও কি?

অস্পষ্ট সূর্য্যালোকে দূরে বাটীর জানালা দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু কেন ওখান হইতে মৃদু ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে?

প্রফুল্ল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা—চন্দ্রার বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেল। কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে উন্মত্তের ন্যায় বাটীর দিকে দৌড়িল।

(৯)

চন্দ্রার অবস্থা প্রত্যেক ঘণ্টায় মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। ডাক্তার বাবু আশা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। প্রফুল্লের মাতা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ঊর্ম্মিলা অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া রহিল। তাহার উৎকণ্ঠা হইতে লাগিল, দাদা শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিতে পারিবেন কি না। চন্দ্রা নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—"ঠাকুরঝি তিনি কোথায়? একবার শেষ দেখা হবে না?"

ঊর্ম্মিলা কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলিল, "ও কি কথা দিদি? তুমি এখনই ভাল হয়ে যাবে।" চন্দ্রা কিছু বলিল না—কেবল একটু ক্ষীণ হাসিল মাত্র। সেই হাসিতেই বুঝাইল, "আমার জন্য আশা করা বাতুলতামাত্র।"

ঊর্ম্মিলা একটী ঔষধ খাওয়াইয়া দিতে গেল। চন্দ্রা বলিল, "আর কেন দিদি আমি কি নিজে বুঝ্‌তে পারছি না? তবে কেন মিথ্যা চেষ্টা; ঊর্ম্মিলা ভুলিবার পাত্রী নহে, অনেক বুঝাইয়া ঔষধ খাওয়াইল।

চন্দ্রা আবার ক্ষীণস্বরে বলিল, "ঠাকুরঝি আমার সঙ্গে তাঁর এক বার দেখা হবে না? এক বার কি তাঁর পায়ের ধূলা মাথায় নিতে পার্‌ব না?"

ঊর্ম্মিলার চক্ষে জল আসিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তাঁকে তো টেলিগ্রাম করা হইয়াছে—তাঁর শীঘ্রই আসিবার সম্ভাবনা।"

চন্দ্রা বলিল, "তাই যেন হয় বোন্, আমি তা হ'লে নিশ্চিন্তে ম'র্‌তে পারি।" ঊর্ম্মিলাকে কাঁদিতে দেখিয়া চন্দ্রা পুনরায় বলিল, "কেঁদ না বোন্, তুমি আমার জন্যে যে রকম কষ্ট সহ্য করেছ, অতি বড় আত্মীয়ও তেমন ক'র্‌তে পারে না। আশীর্ব্বাদ করি, চিরকাল মৃত স্বামীর প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে? স্ত্রীলোকের স্বামী ছাড়া আর কে গুরু আছেন?" এই কথা বলিতে বলিতে

চন্দ্রা অবসন্ন হইয়া পড়িল।

এমন সময় প্রফুল্ল বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে উন্মত্তবেশে আগত দেখিয়া ঊর্ম্মিলা, ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি চন্দ্রার শিয়রে গিয়া বসিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিল "চন্দ্রা—চন্দ্রা।"

চন্দ্রা, চিরপরিচিত স্বর শুনিয়া চমকাইয়া উঠিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। স্বামীকে দেখিয়া মৃদু হাসিল, চক্ষু দিয়া দর দর বেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, "চন্দ্রা চন্দ্রা! কেমন আছ?"

চন্দ্রা, স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল "কেমন আছি? তোমাকে দেখিয়া সুখী হয়েছি, এখন নিশ্চিন্তে তোমার পায়ে মাথা রেখে চোক বু'জ্‌তে পার্‌ব।"

প্রফুল্ল চন্দ্রার পীড়ার সাংঘাতিকতা এই প্রথম বুঝিতে পারিল। চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি কথা বল্‌ছ চন্দ্রা—?'

চন্দ্রা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল "আমার যা ভাবনা ছিল, আজ তোমাকে দেখে' তা' দূর হ'ল—পায়ের ধুলো দাও-আমার—মত—আ—জ সুখী কে? তুমি—চি—র সু—খে থা—ক।" আর কথা বাহির হইল না।

চিরকালের নিমিত্ত দীপ নির্ব্বাপিত হইল!

চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। কিন্তু প্রফুল্লের চক্ষে কেহ বিন্দুমাত্র

অশ্রু দেখিতে পাইল না। তাহার চক্ষু দিয়া এক অস্বাভাবিক জ্যোতি বাহির হইতেছিল। প্রফুল্ল কি পাগল হইয়াছে?

(১০)

প্রফুল্ল এতটা দেখিবে, মনে করে নাই। সে ভাবিয়াছিল, রোগটী কঠিন হইলেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইলে আরোগ্য হইলেও হইতে পারে; সেই জন্য এই অকস্মাৎ গুরুতর শোক তাহার হৃদয় বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার শরীর পাষাণের ন্যায় স্থির হইয়া গিয়াছিল। সেই নিমিত্ত চারিদিকে লোকে এত ক্রন্দন করিলেও প্রফুল্ল ক্রন্দন করে নাই। সে, চন্দ্রার ক্লিষ্ট মুখ-খানির দিকে অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়াছিল। জানালা দিয়া নবোদিত সূর্য্যালোক তাহার মুখের উপর পড়াতে অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রভাতবায়ু ধীরে ধীরে চন্দ্রার চুলগুলি কম্পিত করিতেছিল। প্রফুল্ল সেই সৌন্দর্য্য একমনে দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে এক এক বার তাহার মনে হইতেছিল, চন্দ্রা বোধ হয় এখনও জীবিত!

পুনরায় চারি দিকে হরিধ্বনি হওয়াতে তাহার চৈতন্য হইল। সে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইয়া গম্ভীর ভাবে তথা হইতে উঠিয়া মাতা যথায় ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল "মা—"

মাতা শুনিতে পাইয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ওরে আমার সর্ব্বস্ব গেল, কি হবে রে, ওগো বৌমা তোমায় কত কষ্ট দেয়েছি গো"। প্রফুল্ল সে সব না শুনিয়া পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিল, "মা! মনে পড়ে পাঁচ বচ্ছরের আগের কথা; তুমি আমায় কি বলেছিলে? সেই অভিমানে আমি চ'লে গিয়ে তোমার মনে কষ্ট দিয়েছিলেম, তার জন্যে ক্ষমা কর— সেই জন্য তোমার বৌ ছেড়ে' চলে' গেল। মা! টাকা চেয়েছিলে, এই নাও। তুমি আমাকে পড়াবার জন্যে, পাশের জন্যে খরচ চেয়েছিলে; এই নাও, চাকরি ক'রে যা রোজগার করেছি। আমার জন্যে আর ভেব না, সংসারে আর আমি থাক্‌ব না।"

এই বলিয়া কিষণদাস-প্রদত্ত উইলখানি ও এক তাড়া নোট ফেলিয়া দিয়া

বাহিরে চলিয়া গেল। মাতা, পুত্রের গম্ভীরস্বর শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন—বিশেষতঃ পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার আর বাক্যোচ্চারণ হইল না। যখন তাঁহাকে মাতা বারণ করিবেন, মনে করিলেন, তখন প্রফুল্ল বাহিরে আসিয়াছে।

প্রফুল্ল, ধীর পাদবিক্ষেপে বাহিরে আসিতেছিল; এমন সময় ঊর্ম্মিলা তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল।

প্রফুল্ল, পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল, "ঊর্ম্মিলা! আমার জন্য ভেব না, সংসারে আর আমার মন নাই। আমার দোষেই চন্দ্রা জগৎ ছেড়ে গেছে। তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট হবে না। যা বিষয় দিয়ে গেছি, তা প্রচুর। এই উপদেশ, চিরকাল ধর্ম্মপথে মতি রেখো। চন্দ্রা— চন্দ্রা—"

প্রফুল্ল, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। কোথায় গেল, কেহ জানিল না।

[উপরোক্ত ঘটনার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানেও প্রফুল্লের কোনও উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। তবে গ্রামস্থ দু' একজন লোক বলিত, গভীর নিশায় তাহারা শ্মশান-ঘাটে মধ্যে মধ্যে এক জন সন্ন্যাসীকে করুণ-কণ্ঠে গান গাইতে শ্রবণ করিয়াছে। কেহ কেহ বলে, সে আর কেহ নহে, প্রফুল্ল!]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

চন্দ্রশেখর।

("চন্দ্রশেখর" ষ্টারে অভিনীত হইতেছে) "চন্দ্রশেখর" বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর শ্রেষ্ঠ চিত্র, তাঁহার কল্পনার শ্রেষ্ঠ কুসুম। তিনি যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে "চন্দ্রশেখর" অধিকতর ভাবময়। উপন্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকার। এই দুই প্রকারের ইংরাজি নাম, রিয়ালিষ্টিক (Realistic) যাথার্থ্যাত্মক এবং আইডিয়ালিষ্টিক (idealistic) ভাবাত্মক। স্বর্ণলতা প্রথমোক্ত উপন্যাস, কিন্তু "চন্দ্রশেখর" তাহা নয়। এখানি সম্পূর্ণরূপ শেষোক্ত উপন্যাস।

এই উপন্যাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান চিত্র শৈবলিনী, প্রতাপ ও

চন্দ্রশেখর। এই তিনটী চরিত্র, সচরাচর জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ অসম্ভব চরিত্রও নয়। এরূপ চিত্র, কল্পনা-প্রসূত—সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহারা একেবারে অসম্ভব বা অদ্ভূত চরিত্রও নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সকল উপন্যাসই প্রায় ভাবমূলক, সকল চরিত্রই প্রায় আইডিয়াল (Ideal) আদর্শভূত। সেই সকল গুলির সহিত চন্দ্রশেখরের প্রধান তিনটী চিত্র—বিশেষতঃ ইহার নায়িকা শৈবলিনীর চিত্রের বিশেষ পার্থক্য আছে। অন্যান্য উপন্যাসে চরিত্র-চিত্রনে কবি, ঘটনা-প্রাচুর্য্যের সাহায্য লইয়াছেন। নায়ক-নায়িকাকে নানাবিধ ঘটনা-মধ্যে আনয়ন করিয়া তাহাদের চরিত্রের নানা ভাব দেখাইয়াছেন, কিন্তু চন্দ্রশেখরের নায়িকা শৈবলিনী-সম্বন্ধে তাহা করেন নাই। শৈবলিনীর জীবনে নূতন নূতন নানা ঘটনা ঘটে নাই। তিন চারিটী ঘটনা ব্যতীত কবি, শৈবলিনীর জীবনের আর কোন ঘটনারই উল্লেখ করেন নাই। শৈবলিনী-চিত্রে বাহ্যভাব কিছুই নাই, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শৈবলিনীর সকলই মনে। শৈবলিনীর যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, সবই তাহার মনেই ঘটিয়াছিল। বঙ্কিম-চন্দ্রের এ চিত্রের ইহাই নূতনত্ব, ইহাই সৌন্দর্য্য, ইহাই চমৎকারিত্ব।

যে চরিত্র-চিত্রনে ঘটনা-প্রাচুর্য্য নাই, তাহা অভিনয় করা বড় সহজ নহে। মানব-মনে যাহা হয়, তাহা বিনা ঘটনা-সাহায্যে প্রকাশ করা কোন মতেই সহজ হইতে পারে না। এই জন্য "ম্যাকবেথ" সম্পূর্ণ সাফল্যে কেহ কখনও অভিনয় করিতে পারেন নাই। এই জন্যই "চন্দ্র-শেখর" অভিনয় হওয়া সম্ভব নহে। গ্রন্থকার স্বয়ং অনেক সময়ে অনেক স্থলে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি সর্ব্বপ্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সকল একে একে অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা চন্দ্রশেখরকেও নাটকাকারে পরিণত করিয়াছিলেন, কিন্তু এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ সুন্দর রূপে অভিনয় হইবার নহে, গ্রন্থকার স্বয়ং এইরূপ মত প্রকাশ করায় ইহার অভিনয় স্থগিত হয়। তদবধি ইহাকে আর কেহ রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবার সাহস করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্যাসই অভিনীত হইয়াছে।

সম্প্রতি "ষ্টার"রঙ্গমঞ্চের শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু ইহাকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করিতেছেন। কোন উৎকৃষ্ট উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করিবার ভার-গ্রহণের ন্যায় গুরুতর দায়িত্ব, আর কিছুই নাই। ইহাতে কবির কাব্য-সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক। যখন সুবিখ্যাত নাটককার গিল্‌বার্ট ও সুলিভান সাহেব জগদ্বিখ্যাত "ইষ্টলিন" উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি, প্রতিপদেই গ্রন্থকর্ত্রী বিবি হেনরি উডের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইষ্টলিন্ অপেক্ষাও "চন্দ্রশেখর" অভিনয় কঠিন। শৈবলিনীর চরিত্র লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রের ন্যায় অন্তর্নিবিষ্ট; ইহার বাহ্য বিকাশ অতি অল্প। সুতরাং এরূপ পুস্তক অভিনয় করিতে প্রস্তুত হওয়ায় অমৃতলাল বাবু যে বিশেষ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই।

আরও সুখের বিষয়, যতটুকু সাফল্য লাভ আশা করা যায়, এ অভিনয়ে তিনি তাহাও লাভ করিয়াছেন। যাহা অভিনয় করা অতি কঠিন, তাহাই অভিনয় করিয়া তিনি সহস্র সহস্র লোককে মুগ্ধ করিতেছেন গ্রন্থকর্ত্তা জীবিত থাকিলে অমৃত বাবুর প্রতি সাধারণতঃ সন্তুষ্ট ব্যতীত রুষ্ট হইতেন না।

অভিনয়-সৌকর্য্যের জন্য যে "চন্দ্রশেখর" লোক-প্রিয় হইয়াছে, তাহা নয়। নাটকাকারে "চন্দ্র-শেখর" যে উপন্যাসাকার হইতে অধিক হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে, তাহাও নয়। অমৃত বাবু রঙ্গমঞ্চে কয়েকটী অতি সুন্দর দৃশ্যপটের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া। ইহার একটী দৃশ্যপট,—জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত, নদী-বক্ষে নায়ক-নায়িকার সন্তরণ—নূতন ও সুন্দর। এই এক দৃশ্যের জন্যই—"চন্দ্র-শেখর", লোকের এত প্রিয় হইয়াছে;—নতুবা চন্দ্র-শেখরের অভিনয়, অন্যান্য অনেক নাটকাভিনয় অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

গ্রন্থকার, জীবিত থাকিয়া এ অভিনয় দেখিলে, যে মতামত প্রকাশ করিতেন,—তিনি যে যে স্থলের প্রশংসা করিতেন এবং যে যে ত্রুটির উল্লেখ

করিয়াছেন, তেমন না হউক, আমরা সেই ধরণে সেই ভাবে সেই রূপে এই নূতন নাটকের সমালোচনা করিব।

"চন্দ্র-শেখর" উপন্যাসকে, নাটকে পরিণত করায় নাটককারের একটী প্রধান ত্রুটি লক্ষিত হয়। যাঁহার উপন্যাস খানি পড়া নাই, তিনি চন্দ্র-শেখরের অভিনয়ের অনেক স্থলই বুঝিতে পারিবেন না। "চন্দ্র-শেখর" নাটকাকারে অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ। যদি উপন্যাস পড়া না থাকিলে, অভিনয় বুঝিতে ক্লেশ হয়, যদি ইঁহার অভিনয় দর্শনের পরেও উপন্যাস খানি পাঠ করা আবশ্যক হয়, তবে ইহা যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে নাটকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অমৃত বাবু নিজে ভাল লেখক ও এক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ নাটককার। তিনি নিশ্চয় বুঝিবেন যে, নাটকে এরূপ ত্রুটি থাকিলে, সে নাটককে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলা যায় না।

বিনা উদ্দেশ্যে কোন গ্রন্থ কখনও রচিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র "চন্দ্র-শেখর" উপন্যাসে কয়েকটী চরিত্র-চিত্রনোদ্দেশ্যেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সেই চিত্র কয়েকটী কি ও কিরূপ, তাহার উপলব্ধ করিতে না পারিলে পুস্তক-পাঠ সম্পূর্ণই বৃথা হয়—পুস্তক-পাঠের অর্দ্ধেক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কোন পুস্তক পাঠে যে আনন্দ হয়, অভিনয়ে যে তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক আনন্দ হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং "চন্দ্র-শেখর"-পাঠ অপেক্ষা "চন্দ্র-শেখর"-অভিনয়-দর্শন যে অধিক মনোরম হইবে, এ আশা করা সর্ব্বতোভাবেই ন্যায়-সঙ্গত; পুস্তক-পাঠে যে জীবন্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, অভিনয়ে তাহা সুস্পষ্ট দেখা যায়। চন্দ্র-শেখরের অভিনয়ে শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে রক্ত-মাংসে দেখিবার আশা করা অন্যায় নহে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, পুস্তক-পাঠে যে শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্র-শেখর দেখিতে পাই, অমৃত বাবুর অভিনয়ে তাহা পাই না।

দুইটা কারণে এ দোষ ঘটিয়াছে। প্রথম—শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্র-শেখরকে গ্রন্থকার যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, নাটককার স্বয়ং তাহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়—অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর রূপে নিজ নিজ অংশ অভিনয় করিতে সক্ষম হয়েন নাই।) আমরা ক্রমে ক্রমে এই সকল ত্রুটির উল্লেখ করিব।

একই প্রেমের কয়েকটী বিভিন্ন ভাব চিত্রন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এক দিকে প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর ভালবাসা, অন্য দিকে দলনীর মিরকাসেমকে ভালবাসা। এক দিকে প্রতাপের শৈবলিনীকে ভালবাসা, অপর দিকে মিরকাসেমের দলনীকে ভালবাসা।

এই ভালবাসার উচ্চ ও নিম্ন দুইটী স্তরও গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন। এই ভালবাসার নিম্ন দুই স্তর। তাহার প্রথম স্তরে ফষ্টরের শৈবলিনীর প্রতি ও দ্বিতীয় স্তরে মহম্মদ তকির দলনীর প্রতি ভালবাসা। উচ্চ দুই স্তরের প্রথম চন্দ্র-শেখরের ভালবাসা ও তদুপরি স্তরে রামানন্দ স্বামীর ভালবাসা।

রামানন্দ স্বামী সন্ন্যাসী,—তিনি দেবতা। তাঁহার প্রেম জগদ্ব্যাপ্ত। তিনি শৈবলিনীকে যে চক্ষে দেখেন, দলনীকেও ঠিক্ সেই চক্ষে দেখেন, তাঁহার নিকট সকলই সমান।

চন্দ্র-শেখরের প্রেমে কামনা একেবারেই নাই। চন্দ্রশেখরের ভালবাসা—স্থির, গম্ভীর, গাঢ় ও গভীর। সে প্রেম-সমুদ্রে লহরী একেবারেই নাই। রামানন্দ যে ভাবে জগৎকে ভালবাসেন, চন্দ্র-শেখর সেই ভাবে শৈবলিনীকে ভালবাসেন। এখনও তাঁহার প্রেম, জগদ্ব্যাপ্ত হইতে পারে নাই।

প্রতাপের ভালবাসা, শৈবলনীর সুখের জন্য। শৈবলিনীকে সুখিনী করিবার জন্য প্রতাপ, নিজ-হৃদয়কে বলিয়া দিয়াছেন। শৈবলিনী, যাহাতে সুখিনী হয়—প্রতাপ, আজীবন তাহাই করিতে ব্যস্ত।

শৈবলিনীর ভালবাসা সেরূপ নয়। শৈবলিনী, নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত। প্রতাপকে পাইলে এ জীবনে সে সুখিনী হয়; তাই সে, প্রতাপলাভের জন্য উন্মত্তা, হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্যা।

দলনীর ভালবাসা কোমল, নবনী অপেক্ষাও কোমল। স্বামীকে ভালবাসা কর্ত্তব্য বলিয়া দলনী, নিজ প্রাণ-মন, মিরকাসেমের চরণে উৎসর্গীকৃত করিয়াছে।

দলনী সুন্দরী, যুবতী, গুণবতী। তাই মিরকাসেম, অন্যান্য বেগম অপেক্ষা দলনীকে অধিক ভালবাসেন—স্নেহ করেন, বলিলেও ক্ষতি নাই।

ফষ্টরের ভালবাসা পাশব। শৈবলিনীর রূপ, ফষ্টরের হৃদয়ের প্রধান আবেগ। লালসা-পরিতৃপ্তি করাই তাহার শৈবালনীর প্রতি আকর্ষণের প্রধান কারণ।

তকির দলনীর প্রতি আকর্ষণ, ফষ্টরের পাশব প্রবৃত্তি হইতেও নীচ ও ঘৃণিত। ইহা অপেক্ষা মানব-প্রবৃত্তি আর অধিক নীচতর হইতে পারে কি না, তাহা বলা যায় না।

এইরূপে গ্রন্থকার, "চন্দ্র-শেখর" উপন্যাসে প্রেমের অতি নিম্নতম স্তর হইতে ইহার উচ্চতম স্তর, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে দেখাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক, নাটককার অমৃত বাবু এই সকল চরিত্রের সৌন্দর্য্য অকুণ্ঠ ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন কি না।

প্রথম দৃশ্যে দেবগ্রামস্থ ভীমা পুষ্করিণী। সন্ধ্যা আগত-প্রায়। শৈবলিনী, তাহার সখী ও প্রতিবেশিনী সুন্দরী অবগাহনে নিযুক্তা। দৃশ্যপট সুন্দর, অভিনয়ও সুন্দর। আমরা বুঝিলাম, শৈবলিনী বিবাহিতা বটে, কিন্তু স্বামি-সোহাগে অতৃপ্তা। সে, আপন স্বামী লইয়া সুখিনী নহে।

দুই সখীর কথোপকথনে প্রায় সন্ধ্যা হইল। তখন সুন্দরী, গৃহ-প্রত্যাগমনে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু শৈবলিনী নড়িতে চাহে না। তৎপরে ফষ্টরের প্রবেশ। গোরা দেখিয়া সুন্দরীর পলায়ন, কিন্তু শৈবলিনী নড়িল না। তার পর ফষ্টরে ও শৈবলিনীতে কথোপকথন। শৈবলিনী যে সাধারণ নারী নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই গ্রন্থকার এই দৃশ্য চিত্রিত করিয়াছেন। অভিনেত্রী, যে ভাবে এই অংশ অভিনয় করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই *। কিন্তু নাটককারের যে সকল কথা, এই স্থলে কোনরূপে ব্যক্ত করা

* শৈবলিনীর এক্ষণকার অভিনয়কারিণীকে এ প্রশংসা প্রদান করা যায় না। পূর্ব্বাভিনয়কারিণীই ঐ প্রশংসা পাইবার যোগ্য।—লেখক।

কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তিনি করেন নাই। উপন্যাস যাঁহার পাঠ করা নাই, তিনি এ দৃশ্য দেখিয়া প্রকৃত শৈবলিনীকে দেখিতে পাইবেন না। দেখিবেন, একটা সুন্দরী কুলটা যুবতী, একটা লম্পট গোরার সহিত গৃহত্যাগ করিতে অগ্রগামিনী!

দ্বিতীয় চিত্রে চন্দ্র-শেখর ও শৈবলিনী। চন্দ্র-শেখর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, শৈবলিনী অপেক্ষা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ, কিন্তু নাটককার চন্দ্র-শেখরকে সম্পূর্ণ অন্য ভাবে আমাদিগকে দেখাইয়াছেন। চন্দ্র-শেখরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কোন লক্ষণ নাই। চন্দ্রশেখর যেন একটী নব্য বাবু! যিনি পুঁথি লইয়া চির-উন্মত্ত, তিনি কেশ ও গুম্ফ কখনও রাখেন না; বিশেষতঃ যে সময়ের কথা হইতেছে, সে সময়ে এরূপ-বেশী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতেন, সন্দেহ নাই। কেন শৈবলিনীর মন, চন্দ্রশেখরে আকৃষ্ট নহে, তাহা এ দৃশ্যে কিছুই উপলব্ধি করিবার উপায় নাই।

তৃতীয় দৃশ্যে দলনীর কক্ষ। মিরকাসিমের সহিত দলনীর কথোপকথন। এ দৃশ্য যেরূপ অভিনীত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহাই হইয়াছে। কারণ, এ দৃশ্যে কঠিন কিছুই নাই।

চতুর্থ দৃশ্যে আমরা সুন্দরী ও তাহার স্বামীকে প্রথম দেখিতে পাই। দুই জনে রসিকতার ফুয়ারা ছুটিয়াছে। এ রসিকতার সমাবেশের আবশ্যকতা কি, আমরা বুঝিলাম না। মূল উপন্যাসে ইহার কিছুই নাই। †

তৎপর দৃশ্যে নাটককার কতকগুলি দেবগ্রামবাসীকে আনিয়াছেন। শৈবলিনী যে, ফষ্টরের সহিত পালাইয়াছে, ইহাই দর্শকবৃন্দকে অবগত করান, ঐরূপ করার উদ্দেশ্য। এটী একটী "সঙের" দৃশ্য, খুব হাসির কথা আছে। এরূপ ভাবে শৈবলিনীর গৃহত্যাগ, দর্শকবৃন্দকে অবগত করায় পুস্তকের সৌন্দর্য্যের লাঘব ভিন্ন বৃদ্ধি হয় নাই। এ দৃশ্যও অনাবশ্যক নয়? †

পরের দৃশ্য ফষ্টরের বজরার কক্ষ। তথায় শৈবলিনী ও নাপিতানী-বেশে সুন্দরী। সুন্দরী এই উপায়ে শৈবলিনীকে গোরার হস্ত হইতে উদ্ধার

† ঘটনাকে সরস করিবার জন্য উহার অবতারণা করা হইয়াছে।—সম্পাদক

করিতে আসিয়াছে, কিন্তু শৈবলিনী নৌকা হইতে পলাইল না। সুন্দরী, ক্রোধে ঘৃণায় দুঃখে চলিয়া গেল। এ দৃশ্যটী সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছে। সুন্দরীর অভিনয় উত্তম।

তৎপর দৃশ্যে চন্দ্রশেখর ও তাঁহার ভৃত্য সনাতন। মূল পুস্তক পাঠ করা না থাকিলে এ সকল দৃশ্য বুঝিয়া উঠা অসম্ভব। চন্দ্রশেখর, গৃহে ছিলেন না—আসিয়া দেখিলেন,গৃহে ডাকাতি হইয়াছে, শৈবলিনী নাই। মূল পুস্তকের এই অংশ পাঠ করিলে হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, অভিনয়-দর্শনে তাহার কিছুই হয় না। যিনি চন্দ্রশেখর অভিনয় করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর-চরিত্র যে কি, তাহা তিনি এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, কাজেই তাঁহার অভিনয়, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অপ্রশংসনীয়।

তৎপরবর্ত্তী চিত্র, গুরগন খাঁর কক্ষ। তথায় গুরগুন খাঁয় ও দলনীতে কথোপকথন। উপন্যাস পাঠ করা না থাকিলে, কাহার সাধ্য—সকল কথা বুঝিয়া উঠে ?

তৎপরে প্রতাপের কক্ষ। প্রতাপের স্ত্রী রূপসী, সুন্দরীর ভাগিনী। সুন্দরী, শৈবলিনীকে বড় ভালবাসে। সে এখনও শৈবলিনীকে উদ্ধার করিবার আশা ছাড়ে নাই, তাই প্রতাপের নিকট আসিয়াছে।

তৎপর দৃশ্যে মুঙ্গেরের রাজপথে দলনী ও তাহার দাসী। গুরগন খাঁর আজ্ঞায় তাহাদের আর প্রাসাদে প্রবেশের উপায় নাই। এই সময় চন্দ্রশেখর আসিয়া নিরাশ্রয়া রমণীদ্বয়কে আশ্রয় দিবার আশা দিয়া প্রতাপের আলয়ে লইয়া গেলেন।

তার পর আর কোন কথা নাই। একেবারেই ইংরেজের ফ্যাক্টারি। কয়েকটী ইংরেজে কথোপকথনে নিযুক্ত। প্রতাপ, শৈবলিনীকে লইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তি তাহার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে। তাহাকে বন্দী করিতে হইবে, সুতরাং কয়েক জন সিপাহী লইয়া দুই জন ইংরেজের প্রস্থান। এই খানে বলা কর্ত্তব্য, ফষ্টার ব্যতীত, আর কয়েক জন ইংরেজের অভিনয় তেমন প্রশংসার জিনিস নহে, তবে একেবারেই দর্শনাযোগ্য নয়।

নাটককার-উপন্যাসের এই অংশ, নাটকাকারে পরিণত করিতে নিতান্তই

অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিরূপে কোথায় প্রতাপ, শৈবলিনীকে উদ্ধার করিল, ইহা না বলিলে কেবল যে নাটক অসম্পূর্ণ হয়, এরূপ নহে। প্রতাপের চরিত্রও অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। প্রতাপ যে কি, তাহা প্রথমে আমরা শৈবলিনীর উদ্ধার-ব্যাপারে দেখিতে পাই; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অমৃত বাবু এই অংশ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে।

পরের দৃশ্যে প্রতাপের গৃহে শৈবলিনী ও প্রতাপ-ভৃত্য রামচরণ। কোথা হইতে কিরূপে শৈবলিনী কোথায় আসিলেন, কিছুই নাই—সব উপন্যাসে দেখিয়া লইতে হইবে; নতুবা কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। সকলই অন্ধকার। নাটককারের এরূপ ত্রুটি মার্জ্জনা করা অতি কঠিন। তবে এই নাটক-প্রণয়নে অনেক স্থলে অমৃত বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, বলিয়াই তাঁহার ত্রুটি কতক মার্জনীয়।

পুস্তকের মধ্যে এই দৃশ্যটী অতি সুন্দর, অতি হৃদয়ভেদী, অতি হৃদয়-মনঃ-প্রাণ-স্পর্শী। বহুকাল পরে প্রতাপ ও শৈবলিনী, উভয়ে উভয়ের সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রতাপ, শৈবলিনীকে ভৎ'সনা করিতেছেন। শৈবলিনী, প্রতাপকে ভৎ'সনা করিতেছে।

নাটককার প্রতাপ-চরিত্র ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিলে তিনি গ্রন্থকারের কথা, প্রতাপের মুখে প্রকাশ করিতেন না। গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে যে প্রতাপ, বিস্ফারিত নয়নে নিদ্রিতা শৈবলিনীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাহা নহে। বহুকাল পরে তাহাকে দেখিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে এক অভূতপূর্ব্ব আলোড়ন উপস্থিত হইল, তিনি কেবল বিমনা হইয়া চাহিয়াছিলেন, অন্য ভাব তাঁহাতে তখন ছিল না, থাকিতে পারে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, নাটককার, তাঁহার মুখ হইতে শৈবলিনীর দীর্ঘ রূপ-বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। নাটককারের দোষে এই সুন্দর দৃশ্যের সৌন্দর্য্য অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়াছে; তবে অভিনেত্রীর অভিনয় প্রশংসনীয়। প্রতাপের অংশ, যিনি অভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি কোন্ স্থলেই ভাল অভিনয় করিতে পারেন নাই। কোন চরিত্র, বিশেষ-

রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহা কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে অভিনয় করিতে পারা যায় না। অভিনেতা, প্রতাপ চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার অভিনয়ও ভাল হয় নাই।

পর দৃশ্য প্রতাপের গৃহ। দুই জন সাহেব ও সিপাহীগণের দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ। রামচরণ উপরে বন্দুক আনিতে ছুটিতেছিল, কিন্তু পরে গুলি লাগায় বসিয়া পড়িল। প্রতাপ, বল-প্রকাশ বৃথা দেখিয়া নীরবে বন্দী হইলেন। এই দৃশ্যে দুইটী হাস্যজনক ব্যাপার আছে। প্রথম—গৃহ আলোকিত, তবুও তাহার ভিতরে আসিয়া সাহেবেরা দেসলাই জ্বালিয়া বাতি জালিলেন। যদি বাতিই জালা হইল, তবে ঘরটা অন্ধকার করিতে ক্ষতি কি ছিল? দ্বিতীয়, সাহেব রামচরণকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন, কিন্তু সে পিস্তল, ছেলেদের খেলিবার পিস্তল। এরূপ পিস্তল ছুড়িয়া এ দৃশ্যের অভিনয়ের প্রয়োজনীয়তা কি?*

পর দৃশ্য নবাবের কক্ষ। নবাবের সম্মুখে শৈবলিনীর প্রবেশ ও প্রতাপের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দান। এ দৃশ্য-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। সুখ্যাতির বা নিন্দার কিছু নাই।

তৎপরের দৃশ্যে চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ স্বামী। উভয়েই দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে নিযুক্ত। মূল উপন্যাসে এ দৃশ্য নাই। নাটককার ইহার অবতারণা করিয়া পুস্তকের সৌন্দর্য্য-হানি করিয়াছেন। চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ স্বামীকে যাত্রার নারদ বলিয়া ভ্রম হয়। এ দৃশ্যের সমাবেশ করিয়া চন্দ্রশেখর-চরিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করা হইয়াছে মাত্র।

এই সকল ঘটনার পর উপন্যাসে একটী সুন্দর দৃশ্য আছে। নাটককার সেটীও বাদ দিয়াছেন। প্রতাপ, শৈবলিনীকে যেরূপে উদ্ধার করেন, অমৃত বাবু তাহা দেখান নাই। শৈবলিনী যে, কিরূপে প্রতাপকে উদ্ধার করিল, তাহাও তিনি দেখান নাই। "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে এ দুইটী প্রধান দৃশ্য, অথচ নাটককার এই দুইটীই বাদ দিয়াছেন। কেন,-আমরা জানি না। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই অমৃত বাবুকে এ ত্রুটির

* নাট্যশালায় কি উহা অপেক্ষা বড় পিস্তল বা বন্দুক চলে?—সম্পাদক।

জন্য বলিতেন। এই দুইটী দৃশ্য বাদ দেওয়ায়, শৈবলিনীর ও প্রতাপের চরিত্রের অর্দ্ধেক বাদ দেওয়া হইয়াছে।

বাদ দিয়া নাটককার, শৈবলিনীকে কেবল সাহেবদিগের সম্মুখে আনিয়াছেন। (শৈবলিনী পাগলিনী-বেশে আসিয়াছিল, কিন্তু অভিনেত্রী শৈবলিনীর এ ভাব একেবারে দেখাইতে পারেন নাই। তার পর নেপথ্যে একটা গোলমাল। বুঝিলাম, শৈবলিনী ও প্রতাপ উভয়েই নদীতে ঝাঁপ দিয়া পালাইয়াছে।

তার পরের দৃশ্য নদী-বক্ষ। প্রতাপ ও শৈবলিনী, সন্তরণে নিযুক্ত। প্রতাপ, শৈবলিনীকে প্রাণ-ত্যাগের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে ভুলিতে শপথ করাইতেছেন। এ দৃশ্য অতি সুন্দর। উপন্যাসে এ দৃশ্য পাঠ করিলেই হৃদয় মন বিমুগ্ধ হয়, অমৃত বাবু এ দৃশ্যের দশ্যপট ও অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদের পাত্র।)

তৎপরবর্ত্তী তিনটী দৃশ্য, উপন্যাস পাঠ না থাকিলে বোঝা দুষ্কর। প্রথম দৃশ্যে রামানন্দ, চন্দ্রশেখর, দলনী। তৎপরের দৃশ্যে প্রতাপ ও তাঁহার ভৃত্য, শেষ দৃশ্যে নবাবের দরবার। এ সকল দৃশ্য-সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। এ সকল দৃশ্য আরও সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত।

তৎপরের দৃশ্যে (গিরিগুহার মধ্যে শৈবলিনী। কোথা হইতে কিরূপে শৈবলিনী এখানে আসিলেন, তাহার কিছুই নাই। চন্দ্রশেখর-উপন্যাসে গ্রন্থকার, এটী একটী সম্পূর্ণ নূতন চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। এ দৃশ্য বোঝাই কঠিন, অভিনয় তো দূরের কথা। এটী শৈবলিনীর নিজ-মানসপটে নরক-দর্শন! এ ব্যাপার অভিনয় করিয়া প্রদর্শন সহজ নহে। যাহা হউক, যিনি শৈবলিনীর অংশ অভিনয় করিয়াছেন, তাঁহাকে এ অংশের অভিনয়ের জন্য প্রশংসা করি।)

তৎপরের দৃশ্যে তকি খাঁ ও দলনী। স্বামীর আজ্ঞায় দলনী, বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে নবাবের শিবির। দলনীর বাঁদীর মুখে নবাব শুনিলেন, দলনী কুলটা নহে। তখন তিনি তকি খাঁর প্রাণ-বধে, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তৎপর দৃশ্যে চন্দ্রশেখরের গৃহ। চন্দ্রশেখর, রামানন্দ, শৈবলিনী প্রভৃতি। চন্দ্রশেখর, যোগবলে শৈবলিনীর মুখ হইতে জানিলেন, সে অসতী নহে। পর দৃশ্যে নবাব-শিবিরে নাটকোল্লিখিত প্রায় সকল ব্যক্তিই উপস্থিত। রামানন্দ স্বামীর যোগপ্রভাবে ফষ্টর স্বীকার করিল, শৈবলিনী সতী।

এই সকল দৃশ্য, সঙ্ক্ষেপে সারিলেই ভাল হইত। (শিবিরের দৃশ্যে স্বামীর সহসা নবাবের সম্মুখে প্রবেশ ও ফষ্টারের যোগবলে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহা অবিশ্বাসজনক ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে)

তৎপরে (পার্ব্বত্য পথে চন্দ্রশেখর ও রামানন্দ, শৈবলিনীকে লইয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে দূরে পালাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতাপের প্রবেশ। এ দৃশ্যের অভিনয় ভাল হয় নাই। নেপথ্যে তোপ ও রণবাদ্য হইতেছে, দেখাইবার জন্য অমৃত বাবু পটকা ফুটাইয়াছেন ও কনসার্টিনা বাজাইয়াছেন।

শেষ দৃশ্য যুদ্ধ-ক্ষেত্র। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত প্রতাপ ও রামানন্দ স্বামী। উপন্যাসে এ দৃশ্যটী বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, প্রতাপের কথাগুলি বড়ই হৃদয়ভেদী, কিন্তু অনেক পূর্ব্ব হইতেই দর্শকগণের নিকট এ অভিনয় নীরস হইয়াছিল, তাই তাঁহারা একবার মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রের দৃশ্যপট খানি দেখিয়াই রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন; প্রতাপের কথা আর কেহ শুনিবার বড় অপেক্ষা করেন না। ইহাতেই নাটককারের বোঝা উচিত, তিনি "চন্দ্রশেখর" নাটকাকারে পরিণত করিতে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই। যে গ্রন্থের পাঠক, পুস্তকের শেষ না পড়িয়া পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করেন, যে নাটকের অভিনয়ের শেষ দৃশ্য দেখিতে দর্শকগণ ব্যগ্র না হয়েন, সে পুস্তক ও সে নাটক, উৎকৃষ্ট নহে, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।)

শ্রী—প।

মিনার্ভায় "স্বপ্নের-ফুল"।

("স্বপ্নের-ফুল" এক খানি গীতিনাট্য।) বর্ত্তমান "মিনার্ভা" থিয়েটারের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ এ গীতিনাট্যের রচয়িতা।

গীতিনাট্যের পাত্র,—ছুইজন পুরুষ ধীর ও অধীর এবং পাত্রী স্ত্রীলোক কয়েকটী মনহারা, মনথরা, বনফুল, যুঁথি, বেলা ও সখীগণ। সংযোগ স্থল —বন।

(ধীর ও অধীর উভয়েই নব্য অভিনেতৃগণের উন্নত স্থান অধিকারের যোগ্য। অধীরের অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র। তাঁহার অভিনয়-দর্শনে আমাদের মনে হইয়াছিল, নাট্যাভিনয়ে তিনি পিতার নাম রক্ষা করিতে পারিবেন। ধীর এবং অধীরের অংশের অভিনয়, অতি স্বাভাবিক ও তৃপ্তিপ্রদ। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে এই ছুই যুবক, "মিনার্ভার" নবীন অভিনেতৃ-শিরোরত্ন বলিয়া আদৃত হইবেন।

পুস্তক-প্রণয়নের উদ্দেশ্য, গিরিশ বাবু নিজেই বলিতেছেন ;—

"Shastras say, Maya has two phases,—one is ignorance, offspring of Trisha or lust, the other knowledge from self-abnegation. Ignorance is removed by knowledge as a pierced thorn is removed by another. Freedom from knowledge and Ignorance by relinquishing both to perfect Bliss or Nirbaṅ. The attempt is to delineate this purport of the Shastras by the musical representation of tale. Success of my attempt the audience will decide."

বাঙ্গালায় বলিতে গেলে উহার মর্ম্ম এই দাঁড়ায়—

"শাস্ত্রে বলে, মায়া ছুই প্রকার; বিদ্যা-মায়া ও অবিদ্যা-মায়া।

অবিদ্যামায়া—মোহ; বিদ্যামায়া—প্রেম। যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করে, সেইরূপ প্রেমের কণ্টক দ্বারা মোহের কণ্টক উদ্ধার করিতে পারিলে, পরে দুইটী কণ্টক ত্যাগ করিয়া জীব পরম শান্তি লাভ করে।

"এই শাস্ত্রের মর্ম্ম—গল্পচ্ছলে গীতিনাট্যে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয় দর্শকবৃন্দগণ বুঝিবেন।"

কবির কল্পনায় "স্বপ্নের ফুল" কি প্রকার প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার উপরোক্ত বক্তব্য পাঠ করিলেই অনেকটা উপলব্ধি হইবে।

পুস্তকের প্রথমেই কবি যে প্রস্তাবনাটী লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই তাঁহার মনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। পদ্যের ছত্রে ছত্রে যে ভাব প্রকাশিত, তাহার বর্ণনার চেষ্টা করা বৃথা। প্রস্তাবনাটী পাঠ করিলেই পাঠকের তাহা হৃৎপ্রত্যয় হইবে।

"প্রস্তাবনা।

সাধে কি নির্ব্বাণ মন! করি রে প্রয়াস,
ভেবে দেখ যতদিন স্মৃতির বিকাশ
জীবনে মরণ ত্রাস,
চির-আশ উপহাস,
সতত আশ্বাস ভাষ সুখের প্রয়াস,
পিয়াসা না মিটে নিত্য নব অভিলাষ।
অধীর উন্মাদ তুমি ভ্রম নিরন্তর,
দুঃখাকর সুখ-সাধে সদা জর-জর;
রোদন জনম যবে,
রোদন সাগর ভবে,
হেলায় খেলায় বাঁধ দুরন্ত লহর,
পলে পলে অগ্রসর কাল প্রাণহর।

"কৌমার যৌবন জরা গাঁথা এ জীবন,
ধূলা-খেলা প্রেম-তৃষা অর্জ্জন কাঞ্চন;
অসার প্রয়াস তার,
সার-মাত্র দুখভার,
কেন আর তোর সনে করি আকিঞ্চন,
হও রে নির্ব্বাণ, যাব শান্তি-নিকেতন।"

গিরিশচন্দ্র বাবুর লেখনী-প্রসূত অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি এবং অভিনয়ও দেখিয়াছি। কিন্তু "স্বপ্নের ফুলের" ন্যায় কবিত্বপূর্ণ ও ভাব-মাধুর্য্যময় উচ্চাদর্শের গীতিনাট্য তিনি এ পর্য্যন্ত আর এক খানিও লেখেন নাই।

এই (স্বপ্নের ফুল" অভিনয়ে ''মিনার্ভার' নবযুগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহা এক খানি আধ্যাত্মিক, রূপক-সংবলিত গীতিনাট্য। বিগত ১৭ই নবেম্বর ইহার প্রথমাভিনয় হইয়া গিয়াছে।)

ভারত-জননী চিরকালই সুকবি-প্রসূতা। কালিদাস, ভারবি, ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণ, প্রভৃতি মহান্ কবিগণ, ভারত-মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইহাঁদের কীর্ত্তি এখনও স্বনামক্ষরে প্রতিভাত রহিয়াছে। কেবল ভারতের শ্যামল কাননে, পূজ্যপাদ প্রাচীন আর্য্যগণের বিচরণ-ভূমিতে ঐশ প্রেম বিজ্ঞান-তত্ত্ব একসূত্রে গ্রথিত হইয়া পর্য্যটন করিতে দেখা যায়। ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাব কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

ভারতীয়েরা যতই আধ্যাত্মিক, দার্শনিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের বিজ্ঞান-জ্ঞান বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-প্রচার, ধর্ম্ম-সংস্থাপনের অন্তরায় না হইয়া বরং উহার বহুল বিস্তারের সহায়ভূত হইয়াছে। পবিত্র-সলিলা, যমুনা-কূলে, ব্রজধামে, প্রেম মাহাত্ম্যের অত্যুৎকৃষ্ট অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সে চিত্র, হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবনে গভীর রূপে ক্ষোদিত। জাহ্নবী-জল-পূত রত্ন-গর্ভা আর্য্যবর্ত্তে কোন্ বস্তুর অভাব ছিল,

না। ঐহিক, পারত্রিক উৎকর্ষ, এখানে চিরকাল সর্ব্বভাবেই বর্ত্তমান। এই ভারতেই এক দিন মহাকবি শ্রীকৃষ্ণমিশ্র স্বকীয় শমরস-প্রধান প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক লিখিয়া আপনার যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্ত পরিপূরিত করেন; কিন্তু অধীনতা-শৃঙ্খল-ভারে ভারত এখন অবনত, মর্ম্মপীড়িত তাহার কবিত্ব শক্তি জর্জ্জরীভূত।

এই দুর্দ্দৈবেও, এক অত্যুজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আজ বাঙ্গালী-হৃদয়কে মাতাইয়াছে। প্রেম-প্রস্রবণ, ভারতবাসীর প্রেম-প্রস্রবণ যে এখনও খরতর কালস্রোতে শুষ্ক হয় নাই, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। মিনর্ভাধ্যক্ষ সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধুনা, সেই ঋষিগণ-বাঞ্ছিত বৈজয়ন্তবিরাজিত করুণাময়েরকরুণা-স্রোত-প্লাবন দৃশ্য, স্বরচিত "স্বপ্নের ফুল" নামক পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্র চঞ্চলা-চপলার ন্যায় মুহূর্ত্ত মাত্র আমাদের নয়ন ঝলসিত করিয়াই অন্তর্হিত হয়। জড়বুদ্ধি, সূক্ষ্মানুভববিহীন-শক্তি জনগণ সহসা এই স্বর্গীয় চিত্র দর্শনে একবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে, কিছুই অন্তরস্থ করিতে পারে না। চারি দিকেই তমোময় বোধ করে। নির্ব্বাণ রহস্য ঘোষণা করাই তাঁহার গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই মোক্ষ-রহস্য কপিল-দেব সাংখ্য দর্শনে বুঝাইয়াছেন—এই নির্ব্বাণ জন্যই শাক্যসিংহ সংসার ত্যাগ করেন। সুতরাং তদীয় জীবন ইহার অন্বেষণে উৎসর্গীকৃত হয়। বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি সফলমনোরথ হন। এই মোক্ষলাভ রহস্য শঙ্করা-চার্য্য হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রচারিত করেন—তাঁহার সেই গম্ভীর প্রতিধ্বনি এখনও যেন কর্ণকুহরে শব্দায়মান। এই মোক্ষ মাত্রই শ্রীপাট-নবদ্বীপাধিপতি শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ জীবনের মূল সূত্র—তাঁহার কীর্ত্তনের প্রধান ধূয়া। এই অবোধ্য মোক্ষমন্ত্র দীপিত করাই গিরিশ বাবুর প্রয়াস। তিনি কাব্যাচরণে এই কূট দার্শনিক তত্ত্ব আচ্ছাদিত করিয়াছেন; সঙ্গীত নৃত্যাদি নানা বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া, এই নিগূঢ় প্রশ্ন সাধারণে উপস্থিত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রমোদান্তঃপুরে বাবু গিরিশচন্দ্রই প্রধান কঞ্চুকী। তিনি সুবিধা পেলেই আমাদিগকে আমোদচ্ছলে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। তাঁহার

"বিল্ব-মঙ্গল" সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে। এবার কিন্তু তিনি সমাজের সমভূমি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ধর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষার্থে বদ্ধ-পরিকর। এই ভীষণ ম্লেচ্ছ সংঘর্ষে আমাদের শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম একরূপ মুমূর্ষু দশা-গ্রস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিরকালই নানা মুনির নানা মত। হিন্দু ধর্ম্ম এখন এক সঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে। গিরিশচন্দ্র বাবু এই সকল ধর্ম্মের সারগ্রহ করিয়া তাঁহাদের একতা-সাধনে তৎপর। নির্ব্বাণ—জগদাত্মার জীবাত্মার বিলয় যে সকল ধর্ম্মেরই মুখ্য বচন, তাহা তিনি অবগত করিয়াছেন। যদি হিন্দুশাস্ত্র ভাণ্ডারে সেই নির্ব্বাণ-রত্ন-লাভের রাশীকৃত উপায় নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে কেন হিন্দু-সন্তান ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষার ভান করিয়া অন্যান্য ধর্ম্ম উৎকৃষ্টতর বলিয়া তাহা আশ্রয় করিবেন? তিনি দেখাইয়াছেন, হিন্দুই নির্ব্বাণের যথার্থ তথ্য অবগত। আর্য্যাবর্ত্তই মোক্ষ-সূত্রের জন্মভূমি। এই ঘোর জীবন রহস্য ঘোষজ মহাশয় যথাসাধ্য আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন। এই আপাত দুঃখময় জীবনের যে কিরূপ সুখশান্তি-পূর্ণ অবসান সম্ভব, তিনি তাহা প্রত্যক্ষীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবকে আসক্তি-শূন্য হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন—কণ্টক দ্বারা কণ্টক উৎপাটন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহার গীতি-নাট্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সেই রঙ্গ মঞ্চে বসিয়া হৃদয়ঙ্গম করা নিতান্ত দুরূহ। ইহা কেবল স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়, হৃদয়ে কেবল একটী অস্পষ্ট রেখা অঙ্কিত করিয়া দেয়। মনোহর দৃশ্যপট, সদ্ভাবপূর্ণ, তান-লয়-সুসঙ্গত গীতাবলি, নৃত্য-বাদ্য সন্দর্শনে বোধ হইবে, শ্রোতৃগণ কোন চমৎকার-জনক লোকে আসীন। তখন—

"কম্বুগ্রীবা বিলম্বিত মন্দারের মালা
তানমান সুসঙ্গত ভূষণ শিঞ্জন
নৃত্যপরা বিম্বাধরা বিদ্যাধরী বালা
উল্লাসে উৎফুল্ল আঁখি নিরখে সে জন"

গান হৃদয়ে স্বতঃই ঝঙ্কার করে। এরূপ চিত্র যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান করিতে কয় জনের সাধ্য হয়। ইহা স্বপ্ন—স্বপ্নের, উৎকৃষ্ট প্রহসন। (গীতি-নাট্যের

নামকরণ যথাযোগ্যই হইয়াছে। সত্য সত্যই রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিলে আমরা যে কি দেখিয়া আসিলাম, তাহার কিছুই প্রায় মনে থাকে না। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় পূর্ব্বানুভব সমুদয় কুজ্ঝটিকাবৃৎ বলিয়া সন্দেহ হয়। ইহা স্বপ্ন হইলেও সুখস্বপ্ন, রহস্য হইলেও হৃদয়গ্রাহী।)

গিরীশ বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু সাধারণ নাট্যাভিনয়-দর্শকগণের পক্ষে তাঁহার গ্রন্থ কিরূপ উপাদেয় হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। জননী যেমন অসুস্থ শিশুকে তিক্ত, কষায় ঔষধ সেবন করাইবার জন্য প্রথমে স্তনদুগ্ধাদি নানাবিধ মিষ্ট ও সুস্বাদু দ্রব্য আহার পান করাইয়া পরে ঔষধ মুখে প্রদান করেন, সেইরূপ ঘোষজ বাবুও, আলাদ্দিন, আবু হোসেন প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রথমে অবতারণা করিয়া পরে এই প্রথম স্বাদে অতি তিক্ত ও নীরসবৎ প্রতীত দার্শনিক নাটকের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। এখন ইহা সাধারণে গলাধঃকরণ করিলেই তাঁহার শ্রম সফল হইবে। তাহাতে সমাজ-পীড়ার শান্তি হইবারও সম্ভাবনা।

(জন কয়েক ইংরেজী শিক্ষিত যুবক, অভিনয় দর্শন করিয়া বলিয়াছেন,—"This is a ludicrous combination of the serious and the grotesque. It is a failure.")

গ্রন্থখানি উন্নত আধ্যাত্মিক ও অতি সাধারণ হাস্যোদ্দীপক ঘটনাবলির সংমিশ্রণে গ্রথিত। কিন্তু আমরা এই নব্য সম্প্রদায়কে বলিব একে তো তিক্তরস, তাহাতে যদি সাধারণ ভাব ও হাস্যরসের সঞ্চার না থাকে, কিছু মুখরোচক দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ইহা দর্শন মাত্রেই বমন করিবেন। যদি কেহ বলেন কে প্রণেতাকে মোক্ষ-সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার ও উপদেশ দিবার জন্য গ্রন্থ রচনা করিতে মাথার দিব্য দিয়াছিল? তাহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিব, নাট্যশালা সকল সময় না হউক কখন কখন সমাজের পরামর্শদাত্রী। সমাজের দোষ গুণ চিত্রিত ও পরিস্ফুট করাই রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক।

(সাধারণে এ নাটকের ও অভিনয়ের আশানুরূপ সমাদর যদি না হয়, তথাপি ক্ষুণ্ণ হইবার প্রয়োজন কি? গুণগ্রাহী ভাবুকগণের চিত্তে তাঁহার

রচনা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিবে।) এই অধর্ম্ম-যুগে, নির্ব্বাণ লাভের তৃষা কয় জনের আছে? যাঁহাদের আছে, গ্রন্থ তাঁহাদের শিরোমণি তুল্য হইবে। সাধারণে তাঁহার এই অত্যুচ্চ ভাবোদয়ের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না বলিয়া, তাহার অঙ্কিত চিত্র সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিফলিত হইল না বলিয়া, তাঁহার ন্যায় সদ্বিবেচক কখনও নিরাশ হইবেন না। অনেকে রামপ্রসাদের ভক্তিময় সঙ্গীত-সমূহকে ও তাহার হৃদয়ের নিভৃত-কক্ষের ধ্বনিকে মদ্যপায়ী দুরাচারের বিকৃত-চিত্তের উচ্ছ্বাস বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। তৎকালে উহা "কুরুচিপূর্ণ" "অশ্রাব্য" প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত হইত। ইংরাজী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, আপনার এক্‌সকর্‌সন্ (Excursion) অর্থাৎ তত্ত্বানুসন্ধিৎসা-মূলক পর্য্যটন নামক পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি আমার পুস্তকে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত থাকে, তাহা হইলে সময়-স্রোতে এক সময় না এক সময় আমি আমার পরিশ্রমের যথার্থ ফল লাভ করিব।" আমরা দুই ছত্র উদ্ধৃত করিব—

Which if with truth it corresponds. * * Muses shall accept with gracious smiles *** and listening time reward it with sacred praise. Excursion line 106—8.

মহাকবি ভবভূতির এই দশা ঘটিয়াছিল। কবি খেদেই বলিয়াছিলেন,—

"কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

কাল অনন্ত ও পৃথিবী বিপুল। কোন সময়ে কোথাও না কোথাও কেহ না কেহ আমার গুণ গ্রহণ করিবে। এই সকল জানিয়া শুনিয়া যে রচয়িতা নাটক সুসঙ্গত হইল না বলিয়া দুঃখিত হইবেন, ইহা তো আমাদের বোধ হয় না।

কবির কল্পনা-শক্তিকে ধন্যবাদ। তাহার সকল দর্শন-বিষয়ক প্রচুর জ্ঞানও ধন্য। তিনি যে এরূপ দুরূহ বিষয়—সরল, মধুর, ভাষায় বিবৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহার জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। তিনি চিরজীবী হইয়া বঙ্গমাতার গৌরব বৃদ্ধি করেন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

"বেঙ্গলে" 'পুরুবিক্রম' ও 'নাট্যবিকার'।

এখানে পুরু-বিক্রম অতি পরিপাটিরূপে অভিনীত হইয়া গিয়াছে। পুরুরাজ, অশ্বপৃষ্ঠে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া দর্শককুলকে বিস্ময়াপন্ন করিয়া দিয়াছেন। সেই অশ্ব, কৃত্রিম অশ্ব নয়—যথার্থ অশ্ব। এক কথায় এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে. অম্বালিকার অংশ ব্যতিরেকে আর সকলেরই অভিনয়—নির্দ্দোষ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুতরাং মনোহর। সর্ব্বাপেক্ষা পুরু ও ঐলবিলা গৌরবের বস্তু। আমরা যে অভিনয়ের এস্থলে উল্লেখ করিতেছি, তাহা পুরুবিক্রমের শেষ অভিনয় দিনের কথা। অম্বালিকা, ক্রন্দন-মিশ্রিত স্বরে উত্তম সুরে যে সুমিষ্ট গীতিকা গাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সামান্য ত্রুটি ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইবার অনুপযুক্ত। "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই যে মহতী উক্তি আছে, ঐ সঙ্গীতে তাহা দেখাইয়া দিয়াছে।

নাট্যবিকারের অভিনয়, বঙ্গরঙ্গভূমিতে আবহমান কাল সুচারুরূপেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পুস্তক খানি যাঁহার লেখনী প্রসূত. তিনি এক জন লিপিপটু ব্যক্তি। ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের উপর কটাক্ষ নাই। ইংরেজীর অনুকরণে যে যে বাঙ্গালা উপন্যাস হইয়াছে, সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া তদনুকরণে মনের কার্য্য চালিত হইলে, যে দোষ ঘটে, তাহাই 'নাট্যবিকারের" বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিগত দোষের উপর তীব্র দৃষ্টি নাই। স্বার্থসিদ্ধির গন্ধবাষ্পও আঘ্রাত বা দৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়?

"এমারেল্ডে" 'মান'।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু রায় বাহাদুরের সঙ্কলিত "মান" এই নাট্যভূমিতে অত্যুৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হইতেছে। "মান" আদ্যোপান্ত মধুর। জানি না, কতগুলি লোকে নিরবচ্ছিন্ন মধুর মধুর বিপক্ষ আছেন কি না। জানি না, অম্ল মধুর মধুর কয় জন প্রত্যাশী। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ প্রভৃতি মহাজনগণের মনোহর পদাবলী তানলয়-সংযোগে প্রগীত হইয়া শত শত ভক্ত-সাধুর চিত্তক্ষেত্র দ্রবীভূত করিয়া দিতেছে। নব নৃত্য, নবীন অভিনেতা, নবীনা অভি-

নেত্রী, নূতন সাজ-সজ্জা, সুষমাধার বেশভূষা, সম্ভাবপূর্ণ হাব-ভাব ইত্যাদির সুশিক্ষা-প্রদানে মুস্তফি মহাশয়, আমাদের অশেষ ধন্যবাদের ও শ্লাঘার পাত্র। অভিনেতা, অভিনেত্রীরা অভিনয়-কার্য্যে নূতন ব্রতী হইলেও, শিক্ষায় প্রবীণ ও প্রবীণা। প্রথমে নারদের গান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে সখীগণের গীতিকা পর্য্যন্ত সমস্তই মধুর।) আহা! "মান" কি মাধুরীময় মধুর!

"অনুশীলনে" 'রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হইতেছে দেখিয়াই ও নাট্য-শালায় অভিনয়ের আলোচনা হয় বলিয়াই এবারে "চন্দ্রশেখর" প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত করিতে হইল।

বক্তব্য

আমাদের পত্রিকা সাপ্তাহিক বা দৈনিক নয়, সুতরাং আমাদের পত্রে প্রকটিত মত অস্থায়ী হইবে না। স্থায়ী সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে রঙ্গালয়ের ইতিহাসের ভবিষ্যতে সাহায্য করিবে, এই কারণেও এই প্রস্তাব প্রচারিত করা গেল।

'সমীরণে' "চন্দ্রশেখর" প্রচারিত হইয়াছে। "অনুশীলনের" চন্দ্র-শেখর-প্রবন্ধ-লেখক, ইঙ্গিতে 'সমীরণের' প্রস্তাব-লেখকের কোন কোন মত খণ্ডিত করিয়াছেন। যদি কেহ এতৎ-সম্পর্কে বিপক্ষে কিছু লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।—তত্ত্বাবধারক।

একটী হিন্দু-রমণী।

অযত্নসম্ভূত সাধারণ শিক্ষা হইতেও সময়ে সময়ে দুই একটা ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শন করা, এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধের প্রারম্ভে বাক্-চাতুরী নিরর্থক। এই প্রস্তাবে যে রমণীর প্রসঙ্গ করিতেছি, তাঁহার নাম কুসুমকামিনী। তিনি ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

কুসুমকামিনী শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষের ঔরসে ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ভাদ্রের কোন্ দিবসে বা কোন্ তিথিতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। যশহরের আনুমানিক ৫ পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী তলকুপি-মঙ্গলপৈতা গ্রাম, ঘোষজের আবাসভূমি;

সুতরাং পল্লীগ্রামই যে কুসুমকামিনীর জন্মস্থান, তাহা পাঠক-পাঠিকারা বোধগম্য করিতে পারিতেছেন। শ্যামাচরণ ঘোষ, উদ্যম, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণের আধার। তাঁহার মোক্তারি কর্ম্মে বার্ষিক ৮০০্ আট শত টাকা অর্থাগম হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার ন্যূনাধিক ৪০০০০ চল্লিশ হাজার টাকার সম্পত্তি। সকলে হয় তো ভাবিতেছেন, কুসুমকামিনীর জীবনচরিতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির সাড়ম্বর উল্লেখ কেন হইতেছে? এই রমণী কুসুমকামিনী অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ব্যক্তির দুহিতা অথচ ধনে তাঁহার নিস্পৃহা। অনেক অঙ্গনা অলঙ্কারবিবর্জ্জিতা এবং স্বভাবতঃ দীনা। তাঁহাদের দীনতার হেতু নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইলে, সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, পিতার সম্পন্ন অবস্থায় সঞ্জাত হইলেও তিনি দৈন্যভাবাপন্না হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দীনভাব, উৎপত্তি-স্থলে নয়,—কার্য্যক্ষেত্রে। ভাবী পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের সকাশ হইতেই ঐ গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! কুসুমকামিনীর শ্বশুর সত্যপ্রিয়তা, বদান্যতা, গুরুভক্তি, দীনতা, ধর্ম্ম-প্রবণতা ইত্যাদি গুণে মণ্ডিত ছিলেন। যাঁহার বাৎসরিক ৪০০।৫০০ টাকা দান ছিল, তাঁহার বদান্যতা যেমন প্রশংসনীয়, তাঁহারই নিরীহতা বা দীনতা তেমনই প্রশংসনীয়, ও অনুকরণীয়, তাহাতে সন্দেহ কি?

অতএব বলিতে হয়, অতি সুযোগ্য পরিবারে তাঁহারি পাণ পীড়ন ঘটিয়াছিল। তাঁহার জনকের প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল। তথাপি কন্যার ভূষণে নিরীহ ভাব দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন। অলঙ্কার-নিস্পৃহতাই কি একমাত্র গুণ? আর কোনও সুগুণে কি তাঁহাকে বিমণ্ডিত করিতে পারে নাই? উহার আনুষঙ্গিক সহ্যগুণও ছিল। সে গুণটাই তাঁহার অহঙ্কারের অভাব। সাধারণ বালক-বালিকার সদৃশ তাঁহাকে বিবাদ কলহ করিতে কেহ কখনই প্রত্যক্ষ করে নাই। কি বাল্যে, কি যৌবনে সকল অবস্থাতেই তিনি সত্যবাদিনী মৃদু-মধুর-ভাষিণী। বাক্যনিষ্ঠা কার্য্য-নিষ্ঠাদিও তাঁহার চির-সহচর। তিনি যেমন পার্থিব তুচ্ছ ধাতুর আভরণে অস্পৃহাবতী ছিলেন, সেইরূপ এই সমস্ত সদ্গুণ এই তাঁহার অপার্থিব আভরণের স্থানীয় হইয়াছিল। এ সমস্ত গুণ-মণ্ডিতা, কুসুমকামিনী আমরণ জনক জননীর আজ্ঞাবহ

থাকিবেন, ইহা কদাপি বিস্ময়াবহ হইতে পারে না। সুতরাং বিচিত্র কার্য্যও হইল না। তাঁহার চরিত্র অতিমাত্র শান্ত, মধুর। আজীবন ধর্ম্মানুরাগ তাঁহার অত্যন্ত প্রবল ছিল। এই সকল কারণে এই গুণবতী রমণীর ভাগ্যে সর্ব্বজনপ্রিয়তা যুটিয়াছিল। এ সকল তো গেল নৈতিক গুণের কথা। এইবার তাঁহার বিদ্যা-বিষয়ক গুণাগুণের পরিচয় লওয়া যাউক।

অতি-শৈশবকালেই তাঁহার অনুসন্ধিৎসা গুণের আস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। একটী উদাহরণ দিতেছি। যখন তাঁহার বয়স ৭০সাত কি ৮ আট বৎসর, তখন তিনি চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়া পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, ওটা কি?, ওটা কত বড়?—ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে, তাঁহার মনে তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য একটা জ্ঞান পিপাসা উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকের নিকট ইহা বোধ হয় অসঙ্গত প্রশংসা বলিয়া বোধ হইবে; কিন্তু আমাদিগকে যাঁহারা এ ঘটনা অবগত করাইয়াছেন, তাঁহাদের সত্যবাদিতায় অবিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখিতে পাই নাই। বরং অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি, তাঁহারা—তাঁহাদের পরিজন সকলেই সত্যের চির-সেবক। এতদ্ভিন্ন আর এক কথা এই যে, যাঁহাদের স্বাভাবিক সুতীক্ষ্ণ মনীষা তাঁহারা শিশু কাল হইতে অনুসন্ধিৎসু। দশম বর্ষে (১২৮৩ সালের ১৯শে ফাল্গুনে) তাঁহার পরিণয় ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বরের গুণগ্রামে সংখ্যাতিরিক্ত প্রতিপত্তি শ্রবণগোচর হওয়া অবধি তিনি আপন মনেই জীবনের চির সঙ্গী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সুতরাং পাত্র-নির্ব্বাচনেও তিনি হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ-নারী-জীবনেরই অনুকারিণী। পাত্রের নাম শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র-গোপাল মিত্র। পাত্রটি বি,এ, বি, এল উপাধিধারী ও হাইকোর্টের উকীল।* বিবাহকালে কন্যার পিতামহীরই অধিক কার্য্যকারিতা অবলোকিত হয়। তিনিই ঐ নির্ব্বাচনকারিণী। উত্তর কালে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, গুণবত্তা, তদীয় দূরদৃষ্টি তদীয় পৌত্রীর অধিকৃত হইয়াছিল। উদ্বাহ-সময়ে এই বালিকা বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার রীতিমত পাঠের সূত্রপাত হয়, বলিতে হইবে। তিনি ৪ চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় যাবৎ প্রধান

* পরিণয় সময়ে বর, ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। পরে উকীল হইয়াছিলেন।

প্রধান বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ শ্রুতিধরী, তাহাতে ত্রয়োদশ বর্ষেই তিনি অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় পাঠ করিয়া ফেলেন।" এই সময়ের মধ্যে তিনি, নবনারী, সুশীলার উপাখ্যান, বিজয়-বসন্ত, মেজ বৌ ইত্যাদি স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থ পড়িয়া লন। সাহিত্য-সম্বন্ধে সীতার বনবাস ও শকুন্তলা, চারুপাঠ তিন ভাগ, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, ধর্ম্মনীতির কিয়দংশ, প্রভাত চিন্তা, মেঘনাদ-বধ, সদ্ভাবশতক ইত্যাদি গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া নিজায়ত্ত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার বোধাধিকার কিরূপ ঘটিয়াছিল, ঘটনা ক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। "মেঘনাদ-বধ" কি, দুরূহ গ্রন্থ, তাহা ঐ পুস্তক-পাঠকগণের মধ্যে কাহারই অজ্ঞাত নাই। কিন্তু এই গ্রন্থে তাঁহার এত ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল যে, তিনি আপন দেবরকে তাঁহার বিদ্যালয়ের পাঠ্য ঐ পুস্তকের অর্থাদি অবলীলাক্রমে বুঝাইয়া দিতেন। এই বৃত্তান্ত, তাঁহার দেবর স্বয়ং এই লেখককে উৎসাহ সহকারে বলিয়াছেন। নাটকের মধ্যে সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র প্রণয়-পরীক্ষা, রামাভিষেক ইত্যাদি নাটক তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি তিনি পড়িয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" ও "দুর্গেশ-নন্দিনী" পাঠে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা এস্থলে উল্লিখিত হইল। তিনি সূর্য্যমুখীর বড়ই পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। তাহার কারণ, জিজ্ঞাসু হইলে তিনি বলিতেন, সূর্য্যমুখীর পতিপরায়ণতা অতি শ্রেষ্ঠগুণ। সেই গুণেই তিনি "বিষবৃক্ষে" উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। দুর্গেশনন্দিনী তাঁহার ভাল লাগিত না। বিমলা ও দিগ্গজের চরিত্রের জন্য উহা তাঁহার বিস্বাদ বোধ হইত। "বঙ্গ-বিজেতা"ও "জীবন সন্ধ্যা" প্রভৃতিও তাঁহার অপঠিত ছিল না। শেষোক্ত পুস্তকে চরণদের গদ্য গানের তিনি প্রশংসা করিতেন। হেমচন্দ্রের "কবিতাবলী", নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" ও বলদেব পালিতের "কর্ণার্জ্জুন কাব্য' উত্তমরূপে পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহাদের অন্যান্য কবিতা-পুস্তক অল্প পরিমাণে তাঁহা কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-নাথের বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ও বিবিধ প্রসঙ্গের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্গ-বিধবাগণের সম্বন্ধে যে একটী প্রবন্ধ সাবিত্রী লাইব্রেরীতে পাঠ করেন, তাহা এই কামিনী মুখস্থ করিয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে তাহা আবৃত্তি করিয়া সরকার মহাশয়ের রচনা-নৈপুণ্য বিষয় উল্লেখ করিতেন। ফলতঃ, সরকার মহাশয়ের সহিত দুই এক স্থলে তাঁহার মতভেদ ছিল; তাহা পরে প্রকাশ পায়। সরল মুষ্টিযোগ প্রভৃতি ঔষধ-গ্রন্থ ও যদু বাবুর ধাত্রী-শিক্ষা তিনি বিশেষরূপে পাঠ করিয়াছিলেন। এই রমণীর গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিশারদ* তাঁহাকে স্বরচিত লুক্রেসিয়া ও অন্যান্য কাব্য উপহার দেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই তাঁহার মুখস্থ ছিল।

সাধারণ কামিনীর ন্যায় এই কামিনীও ইংরাজি পড়েন নাই; অথচ বিশুদ্ধ সুতরাং উত্তম জ্ঞানার্জনে অধিকারিণী হইয়াছিলেন। সাধারণ নারী হইতে ইহাঁর প্রভেদ এই, এই রমণী সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। কোন পরীক্ষাও দেন নাই; কোন আড়ম্বরও করেন নাই, অথচ গদ্য পদ্য রচনায়, কেবল রচনায় কেন যুক্তি তর্কেই বা কেমন ছিলেন; তাহার প্রমাণ দিবার জন্য আমরা তল্লিখিত পত্র, মুদ্রিত পুস্তক ও অপ্রকাশিত রচনা হইতে পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার স্বরূপ দিব। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে এই রমণীকে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য তদীয় স্বামীকেও কতক কতক বাঙ্গালা ভাষা পাঠ করিতে হইত। তাহাতে এই সুফল উৎপন্ন হইয়াছে যে, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য হইলেও উপেন্দ্র বাবুর বঙ্গ ভাষায় বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়া গিয়াছে। তিনি একখানি বঙ্গভাষায় মহম্মদীয় আইন প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার বোধাধিকার ও রচনা ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। দানশীলতা, অমায়িকতা, পরিচারক, পরিচারিকাদের প্রতি সৎকথা ও সদাচরণ, পতিপরায়ণতা, সুকুমার কারুকার্য্য, গাম্ভীর্য্য অথবা সারল্য, দেবরাদি স্নেহাস্পদগণের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রীতি মমতা এবং গৃহস্থলীর কর্ম্ম এ সমস্ত বিষয় উল্লেখ করিতে গেলে একখানি বৃহৎ পুস্তকেও স্থান সংকুলান হওয়া দুর্ঘট। তাঁহার স্বহস্ত-রচিত একটি কম্ফর্টার আছে। সেইটি আমরা স্বয়ং দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

*কালীপ্রসন্ন বাবু ভূতপূর্ব্ব "প্রকৃতি" নামী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি হিতবাদীর বর্ত্তমান সম্পাদক।

হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর।

(রেলওয়ে ভ্রমণ)

রেলওয়ে হইবার পূর্ব্বে হাবড়া একটী সমান্য উপনগর-মাত্র ছিল। তখন এই স্থানে জাহাজ মেরামতের ডক্ ছিল। হাবড়ার পারে স্থানে স্থানে অদ্যাপি জাহাজ-নির্ম্মাণের ডক্ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে দিন দিন ইহার কলেবর ও অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। গঙ্গায় উপস্থিত হুগলী ব্রিজ নামক সেতু দ্বারা কলিকাতার সহিত হাবড়া সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে।

হাবড়ায় অমদানী-রপ্তানী মালের গুদাম ও রেলওয়ে আফিস আছে. কল প্রস্তুতাদির কারখানা প্রথমে হাবড়ায় ছিল। কিন্তু উত্তরোত্তর মালামাল এত আমদানী রপ্তানী হইেত আরম্ভ হয় যে, স্থানাভাবে ইহার অনেকগুলি আফিস ও কল প্রস্তুতের কারখানা, জামালপুরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

হাবড়ার ষ্টেশন ছাড়িয়া রেলরাস্তা. মাজিষ্ট্রেট কাছারির নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। লোকের চলাচলের বড় রাস্তা চাঁদমারি নামক সেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। রেল রাস্তা প্রায় সিকি মাইল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে। রেলওয়ে কোম্পানী গঙ্গার ধার হইতে হাবড়ার গির্জ্জা ও কবর-স্থানের সন্নিকট পর্য্যন্ত সমস্ত জমী দখল করিয়াছেন। লাইনটী, আর টীলারি জমির উপর দিয়া গিয়াছে। ষ্টেসন হইবার পূর্ব্বে এই জমী, দমদমায় মনোনীত হয় ও তথায় উঠিয়া যায়। হাবড়ার সন্নিকটস্থ ঘুষুড়িতে একটী তুলার কল আছে এবং উহাতে বিস্তর লোক খাটিতেছে; সুতরাং বলিতে হইবে, অনেকেই উহাতে প্রতিপালিত হইতেছে। (১)

ট্রেন্ হাবড়া ষ্টেশন পরিত্যাগ করিয়া 'নেলো' নামক একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনের মধ্য দিয়া শস্য-ক্ষেত্র ভেদ করিয়া বালি ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বালি,—বালি নামক খালের নিকট অধস্থিত। কলিকাতা হইতে উহা ৩।০ সাড়ে তিন ক্রোশ। রেলরাস্তা লৌহ-সেতুর উপর দিয়া খাল পার হইয়া

(১) ঘুষুড়ির বৌদ্ধ মন্দিরের প্রসঙ্গ গত বারে পাঠক অনুশীলনে পড়িয়াছেন।

—সম্পাদক।

চলিয়া গিয়াছে। এই স্থানের দক্ষিণে পূর্ব্বে একটী বৃহৎ বাড়ীতে চিনি ও এদেশীয় রম নামক মদ্য প্রস্তুত হইত। এই বাটীর পার্শ্বেই বালির কাগজের কল। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তাটী বালির খালের নিকট আসিয়া ঝোলা পোলের উপর দিয়া নদী পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পোলটী কর্ণেল গুড্ উইল্ কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। বালিতে বিস্তর ব্রাহ্মণের বাস। যে সময় গবর্ণর হেষ্টিংস কর্ত্তৃক মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর হুকুম হয়, কলিকাতার যত ব্রাহ্মণ কলিকাতায় ব্রহ্মহত্যা হইলে কলিকাতা অপবিত্র, মহাপাপে লিপ্ত ও কলুষিত হইবে, এই আশঙ্কায় বালিতে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন এবং আর কখন কলিকাতাভিমুখী হইবেন না, প্রতিজ্ঞা করেন। এক্ষণে তাঁহাদেরই বংশাবলি, প্রত্যহ কলিকাতায় আফিসাদিতে কর্ম্ম করিতে আইসেন ও নিত্য প্রত্যাগত হন। বালি পরিত্যাগ করিয়া ট্রেন ধান্য-ক্ষেত্র ও পানের বরোজ দেখিতে দেখিতে কোন্নগরে আসিয়া উপস্থিত হয়।

কোন্নগর, কলিকাতা হইতে ৫ পাঁচ ক্রোশ। ইহাকে জামাই ষ্টেশন বলিলেও চলে। এখান হইতে যত আরোহী গতায়াত করেন, জামতার ভাগ বার আনা, স্থিকি অধিবাসী। কোন্নগর একটী বৃহৎ গ্রাম। তথায় বিস্তর লোকের বাস। কোন্নগরের পর পারে গঙ্গার ধারে টীটেগড় নামে একটী স্থান আছে। ন্যূনাধিক ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে টীটেগড়ে বিস্তর জাহাজ নির্ম্মিত হইত। বিদ্যমান সময়ের টিটেগড়ের কাগজের কল বিখ্যাত। কোন্নগরের পর শ্রীরামপুর।

শ্রীরামপুর, ১৭৫৫ হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিনেমারদিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল। শেষোক্ত অব্দে তাহারা ১২ বার লক্ষ টাকা লইয়া স্থানটী ইংরাজদিগকে বিক্রয় করে। দিনেমারেরা ডেন্‌মার্কের লোক। তাহারা খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে বাঙ্গালা দেশে বাণিজ্য করিতে আসে। উহাদের পুরাতন গুদাম-ঘর অদ্যাপি গঙ্গাতীরে বর্ত্তমান। শ্রীরামপুরের গির্জ্জা, ইংরেজী ১৮০৫ সালে নির্ম্মিত হয়। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১৮,৫০০ আঠার হাজার পাঁচ শত টাকা ব্যয় হয়। গির্জ্জাটী বেশ সুদৃশ্য। ১০০০্ এক হাজার টাকা বাদে সকলই চাঁদায় উঠিয়াছিল। ঐ সহস্র মুদ্রা মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি প্রদান

করেন। এখানে আর একটী সুন্দর রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা আছে। উহা ১৭৬৬৯ অব্দে ব্যারাটোস সাহেব কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিসন ১৭৯৯ অব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই মিসনের সৃষ্টিকর্ত্তা কেরি, ওয়ার্ড, মার্সমন্ প্রভৃতি। তাঁহাদিগের এই স্থানেই মৃত্যু হয়। গঙ্গার ধারে শ্রীরামপুর কলেজ অবস্থিত। এই সুন্দর কলেজ বাড়ীটী, ১৮৮৮ অব্দে নির্ম্মিত হয়। বাড়ী নির্ম্মাণের টাকা কতক মিসনারি ভাণ্ডার হইতে, কতক শ্রীরামপুরের মিসনারিদের দ্বারা প্রদত্ত হয়। বাড়ীর ছাদ উত্তম। সিঁড়ি ভাল লৌহ-নির্ম্মিত। কলেজ লাইব্রেরিটী বড় পরিপাটী। উহাতে অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পাওয়া যায়। শ্রীরামপুরের মিসনারিরা প্রথমে সংবাদপত্র বাহির করেন। ইহাদিগের সম্পাদিত ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত প্রচারিত হইয়াছিল(২)। এখানকার কাগজের কল সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়। এই কল, এক্ষণে পাটের গাঁট-কসা কলে পরিণত হইয়াছে। শ্রীরামপুর, রেসমের কারখানার জন্য বিখ্যাত। এই কারখানা হইতে সুন্দর সুন্দর হাত-রুমাল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শ্রীরামপুরের পর-পারে বারাকপুর। বারাকপুরে গবর্ণর জেনেরালের বাগান ও সুন্দর বাটী আছে। ট্রেন শ্রীরামপুর ছাড়িয়া বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে বিস্তর এদেশীয় চিকিৎসক বাস করায় ঐ স্থানের নাম বৈদ্যবাটী হইয়াছে। এই স্থান, কলিকাতা হইতে ৭॥০ সাড়ে সাত ক্রোশ। এখানে কয়লার গুদাম আছে। বৈদ্যবাটীর চতুর্দ্দিকের গ্রাম ইহাতে কলিকাতার তরি তরকারী সংগ্রহ করিয়া দেয়। ইহার তীরে প্রত্যহ শত শত নৌকা তরকারী বোঝাই করিয়া কলিকাতায় যাতায়াত করে। ঐ স্থানের পরপারে পল্‌তা নামক স্থলে জলের কল আছে। ঐ কলে জল পরিষ্কৃত হইয়া কলিকাতায় যাইতেছে।

সেওড়াপুলি হইতে তারকেশ্বর লাইন গিয়াছে। সেওড়াপুলির নিস্তারিণী দেবী বড় জাগ্রত। বাজার-হাট ভাল। ঐ রেলের ধারে গোবিন্দপুর, সিঙ্গুর,

(২) উহা 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে।—সম্পাদক।

নালীকুল, হরিপাল, বাহিরখণ্ড ও তারকেশ্বর ষ্টেশন আছে।

তারকেশ্বরে, তারকনাথ নামক শিবের আবাস-স্থান। ইহাঁর পূজা দিতে প্রত্যহ শত শত যাত্রী যাইয়া থাকে।

দু'টী তারা

নীল নিথর গগন গায়—
বিমল বিভা বিধু বিলায়—
    ধরণী ধৌত রজত ধারে।
প্রাসাদ'পরে বসিয়া বামা—
"হিরণ হীন হিম ধাম।"
    আপনা হারা শোভা নেহারে।
চাঁদ চকোরে করিছে কেলি
কুমদবালা হাঁসিছে হেলি'
    সোহাগভরে সরসী কোলে।
বন উজলি ফুটেছে ফুল
গুঞ্জরি' ফেরে মধুপকুল
    ধীর সমীরে লতিকা দোলে।
কুসুম কুঞ্জে তুলিছে তান
পিক পঞ্চমে মাতা'য়ে প্রাণ
    মরি মাধুরী ভুবন ভরি'।
সাজায়ে দিয়ে তারকা তুলি'
ভাসায়ে দেছে জলদ গুলি
    সুরকুমারী সাধের তরি।

বহিছে মৃদু মধুর বায়
স্বর তরঙ্গে তরণী তায়
হেলিয়া দুলিয়া যেতেছে ভাসি।
ধীরি ধীরি বিধু বহিছে তরী
"কে যাবি, আয় তারা সুন্দরী—?
ডাকিল বিধু মুচকি হাসি'।
তারকারা সব এলো ছুটে—'
জলদ-তরি উঠিল ফুটে'
ধরিয়া হৃদে সে রূপ রাশি'।
সুস্বনে বীণা ঝঙ্কার লুটি—'
দিগন্ত হতে তারকা দুটী—
কহিল—"রহ নিশি বিলাসী।"
"না" বলি' মানা করিল চাঁদ
তোরা গেলে' ঘটিবে প্রমাদ—
সিত শর্ব্বরী অসিত হবে।
তোমরা দোঁহে তারকা রাণী
হাসিলে খুলে' বদন খানি—
আকাশে তবে আলোক রবে।
না—না তা'—না ওহে শশধর!
সবার চেয়ে উজলতর
ঐ দেখ দুটী তারকা জ্বলে।
ঐ যে আনন করেতে রাখি'
চেয়ে আছে অনিমেষ আঁখি
রূপসী রাণী অবনী তলে।
আমরা গেলে' ও দুটী তারা
ঢালি' ত্রিদিবে রজত-ধারা
কিরণ দেবে মোদের তরে।

চমকি' চাঁদ ভূতলে চায়
অবাক্ হেরিয়ে দুটী তারায়
কোটী কহিনূর কান্তি ঝরে—
অম্‌নি করে' থেকো ধনী! চেয়ে,
এত বলি' শশী সনে ধেয়ে
তারকা দুটী চলিল ছুটি'।
গগন-গায়ে সে সারা রাতি
বিলায়েছিল বিমল ভাতি
তারা-কারা আঁখি তারা দুটী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

প্রভাত।

(শ্রাবণ মাসের "জন্মভূমি"তে বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-বিরচিত "সন্ধ্যা" পাঠোপলক্ষে রচিত)

অবসান তিমির-রজনী।
বিমল উষার কোলে,
তরুণ অরুণ জ্বলে,
উজল ধরণী।
ধীরে ধীরে উঠে জাগি' প্রভাত-মাধুরী,
ম্রিয়মাণ গতপ্রাণ কৃষ্ণ বিভাবরী। ১।
প্রভাতের ছায়া সুশীতল,
তাপিত মানব প্রাণে
কি জানি কি শান্তি আনে,
সুধা নিরমল;
নরের অকুল তৃষা মিটাবার তরে,
সৌন্দর্য্য লহরী অই উঠে থরে থরে। ২।

দুখ-নিশা হ'ল অবসান!
তাপিত-মানব-হিয়া,
উঠিতেছে ব্যাকুলিয়া
চাহি পরিত্রাণ;
তাই বুঝি দূরে হাসে প্রভাত তপন;
অশান্ত হৃদয়ে করি শান্তি বিতরণ। ৩।

নিয়তির কঠোর কঠিন
লৌহের শৃঙ্খল রাশি.
ঐই বুঝি গেল ভাসি,
উঠিল নবীন
বিহঙ্গ-কূজিত নব বসন্ত প্রভাত;
অবসান মানবের শেষ-অশ্রুপাত। ৪।

স্বাধীনতা উঠিল জাগিয়া!
জগতের হাহাকার,
ক্রূর হাসি অত্যাচার,
গেল ফুরাইয়া;
শান্তির পীযূষ ধারা বারি বরিষণ:
নিবারিল মানবের জ্বলন ভীষণ। ৫।

সৌন্দর্য্যের অসীম বিকাশ!
হেরিয়া বিমুক্ত প্রাণ,
আনন্দে করিল গান;—
আনন্দ আভাস;
মানবের, জগতের হাস্য সুমধুর;
উল্লাসের কোলাহলে ধরা ভরপূর। ৬।

একি চারু প্রাণের স্বপন!
এমন, সৌন্দর্য্যাধার,
মানব দেখেনি আর

ললিত, মোহন ;
জানে নাই, ভাবে নাই, কাল-বিবর্ত্তনে,
আসিবে এমন দিন মানব-জীবনে। ৭।
সম্মুখেতে উন্নতি অপার,
দর্শন বিজ্ঞান রাশি,
করিতেছে হাসি খুসি,
কত আবিষ্কার ;
বিমুক্ত বিমান আর প্রকৃতির ঠাঠ
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে করিতেছে পাঠ। ৮।
চাহে কবি আকুল নয়নে
প্রসারিত হৃদিতল,
নেত্র কোনে অশ্রুজল,
এ শোভা দর্শনে ;
ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু তার গিয়াছে ভাসিয়া,
অনন্ত সৌন্দর্য্য পানে চাহিয়া চাহিয়া। ৯।
বিকশিত প্রতিভা মুকুল !
মধুর সৌরভে তার,
ভরিয়াছে চারি ধার,
অবনী আকুল ;
দারিদ্র্যের নির্য্যাতন হইয়াছে শেষ ;
ধীরে ধীরে সুখ রবি হয়েছে উন্মেষ। ১০
প্রকাশিত স্বাধীন প্রভাত
নরের সৌভাগ্য বলে,
ধরা হ'তে গেল চলে,
ভীম ঝঞ্ঝাবাত ;
প্রেম আর করুণায় পূর্ণ ধরাতল ;
এ ধরা সৌন্দর্য্য ভরা পবিত্র নির্ম্মল। ১১।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

সমালোচন।

বাসনা।

১৩০১ সাল, শ্রাবণ।

'সংসার ও সাধনা' নামক প্রবন্ধে লেখক, বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, সংসারে সাধনার অন্তরায় অপেক্ষা সুবিধার সংখ্যা অধিক; সুতরাং সাধনা করিতে হইলে যে বনে যাইতে হইবে, এরূপ নয়। তিনি বলিয়াছেন, বরং বন অপেক্ষা সংসার, প্রথম সাধকের সাধনার পক্ষে অনেকাংশে শ্রেয়স্কর। সংসারে থাকিয়া যে কয় জন মাহাত্মা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, লেখক তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন। গীতার দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নিজ-যুক্তি সমর্থন করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন।

প্রবন্ধটীর সম্যক্ সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। তথাপি দুই একটী কথা বলিতে বিরত হইলে চলিবে কেন?

আসক্তি-শূন্য না হইলে যে মুক্তিলাভ অসম্ভব, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। তবে আসক্তি-দমনের উপযুক্ত পন্থা কি? সেই স্থান কোথায়? এই বিষয়ই আলোচ্য। এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রবন্ধ-লেখক এক মতের পরিপোষক সুতরাং তৎ-সম্বলিত যুক্তি তিনি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বন অপেক্ষা সংসারকে সাধনার অনুকূল স্থল বিবেচনা করেন। ইহার যুক্তি তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"চঞ্চল চিত্ত, কি বনে, কি সংসারে উভয়ত্রই ভোগ্য-বস্তু লাভ করিতে পারে। আসক্তিপূর্ণ মন; বনে সংসার সৃজন করে, আবার আসক্তি-বিরহিত অন্তর, সংসারকেও গহনে পরিণত করিয়া থাকে। সুতরাং আসক্তির নিকট বন ও সংসার দুইই সমান। সংসারে সুবিধা এই যে, সম্ভোগ্য বস্তুজাত আমাদের সান্নিধ্যে থাকায় মন ঠাণ্ডা থাকে। আরও সকল তপস্যার মূলীভূত আত্মরক্ষা, সংসারে সুখসম্পাদ্য।" ইহাই লেখকের যুক্তি মত সংক্ষেপাকারে নিবদ্ধ হইল।

আমরা বলি, কালভেদে সাধনার স্থান-ভেদ হওয়া আবশ্যক। যদিও নিকৃ-

ত্মা বনে সংসার-সৃষ্টি-সম্বন্ধে সক্ষম, তথাপি বনে যে প্রলোভন অল্প, ইহা সকলেই নির্ব্বাবাদে স্বীকার করিবেন। প্রলোভনই পতনের মূল। সুতরাং প্রলোভন-পরিহার প্রথম সাধকের কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা কামিনী কাঞ্চন সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকিলে, কাহার সাধ্য বাসনা নিরুদ্ধ করে? কামিনী কাঞ্চন পরিহার করিতে হইলে কাননাশ্রয় অনিবার্য্য, কারণ সংসারে ওরূপ করিবার চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম।

লেখক অন্যত্র লিখিয়াছেন;—

"বনে স্ত্রীমুখ-দর্শন সুলভ নহে সত্য, কিন্তু চিত্ত-পটে যে স্ত্রীমুখ অঙ্কিত আছে, অরণ্যবাসী সাধক যখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনোমধ্যে দেখিতে পাইবেন, তখন তাহার উপায় কি?",

যে সাধক, চিত্ত-পটাঙ্কিত নারী-মূর্ত্তি মুছিয়া ফেলিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সশরীরা রমণী-পরিহার কত দূরূহ বিবেচনা করা উচিত ছিল। সুতরাং সংসারে এরূপ সাধকের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা বিরল।

প্রবন্ধ-রচয়িতা লিখিয়াছেন…"লোভের বস্তু দূরে থাকিলেও যে দুর্ব্বল জীবের মনে লোভের উদয় হয় না, এমন কোন কথা নাই; বরং লোভের বস্তু নিকটে থাকিলে লোভ অপেক্ষকৃত কম হয়।"

কিন্তু লোভ যে কেন কম হয়, তাহা পাঠক বুঝিলেন কি? বস্তুতঃ লোভ চরিতার্থ করিবার আগ্রহ শিথিল হয়। কারণ, ইচ্ছামাত্র আমরা ভোগ করিতে পারি, তৃপ্তি আমাদের আয়ত্তাধীন। সন্দেশ খাইবার ইচ্ছা হইলে সন্দেশ সম্মুখে রাখিয়া তপস্যা করিবে, তাহা হইলে লোভ কম হইবে; এরূপ যুক্তি অভিনব।

তবে ইহাও সত্য যে, মন একবার পরমার্থ তত্ত্ব স্বাদ করিলে, আসক্তি-বিরহিত হইলে, উহার পক্ষে বন ও সংসার উভয়ই তুল্য। বরং সংসার, তপস্যার আনুকূল্য করিয়া থাকে।

আর যাঁহারা বনে তপস্যার বিধি দেন, তাঁহারা "বন" অর্থে মহারণ্য বলেন না। বন অর্থ প্রলোভন-বিরহ স্থান এইরূপই বলিয়া থাকেন।

প্রবন্ধটীর যাহা আপত্তিযোগ্য, তাহা বলিলাম। ঐ আপত্তি থাকিলেও

উহা শিক্ষাপ্রদ। ভাষা সরল এবং প্রাঞ্জল। একটু অধিকতর গবেষণাযুক্ত হইলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। 'প্রভাতী চন্দ্র' কবিতাটী সুন্দর এবং ভাবপূর্ণ।

সৎসঙ্গ—মাসিক পত্র, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ২য় ভাগের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংখ্যা গুলির কথঞ্চিৎ অনুশীলন করা যাইতেছে।

অসৎ সঙ্গ, কলির এই মধ্যাহ্ন-কালে প্রচুর। যদি "সৎসঙ্গ" সহজে মানুষ পায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ। তাই বলি, যাহাদের নির্ব্বাচন ক্ষমতা সুতীক্ষ্ণ নহে, তাঁহারা অভ্যাগত "সৎসঙ্গ" পাঠ করুন।

চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা সৎসঙ্গের পাঠোপযুক্ত। প্রবন্ধ গুলির আমরা নামোল্লেখ করিব মাত্র। চতুর্থ সংখ্যার "স্বরজ্ঞান" নামক প্রবন্ধটী সকল নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর অধ্যয়ন করা উচিত। হিন্দু-সমাজনীতি-শীর্ষক সন্দর্ভ, লেখকের চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম গবেষণাশক্তির পরিচায়ক। বিদ্যুল্লতা উপন্যাসের প্রারম্ভ সুন্দর, কিন্তু বর্ণনাভাগ কিছু অধিক বিস্তৃত, সুতরাং পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ। পঞ্চম সংখ্যায় একটী কামিনী-রচিত পদ্য দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। রমণীর নিকট এতদপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষা করা যায় না। "গীতা" "পূর্ত্তকার্য্য," "বাঙ্গালীর অবনতি" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। "প্রকৃতি রহস্য" পদ্য পাঠ করিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি প্রেম (Love of Nature) মনে উদিত হইল।

ওয়ার্ডওয়ার্থস্ বিষয়ে ষ্ট্রাফোর্ড ব্রুক্ বলিয়াছেন,—

"Who loved nature, even with the love with which a man loves a woman."

এই কবিও, ঐরূপে নর-নারীকে তাদৃশ প্রীতিপূর্ণ ভাবে দেখেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রেম যাদৃশ প্রকৃতিকে দেখিয়াছে। তিনি যেন প্রকৃতি-প্রণয়ে সুখী হইয়াছেন। বঙ্গীয় কাব্য-কাননে এরূপ কবি-কোকিল অধিক নাই। ইহার উন্নতি বাঞ্ছনীয়। "ব্রহ্মচর্য্য" দর্শন ও শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলোচনা।

ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যার সংসঙ্গে অনেকগুলি প্রবন্ধ রহিয়াছে।

"চিন্তাশক্তি" শীর্ষক রচনার লেখক—বাহ্যদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি, পরস্পর সাপেক্ষত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, এবং বাহ্যদৃষ্টির শিথিলতা ও অতীক্ষ্ণতা চিন্তাশক্তি-বিহীনতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাষা সুললিত, কিন্তু প্রবন্ধে অনাবশ্যক ও অসংলগ্ন বিষয়েরও সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

'শিক্ষা-বিভ্রাট' নামক প্রবন্ধ-রচয়িতা বলিতেছেন, আধুনিক শিক্ষা, পদ্ধতি অধারাবাহিক, সুতরাং উহা যথার্থ শিক্ষা-পদ-বাচ্য হইবার উপযুক্ত নয়। এই শিক্ষা-বিশৃঙ্খলায় জাতীয় জীবনী-শক্তি হ্রাস পাইতেছে। লেখক এই শৃঙ্খল-শূন্যতার কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ম্লেচ্ছ সংঘর্ষণ" অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং বৈদেশিক শিক্ষা আমাদের অজ্ঞাতসারে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতেছে। শিশু, মাতার নিকটেই প্রথমে শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু আজ কালিকার জননীগণ পাশ্চাত্য-সভ্যতা-স্রোতে ভাসমানা। সুতরাং শিশুর সুশিক্ষা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

স্ত্রীশিক্ষাও ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সাংসারিক কার্য্য-কলাপ-শিক্ষা অসমাপ্ত; এমন অবস্থায় মোজাধারিণী ছত্রশোভিনী খৃষ্টান-বামা গুরুমা বালিকার শিক্ষাদায়িনী! সুতরাং বিষময় ফললাভ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

অবশেষে লেখক এই সমস্ত দোষ বাঙ্গালীর অনুকরণ-প্রিয়তা-জাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রবন্ধটী অপরিণত-লেখনী-প্রসূত বলিয়া বোধ হয়। বিষয়াংশে কোন নূতনত্ব নাই।

জ্বালামুখী কাঙ্গারা একটি ভ্রমণ-বিষয়ক প্রবন্ধ। ইহা সুখপাঠ্য এবং লেখকের প্রশংসার পরিচায়ক।

কোকিল-বিদায় পদ্যটী উল্লেখ-যোগ্য।

ভারতের পরাধীনতা-শীর্ষক প্রবন্ধে, অধীনতার কয়েকটী কারণ বর্ণিত হইয়াছে। (১ম) ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। ঐক্য ইহাদের মধ্যে অতি বিরল, (২য়) সমবেত-চেষ্টা-বিহীনতা,

পরাধীনতার অন্যতম কারণ। ভারতের রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল না। (৩য়) ভারতবর্ষ নানা-জাতির আবাস-স্থান। বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী জাতিগণের প্রচুরতা ইহার অধঃপতনের কারণ। লেখক আরও দুই একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—হিন্দুর বৈরাগ্য, প্রজা-শক্তির ও স্বদেশ-প্রিয়তার অভাব। হিন্দুর অদৃষ্টবাদ প্রভৃতি। লেখকের সহিত আমাদের মতভেদ হইলেও, কোন কোন স্থলে তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি যথেষ্ট রহিল।

হিন্দুরমণীর অস্তিত্বলোপ প্রবন্ধটী নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয়। ইহা ব্যঙ্গ-রসাত্মক। আধুনিক রমণীগণের সাংসারিক কার্য্যে বৈরাগ্য ও নিজ নিজ বেশ-ভূষাদির পারিপাটী-সাধনে মনোযোগিতাই এই ব্যঙ্গের লক্ষ্য। রচনা-প্রণালীতে বোধ হয়, লেখক পুরুষদিগকে এই সকল ব্যভিচারের কারণ মনে করিতেছেন। পুরাতন কথা।

"সংসার নাট্যশালা" একটী রূপক। নাট্যশালায় যেরূপ প্রত্যেক নট নটী স্ব স্ব অংশেরই অভিনয় করিয়া থাকে, সেইরূপ সংসারে সকলে আপন আপন কার্য্যে রত থাকুক। ব্রাহ্মণে দেবপূজাদিতে, ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধ ব্যবসায়ে, বৈশ্যে কৃষিকার্য্যে এবং শূদ্রে সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত হউক।

সামান্য হইলেও একটী কথা বলা উচিত। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—"বহরমপুর, গোরাবাজার হইতে শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।" "গোরাবাজার হইতে সম্পাদিত" কেমন করিয়া হইতে পারে? "হইতে" এই কথার স্থানে "নিবাসী" লিখিত হওয়া উচিত। অথবা "শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বহরমপুর গোরাবাজার হইতে তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত" ইহাই লিখিত হওয়া আবশ্যক। আর এক কথা। যিনি সম্পাদক, তিনিই প্রকাশক! ভাষার প্রতি "সৎসঙ্গের" দৃষ্টি না থাকিলে, উহার "অসৎসঙ্গ" মধ্যে পরিগণিত হওয়া বিচিত্র নয়। ইহা মাঝারি রকমের পত্রিকা। চেষ্টা থাকিলে কালে ইহার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে।

শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০১ সাল, পৌষ। { চতুর্থ সংখ্যা।

আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার কৌতুকাগার।

ইয়ুরোপ-খণ্ডেই আজকাল বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রাদি বিশেষরূপে আলোচিত হইয়া সমগ্র সভ্য-সমাজে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু ইয়ুরোপখণ্ডেই বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রসমূহের উৎপত্তি কিংবা অন্য কোন প্রদেশ হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে ইহার বিস্তার হইয়াছে, এ বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা ও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে, আসিয়াতেই বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রাদির উৎপত্তি। মিসরের রাজধানী আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নগরীতে সবিশেষ আলোচিত হইয়া উত্তরকালে সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ইহাদের প্রচার হয়। বিজ্ঞানাদির আলোচনার জন্য আলেক্‌জেন্দ্রিয়ায় একটি মিউজিয়ম্ বা কৌতুকাগার ছিল। এই মিউজিয়ম্ কখন এবং কাহা দ্বারা সংস্থাপিত হয় এবং কি প্রণালী অনুসারে ইহা পরিচালিত হইত, আজ সংক্ষেপে সেই বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পৃথিবী-জয়ী সেকন্দর শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনা-নায়কদিগের মধ্যে সমস্ত রাজ্য বিভক্ত হইলে, টলেমি সোটার (Btolemy Soter) নামক তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মিশরের অধিপতি হন। তিনি আর কোন নূতন নগরী স্থাপনা না করিয়া আলেক্‌জেন্দ্রায়াকেই নিজ রাজধানী করেন। সেকন্দর স্যাহের দিগ্বিজয়কালে টলেমি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্প ও জ্ঞান দেখিয়া তিনি মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন। নিজে

জ্ঞানার্জ্জনে এবং শিল্পশিক্ষায় অনুরক্ত হইয়া, যাহাতে সকল দেশের শিল্প ও জ্ঞান এক স্থলে আলোচিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচারিত হয়, টলেমি সেই সুযোগ অনুসন্ধানে যত্নবান্ হন। তিনি রাজা হইয়া সেই সুযোগ দেখিলেন, এবং নিজের কামনা পূর্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার এই সংকল্পের ফল—আলেক্জেন্দ্রিয়ার মিউজিয়ম।

খৃষ্টজন্মের ৩২০ তিন শত বিশ বৎসর পূর্ব্বে টলেমি স্বীয় প্রাসাদের সংলগ্ন ভূমিতে, শ্বেত প্রস্তর দ্বারা মিউজিয়ম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শেষ করিয়া যান নাই। তাঁহার পুত্র টলেমি ফিলাডেল্‌ফস্ (Ptolemy Philadelphas) কর্তৃক হর্ম্ম্যের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। মিউজিয়ম্ বাটীর চারি পার্শ্বে নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ আনিয়া রোপিত হয়। ঐ উদ্যানের চতুর্দ্দিকে চাঁদনী নির্ম্মিত হয়। পাঁচ সাত জন একত্র বসিয়া যাহাতে শিল্প ও জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্য চাঁদনীর নীচে অনেক গুলি আসন ছিল। মিউজিয়ম্-হর্ম্ম্যের প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ। ১ম পুস্তকালয় ২য় শিল্পালয়। এই পুস্তকালয়ে প্রায় ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ হস্তলিপি সংগৃহীত হয়। স্থানের সংকুলান না হওয়ায় অবশিষ্ট ৩,০০,০০০ তিন লক্ষ হস্তলিপি সেরাপিয়াসের মন্দিরে রক্ষিত হয়। সুতরাং ঐ ফিনাডেল-ফিয়ীয় পুস্তকালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭,০০,০০০ সাত লক্ষ হস্তলিপির সংগ্রহ হইয়াছিল। শিল্পালয়েও নানাদেশীয় নানাবিধ শিল্প সংগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং তৎকালে আলেক্জেন্দ্রিয়া যে কেবল মিশর রাজ্যের রাজধানী বলিয়া গণ্য ছিল, তাহা নয়; কিন্তু সমস্ত সভ্য দেশের জ্ঞানচর্চ্চার একমাত্র প্রধাননগরী ছিল বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। মিউজিয়ম্ পরিদর্শন করিতে বা তথায় অধ্যয়ন করিতে, আলেক্জেন্দ্রিয়ায় নানা দেশ বিদেশ হইতে অনেকানেক সাধু এবং বিদ্বানের সমাগম হইত। বস্তুতঃ মিউজিয়মের জন্য আলেক্জেন্দ্রিয়ার জ্ঞানিসমাজ এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, অনেক য়িহুদীও স্বদেশ ছাড়িয়া এখানে বাস করিতে আসিতেন এবং স্বজাতি-ভাষার পরিবর্ত্তে গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

মিউজিয়ম্ স্থাপনার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময়ে পৃথিবীতে জ্ঞান এবং শিল্পের যত টুকু আবিষ্কার হইয়াছিল, তাহা যাহাতে বিলুপ্ত না হইয়া

চিরস্থায়ী হয়, তাহাই মিউজিয়মের প্রথম উদ্দেশ্য। সেই জ্ঞান এবং শিল্প, যাহাতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়া বর্দ্ধিত ও উন্নীত হয়, ইহাই মিউজিয়মের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আর, মানবমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদের বহুল প্রচার এবং বিস্তার, মিউজিয়মের তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল। এখন দেখা যাউক, এই তিনটি উদ্দেশ্য-সাধনার নিমিত্ত টলেমি ও তাঁহার পুত্র ফিলাডেল্‌ফাসকে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। আমরা এই বিষয়ে পর পর আলোচনা করিব।

১। প্রথমেই বলা হইয়াছে, মিউজিয়মে একটি পুস্তকালয় ছিল। এই পুস্তকালয়ের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত, কয়েক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারীর উপর গ্রন্থ সংগ্রহের ভার ছিল। যে কোন গ্রন্থ হউক্ না কেন, রাজকোষের অর্থ দিয়া তাহা ক্রয় করিতে হইবেই হইবে। যে সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তা বা গ্রন্থের অধিকারী, স্ব স্ব গ্রন্থ বিক্রয় করিতে সম্মত হইতেন না, সেই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি লইবার জন্য কতকগুলি নকলনবিশ নিযুক্ত থাকিত। কোন বিদেশীয় ব্যক্তি, কোন নূতন গ্রন্থ লইয়া মিসরদেশে আসিলে, সেই গ্রন্থ খানি নকল করিয়া, প্রতিলিপি খানি ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হইত এবং মূল গ্রন্থখানি পুস্তকালয়ে সংরক্ষিত হইত। গ্রন্থ ক্রয় করিতে সময়ে সময়ে অনেক অর্থও ব্যয় করিতে হইত। প্রবাদ আছে, রাজা টলেমি এমারগেটেস্ এথেন্স হইতে ইউরিপিডিস্ (Euripides) স'ফোক্লেস (Sophocles) এবং এস্‌চিলস্ (Æschylus) প্রভৃতি গ্রন্থকারের গ্রন্থ আনাইয়া, সেই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারীদিগকে প্রতিলিপি এবং প্রত্যেককে ১৫০০০ ডলার (৩১,২৫০) একত্রিশ হাজার দু শ পঞ্চাশ টাকা দিতে হইয়াছিল। অন্য ভাষা হইতে অনেকানেক গ্রন্থ, গ্রীক্ ভাষায় অনুবাদ করিতে হইত। পুস্তকালয়ে ব্যবহারার্থে বাইবেলের অনুবাদ করাইতে ফিলাডেল্‌ফাসেরও অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। শিল্পালয়েও যথাসাধ্য শিল্প সংগ্রহ হইত। ক্যাম্‌বাইসেস্ (Cambyses) প্রভৃতি মিসর দেশ হইতে যে সমস্ত স্তম্ভ লইয়া গিয়াছিল, টলেমি এনারগেটস্ সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, একচারস এবং সুসা হইতে ঐ সমস্ত স্তম্ভ গুলি আনয়ন করেন। উহাদিগকে যথোপযুক্ত স্থানে সংস্থাপন পূর্ব্বক শিল্পালয়ের শোভা সংবর্দ্ধন করেন।

২। যাহাতে শিক্ষার্থীরা মিউজিয়ম্ গৃহে নিরত থাকিয়া শিক্ষায় কাল কাটাইতে পারেন, তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে অর্থ দেওয়া হইত। সময়ে সময়ে রাজা স্বয়ং তাঁহাদের সহিত আহার বিহার করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এই সুবিধা বিধায় অনেকে শিক্ষার্থে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেন। সাধারণতঃ মিউজিয়মে, সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ্ এবং চিকিৎসা এই চারি প্রকার শাস্ত্রের আলোচনা হইত। অন্যান্য শাস্ত্র এই চারিটির মধ্যে কোন একটির শাখা বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজ্যের এক জন খ্যাতনামা প্রধান কর্ম্মচারীর উপর মিউজিয়মের সমগ্র ভার ন্যস্ত থাকিত। এথেন্সের শাসন-কর্ত্তা সুবিদ্বান্ ডেমিটিয়স্ ফেলোরেষস (Demetius Phelerous) সর্ব্বপ্রথমে এই পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার সময়েই ইরাষ্টস্থিনিস (Eratosthenes) এবং আপোলনিয়স (Appolonius) প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিগণ পুস্তকালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন।

যাহাতে পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, মিউজিয়মে তাহারও সুবন্দোবস্ত ছিল। উদ্ভিদ্বিদ্যার আলোচনার জন্য নানা দেশ হইতে নানাবিধ বৃক্ষ ও লতা সংগ্রহ করিয়া একটি উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণের নিমিত্ত বিবিধ পশু-পক্ষীর সমাবেশ করা হইয়াছিল। জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের অনুশীলনার্থে, একটি গৃহে অনেকগুলি যন্ত্র সংগৃহীত ছিল। রাসায়নিক প্রক্রিয়াদির পরীক্ষার কারণেও একটি স্বতন্ত্র কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল। শরীর-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার উন্নতি-কল্পে আর একটি গৃহে মৃত মানব দেহ ব্যবচ্ছিন্ন হইত। সময়ে সময়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত জীবিত মনুষ্যও ঐ গৃহে নিহত হইত।

৩। বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং আলোচনাদি দ্বারা জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তৃত হইত। ভিন্ন ভিন্ন দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ এখানে আসিয়া অত্রত্য আলোচনায় মিলিত হইতেন। কিংবদন্তী আছে, এক সময়ে এই আলোচনায় প্রায় ১৪০০০ চতুর্দ্দশ সহস্র শিক্ষার্থীর সমাবেশ হইয়াছিল। ক্লেমেন্স্ আলেক্জন্দ্রি (Clemens Alezandri), ওরিজেন্ (Origen), এথানেসিয়স্ (Athanasius) প্রভৃতি বিখ্যাত খৃষ্টানগণ, এই আলেক্জেন্দ্রিয়ার মিউ-

বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠাতা টলেমি সোটার নিজে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত "আলেক্‌জাণ্ডর-কৃত যুদ্ধাদির ইতিহাস (History of the campaigns of Alexander)" একখানি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ গ্রন্থখানি ভিন্ন তাঁহার আর সমস্ত গ্রন্থই বিলুপ্ত হইয়াছে। বিখ্যাত ইউক্লিড, ইরটস্থিনেস্, এপোলোনিয়স্, এরিস্‌টাইথেস্, টিমোকরিস্, হিপারর্কাস্, টিসিবস্, সোসিজিয়স্ প্রভৃতি মনীষিগণকে আমরা আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার মিউজিয়ম্ হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি। যত দিন না ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞা অসিদ্ধ প্রমাণিত হয়; ইরাটসথেনিসের আবিষ্কৃত পৃথিবীর গোলত্ব যত দিন না, অস্বীকৃত হয়; আলেক্‌জেন্দ্রিয়া সিরাফিউসে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রগুলি যত দিন না অপ্রচলিত এবং বিধ্বস্ত হয়, তত দিন আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার মিউজিয়মের নাম সভ্য ভূভাগ হইতে বিলুপ্ত হইবে না। যত দিন পর্য্যন্ত হিপার্কাস, এপোলোনিয়স্, টলেমি, আর্কিমিডিস্ প্রভৃতির নাম, সমাদর-সহকারে উল্লিখিত হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত মিউজিয়মের গৌরব অক্ষুণ থাকিবে।

এত অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া, অশেষ যত্ন করিয়া টলেমি প্রভৃতি রাজগণ যে মিউজিয়ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মিসর-বিজয়কালে জুলিয়স্ সিজর কর্ত্তৃক তাহা দগ্ধীভূত হয়। তাহাতে পুস্তকালয়ের অর্দ্ধাধিক পুস্তক বিনষ্ট হয়। মিসরের শেষ রাণী ক্লিওপেট্রার অনুরোধে, রোমীয় বীর মার্ক এণ্টনি, পার্গামাসের রাজা ইউমিনিস্ (Eumenes) কর্ত্তৃক সংগৃহীত পুস্তকগুলি আনিয়া, মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে সন্নিবেশিত করেন। তার পর রোমীয় সম্রাট্ (Theodosius) থিওডোসিয়াস্-সময়ে পুস্তকালয়ের বিশেষ ক্ষতি হয়। আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার বিশপ থিওফিলাস্ এক দিন ভূগর্ভ-নিহিত কতকগুলি দেবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ পৌত্তলিকগণ সিরাপিয়াসের মন্দির আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করিতে থাকে। অবশেষে রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপনার্থ সম্রাট থিওডোসিয়াসের আজ্ঞাক্রমে থিওফিলাস কর্ত্তৃক সিরাপিয়াসের মন্দিরের পুস্তকালয় বিনষ্ট হয়। এত ক্ষতি সত্ত্বেও মিউজিয়ম হর্ম্ম্যের যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ ছিল এবং পুস্তকালয়ে যতগুলি অবশিষ্ট পুস্তক ছিল, মুসলমানদের

দ্বারা তাহা একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। মুসলমান সেনাপতি অমরো (Amrow) আলেক্‌জেণ্ড্রিয়া অধিকার করিলে, জন্ ফিলোপোনাস্ নামক এক জন গ্রীক্ বিদ্বানের সহিত তাঁহার সখিতা জন্মে। জন্, অমরোর নিকট পুস্তকালয়ের অবশিষ্ট পুস্তকগুলি প্রার্থনা করেন। অমরো, এ বিষয়ে খলিফের অনুমতি জিজ্ঞাসা করায়, খালিফ বলেন যে—

If the books agree with the Koran, the word of God, they are useless, and need not be preserved; if they disagree with it, they are pernicious. Let them be destroyed.

অর্থাৎ, যদি ঐ পুস্তক গুলির কোরাণের সহিত ঐক্য থাকে, তবে উহাদের অস্তিত্বের আর আবশ্যক নাই; আর যদি তাহা না হয়, তবে ওগুলি ধর্ম্মের বিরুদ্ধ, সুতরাং ওগুলির বিনাশই যুক্তিসিদ্ধ।

খালিফের আজ্ঞাক্রমে পুস্তকালয়টি একেবারেই নষ্ট করা হয়।

শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত।

ভদ্রেশ্বর হইতে ত্রিবেণী।

বৈদ্যবাটীর পর ভদ্রেশ্বর ষ্টেসন। ভদ্রেশ্বরে ভদ্রেশ্বর নামক শিব আছেন। চৈত্র মাসে ইহাঁর মস্তকে এক লক্ষ বিল্বপত্র দিলে যাহা মনন করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয়। (১) ভদ্রেশ্বর ছাড়াইয়া ট্রেন চন্দননগরে আসিয়া উপস্থিত হয়। স্থানটী হাবড়া হইতে এগার ক্রোশ। ইহা গঙ্গার ধারে প্রায় ক্রোশ-পরিমিত বিস্তৃত। ইহা ফরাসীদিগের অধিকৃত। গঙ্গা হইতে চন্দননগরের দৃশ্য বড় মনোহর। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গেব এই স্থানটী, ফরাসীদিগকে প্রদান করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল ওয়াটসন সাহেব এখানকার দুর্গ ও নগর অধিকার করেন। পরে সন্ধি হইলে নগর ও দুর্গ ফরাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টীয় অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ

(১) ভদ্রেশ্বর ব্যবসায়ের উপযুক্ত স্থান।—সম্পাদক।

হইলে পুনরায় ইংরাজেরা এই স্থান দখল করেন। ১৮০২ অব্দে পুনঃ প্রত্যর্পিত হয়। ইংরাজি ১৮১৬ সালের সন্ধিতে যে দান করা হয়, সেই শেষ দান। ১৭২৬ খৃষ্টীয় শাকে ইটালী দেশীয় মিশনরিগণ গঙ্গার তীরে একটী মনোহর গির্জা নির্ম্মাণ করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী গবর্ণর ডিউপ্লের সময় চন্দননগরে প্রায় ৪০০০।৫০০০ চারি পাঁচ হাজার অট্টালিকা ছিল। ঐ সময় কলিকাতায় কেবল খোলার ঘর দৃষ্ট হইত। পূর্ব্বে ঋণগ্রস্ত এবং চোর ডাকাইত প্রভৃতি দুষ্ট লোকেরা পালাইয়া আসিয়া চন্দননগরে লুকাইয়া থাকিত। চন্দননগর (২) পরিত্যাগ করিয়া ট্রেন হুগলি ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হয়।

হুগলিকে পর্টুগীজেরা গোলি কহিত (৩)। হুগলি কলিকাতা হইতে ১২॥০ সাড়ে বার ক্রোশ। মুসলমানদিগের সময় হুগলি বাঙ্গালার মধ্যে একটী বিখ্যাত বন্দর ছিল। এখানে ইংরেজী ১৬২৫ সালে ওলন্দাজেরা একটী কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ক্রমে দিনামার, পর্টুগীজ, ফরাসীরা এখানকার অধিবাসী হন। ১৬৪০ সালে ইংরাজেরা এই স্থানে বাণিজ্য করিতে আসেন। কলিকাতা-সংস্থাপক জব চার্ণক সাহেব এই স্থানে অবস্থিতি করিতেন। তিনি একদল ওলন্দাজ সৈন্যকে হুগলি রক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত মুসলমানদিগের এখানে একটী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় ইংরাজেরা কামানের সাহায্যে নগরটী ধ্বংস করেন। তাহাতে প্রায় নগরের ৫০০০, পাঁচ হাজার অট্টালিকা ও ইংরাজদিগের ৩০,০,০,০০০ ত্রিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। পর্টুগীজেরা বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য করিতে আসে এবং সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক তাড়িত হয়।

ইংরাজি ১৭৪২ সালে মহারাষ্ট্রীয়েরা এই নগর উৎসন্ন করে। পুনরায় আবার ইহা বেশ সমৃদ্ধিশালী নগর হয়; কিন্তু ১৭৫৬ সালে ইংরাজ কাপ্তেন সার আয়ার কুট সাহেব কর্ত্তৃক পুনরায় ইহা বিধ্বস্ত হয়। হুগলীর ইমাম

(২) ইহার নামান্তর ফরাসডাঙ্গা। ফরাসিদের অধিকারস্থ বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে। চন্দননগর দ্বিধা বিভক্ত। যথা—ব্রিটিস চন্দননগর ও ফ্রেঞ্চ চন্দননগর।—সম্পাদক।

(৩) মতান্তরে হোগেল নামক এক পর্টুগীজ এখানে থাকিতেন। তাঁহার নামানুসারে হুগলী নাম হইয়াছে।—সং।

বাড়ী বিখ্যাত ও দেখিবার যোগ্য। ইহা মাতোয়ালীদিগের তত্ত্বাবধানে আছে। ইমামবাড়ীর সংলগ্ন সরাই আছে। তথায় মুসলমান ভ্রমণকারীরা বাস করিয়া থাকে। ইমামবাড়ীর মসজিদের উপর একটী প্রকাণ্ড অথচ মনোরম ঘড়ী আছে। তাহার শব্দ বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। বাটীর উঠানে একটী বৃহৎ সরোবর ও তাহার মধ্যস্থলে একটী সুন্দর ফোয়ারা রহিয়াছে। ইমামবাড়ী মহম্মদ মসীনের প্রতিষ্ঠিত। ইনি মৃত্যুকালে যাবতীয় সম্পত্তি ইমামবাড়ীর খরচের জন্য দান করিয়া যান।

১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে পর্টুগীজেরা হুগলিতে একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। উহা বর্ত্তমান কালেকটারির নিকটে ছিল। ইংরেজি ১৬৩২ সালে সম্রাট সাজেহান কর্ত্তৃক দুর্গটী উৎসাদিত হয় এবং পাঁচ হাজার পর্টুগীজ কারারুদ্ধ হয়। এখন হইতে পর্টুগীজের বাঙ্গালায় ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। গঙ্গাতীরে বেণ্ডাল চার্চ্চ নামক একটী সুন্দর রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা আছে। বঙ্গদেশে খৃষ্টান চর্চ্চের মধ্যে এইটী সর্ব্বপ্রথম। এ গির্জ্জার চূড়া বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। চার্চ্চটী পর্টুগীজের দ্বারা নির্ম্মিত। উহার সন্নিকটে একটী দুর্গ ছিল। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে চর্চ্চে খৃষ্টানেরা বাস করিত। তথায় বোর্ডিঙ্ স্কুল ও জেসুইট কলেজ ছিল। ১৬৩২ সালে সম্রাটের সৈন্যেরা হুগলি আক্রমণ করিয়া চার্চ্চটী ধ্বংস করে এবং ঐ সনেই সম্রাটের আদেশে উহার মেরামত হয়।

পূর্ব্ব-বঙ্গের রেলযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য গঙ্গার উপর একটী সুন্দর সেতু নির্ম্মিত হওয়া ট্রেনারোহীদিগকে লইয়া যাতায়াত করিতেছে এবং হুগলি ষ্টেসনে নৈহাটী জংসন নামক আর একটী ষ্টেসন হইয়াছে। পোলটী লেসলি সাহেব নামক রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক বহু অর্থ ব্যয়ে এমন কৌশলে প্রস্তুত হইয়াছে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

হুগলির প্রায় ক্রোশৈক দূরে ওলন্দাজাধিকৃত চুঁচুড়া ছিল। তাহারা ২০০ দুই বৎসর ভোগের পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সুমাত্রার সঙ্গে উহার বিনিময় করিয়াছে; সুমাত্রা লইয়া ইংরাজদিগকে উহা দিয়াছে। ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় একটী দুর্গ ও একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। গির্জ্জার কিছু দক্ষিণে হুগলি কলেজ। ৬০ ষাট বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ মোনাসিঁওর

প্যারান কর্তৃক এই কলেজ স্থাপিত হয়। হুগলি কালেজে ৬০০।৭০০ ছয় সাত শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। ইহাতে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিবার দুইটী বিভাগ আছে। এই স্থানে ইংরাজদিগের একটী প্রকাণ্ড বারিক ছিল। তাহাতে বিস্তর সৈন্য থাকিত। তথায় বাঙ্গালা নর্ম্মাল স্কুল চলিতেছে। বারিকের সন্নিকটে ওলন্দাজদিগের বাগান ও দুর্গ ছিল। এই স্থানের কিছু উত্তরে একটী আর্ম্মেনিয়ান গির্জ্জা আছে। গির্জ্জাটী ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ট্রেন হুগলি পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশবিঘা ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া মগরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। মগরা কলিকাতা হইতে ১৫ পঞ্চদশ ক্রোশ। মগরার বালী বড় বিখ্যাত। ইহা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। মগরার পৌনে এক ক্রোশ পূর্ব্বে ভাগীরথী-তীরে ত্রিবেণীর বিখ্যাত বাঁধা ঘাট। বহু দূরদেশ হইতে লোকে মৃত দেহ লইয়া আসিয়া পবিত্র ত্রিবেণীতে সৎকার করিয়া যায়। ত্রিবেণী এক মহাতীর্থ। উহা এক সময় বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমা-স্বরূপ ছিল। এখানকার বাঁধা ঘাট উড়িষ্যার শেষ রাজা মুকুন্দদেবের প্রতিষ্ঠিত। ত্রিবেণীর অপর নাম মুক্ত-বেণী বা দক্ষিণ প্রয়োগ। প্রয়োগে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী যুক্ত এবং ত্রিবেণীতে আসিয়া তিনটী মুক্ত অর্থাৎ পৃথক্ হইয়াছে। পৌষ সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হয়। প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন ত্রিবেণী-নিবাসী।

পাগলিনীর প্রতিহিংসা।

(নরেন্দ্রনাথের কথা।)

—০:০:০—

চমকিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। বোধ হইল, যেন এইমাত্র বাড়ীতে কে ভয়ানক গোলমাল করিতেছিল। বোধ হইল, যেন সেই শব্দেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। ঘুম ভাঙিল—মনে হইল, আজ আমার এক মামাতো ভায়ের "আইবুড়ো ভাত" ৬।৽ সাড়ে ছয়টার সময় ট্রেনে কলি-কাতায় যাইতে হইবে। কিসের গোলমালে আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল,

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আবার বালিসের উপর মাথা রাখিলাম-পুনরায় নিদ্রা যাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম।

নিদ্রা তো আসিল না। কত কি কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। কি জ্বালায় পড়িলাম। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার কক্ষমধ্যে একলা শয়ন করিয়া ছিলাম. কত কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলাম—বিন্দুমাত্র আলোক দৃষ্টিগোচর হইল না। যে দিকে চাই, দেখি ঘোর অন্ধকার!

যদি সূর্য্যের আলোক আমার কক্ষ-মধ্যে পতিত হইত, তাহা হইলে আমার ভাবিবার কারণ ছিল বটে। যদি ঘুম ভাঙিতে বেলা হইত, তাহা হইলে ট্রেন ফেল হইবার আশঙ্কায় হয়তো আমার খুব তাড়াতাড়ি পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইত।

আমার এক খুড়তুতো ভায়ের ছয়টার সময় আমার কাছে আসিবার কথা ছিল। সেই কি আসিয়া আমার দরজায় ধাকা মারিতে ছিল? তাহাতেই কি আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে? আর কাহারও তো আসিবার কথা ছিল না। একজন চাকর ছাড়া এ উদ্যান বাটিতে আর কোনও লোকও তো নাই।

অনেক ক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা ভাবিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। শয্যা হইতে উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলাম। ঘড়ীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম তিনটা বাজিয়াছে। বুঝিলাম, আমার খুড়তুতো ভাই গোবিন্দ নিশ্চয় আইসে নাই। এত রাত্রি থাকিতে আসিবে কেন? তাহার সঙ্গে তো ৬ ছয়টার সময় আসিবার কথা ধার্য্য আছে।

রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আমাদিগের গ্রাম প্রায় ২॥০ আড়াই ক্রোশ দূরে। রাস্তা ঘাট ভাল নাই—অতি কষ্টে গমনাগমন করিতে হয়। সম্প্রতি মাতামহের বাৎসরিক বিশহাজার টাকা আয়ের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া, আমি কিঞ্চিৎ বাবুও হইয়া পড়িয়াছি। এসেন্স, অটো ইত্যাদি গন্ধ দ্রব্যের আস্বাদও পাইয়াছি। সত্য কথা বলিতে কি, একটু চরিত্র দোষ জন্মিয়াছে। ইংরাজী পড়িয়াছি—দু'একটা পাশও করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুখানি চাপরাশ পাইয়া, তৃতীয় খানি পাইবার আশায় কলেজে পাঠ করিতে

ছিলাম, এমন সময় মাতামহের মৃত্যু হওয়াতে, তাঁহার অতুল বিষয় সম্পত্তি আমার হাতে পড়িল। আমি বিদ্যালয় ছাড়িয়া জমীদারি দেখিতে লাগিলাম। বিদ্যালয় ও কলিকাতার অন্যান্য স্থানের পরিচিত যে কয়জন বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তখন আমার মোসাহেব রূপে পরিণত হইলেন। আমি বেশ সুখে সচ্ছন্দে দিন কাটাইতে লাগিলাম। মাতামহ নিজ বাটীতে বসিয়াই জমীদারির কার্য্য পরিচালন করিতেন, আমার তাহা ভাল লাগিল না। তাহা হইলে আরও গণ্ডগ্রামে গিয়া বাস করিতে হয়। মাতামহের বাটী আমাদিগের গ্রাম হইতে আরও তিন ক্রোশ দূরে।

ষ্টেশনের ধারে মাতামহের একখানি ছোট খাট বাগান বাটী ছিল। কিন্তু তিনি এত দূর অর্থপ্রিয় ছিলেন যে, সে সামান্য জমীটুকুও প্রজাবিলি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমি বিষয় প্রাপ্ত হইয়াই. সে স্থান হইতে সে প্রজাকে, তাহার ঘর বাড়ীর মূল্য দিয়া উঠাইয়া দিই। উদ্যানটীর উত্তম রূপে সংস্কার করা হইল ও উদ্যান মধ্যস্থিত ভগ্ন দ্বিতল বাটীখানি নূতন করিয়া মেরামত করাই। ইহাতে যদিও আমার বেশ খরচ হইয়া যায়, তথাপি তাহা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় করিয়াছিলাম। এই উদ্যান বাটীর সম্মুখেই রাস্তা। রাস্তার পরপারে আমার জমীদারীর কাছারী। মুহুরী কারকুন. পাইক, গোমস্তা. ও দাওয়ান এই সব কর্ম্মচারী তথায় থাকেন। প্রতিদিন কাছারী বাটীতে বেলা দশটার পর আমি দুই তিন ঘণ্টা করিয়া বসি ও বিষয় কর্ম্মাদি পরিদর্শন করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি. মাতামহের বিষয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া আমার একটু চরিত্র দোষ জন্মিয়াছিল। সেই কারণেই বৃদ্ধা মাতাকে নিজ বাটীতে রাখিয়া, ষ্টেশনের ধারে এই উদ্যান বাটীতে আমি বসবাস করিতেছিলাম। প্রতি শনিবার বাটী যাইতাম। বৃদ্ধা মাতা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতেন।

গ্রামের চাষাভুষো বা গরীব লোকের সুন্দরী কন্যা বা পুত্রবধূ বয়প্রাপ্তা হইলে আমার তোষামোদকারীরা আমার জন্য কৌশলে তাহাদিগকে হস্তগত করিত। দু'দশ দিন তাহাকে লইয়া পারিষদবর্গের সহিত গোপন বিহার করিয়া আর একটী নূতন পাখী জালে পড়িলেই তাহাকে পরিত্যাগ

করিতাম। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এ সকল কার্য্য এত গোপনে সমাধা করিতে জানিতাম, যে আমার আমলাবর্গ পর্য্যন্ত, সম্মুখস্থ বাটীতে থাকিয়াও, আমার এ ব্যভিচারের কথা জানিতে পারিত না।

আমার নাম নরেন্দ্রনাথ। আমি অবিবাহিত। সুরাপান দোষও আমার একটু একটু ঘটিয়াছিল। কিন্তু বিলাতি "ডোসে" মাত্রায় পান করিলে কোন ক্ষতি হয় না, এই ধারণা ছিল বলিয়া, এবং অতি অল্প মাত্রায় সুরাপান করিতাম বলিয়া, কখন বাড়াবাড়ি কিছু হইত না। পারিষদবর্গের মধ্যেও কাহাকে বাড়াবাড়ি করিতে দিতাম না। এ সকল কার্য্যে আমাদিগের এক জন "বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী" ও রামা চাকর সহায় ছিল। উভয়ে আমার নিকট ২৫ পঁচিশ টাকা করিয়া বেতন পাইত। সুতরাং তাহাদের দ্বারা আমাদের কুকীর্ত্তি প্রকাশিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমার আমলাবর্গ সকলেই জানিতেন, বাবু কিছু একেলা থাকিতে ভাল বাসেন।

যে দিনের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার পূর্ব্ব দিন রজনিযোগে আমরা একটু কম আমোদ করিয়াছিলাম। একজন পুরাতন প্রণয়িনীকে বিদায় দিয়া, নূতনের চেষ্টায় চেষ্টিত ছিলাম, কিন্তু সে বিষয়ে বিফল-প্রযত্ন হওয়াতে, একটু অধিক মাত্রায় মদিরা সেবন করিয়া পারিষদবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর, আমার সুসজ্জিত কক্ষে, দুগ্ধফেননিভ শয্যায়, অজ্ঞান অচৈতন্যভাবে নিদ্রাগত হইয়াছিলাম। তার পরেই নিদ্রায়, নেশার ঘোর কাটিয়া যাওয়ার পর, রাত্রি তিনটার সময় সহসা কিসের গোলমালে আমার ঘুম ভাঙিয়া যায় বলিতে পারি না।

উদ্যান বাটীতে দ্বিতল কক্ষে প্রতি রজনীতেই আমি একেলা শয়ন করিতাম। সে দিনও তাহাই হইয়াছিল। রামা-চাকর উদ্যান বাটীর কিছুদূরে উদ্যানের প্রান্ত ভাগে, একটী খোড়ো বাঙলায় থাকিত। সুতরাং বাটীতে সামান্য একটী ছোট খাট গোলমাল হইলে, তাহার জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

কত কথা মনে হইতে লাগিল। নিদ্রা কিছুতেই হইলনা। অনেক রাত্রি আছে দেখিয়া আলোর তেজ কিছু কমাইয়া দিলাম। পুনরায় শয্যায় শয়ন করিলাম।

সহসা আবার কিসের শব্দ আমার কর্ণগোচর হইল। যেন কে বিকটস্বরে হাস্য করিতেছে। আবার শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম। কক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরের দিকে দেখিলাম, কেহই নাই—চারিদিক অন্ধকার!! ইংরাজী-লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া "ভূত প্রেত" যদি মানিতাম না-কিন্তু হইলে কি হয়, বাঙ্গালীর প্রাণে কেমন একটা আতঙ্কের উদয় হইল। তাড়াতাড়ি আসিয়া পুনরায় শয্যায় শয়ন করিলাম। ভ্রমবশতঃ এবার গৃহের কক্ষে খিল আঁটিয়া দিতে ভুলিয়া গেলাম।

আবার সেই শব্দ—আবার সেই হিঃ—হিঃ—হিঃ—বিকট-হাসি!! মনে বড় ভয় হইতে লাগিল। ভাবিলাম রামাকে ডাকি। কিন্তু পাছে সে বাবুকে ভীরু বা কাপুরুষ মনে করে, এই ভয়ে ডাকিতে পারিলাম না।

এবার স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, কে যেন নিম্নতল হইতে উপরে উঠিতেছে। ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কপালে ঘর্ম্ম বাহির হইল। বক্ষঃস্থল গুর্ গুর্ করিতে লাগিল।

সহসা আমার কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। দেখিলাম, একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক উলঙ্গ অবস্থায়, ধীরে ধীরে আমার কক্ষে প্রবিষ্ট হইতেছে। তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি শাণিত ছুরিকা ঝক্ মক্ করিতেছে। উঃ—কি ভয়ানক! দেখিয়াই আমার আত্মা যেন উড়িয়া গেল। আমি পালাইব মনে করিলাম, নড়িতে পারিলাম না। মাথা তুলিতে সমর্থ হইলাম না, শয্যার সঙ্গে যেন আমার দেহযষ্টি দৃঢ়-রূপে আবদ্ধ হইয়া গেল।

সেই উলঙ্গিনী স্ত্রী-মূর্ত্তি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ভীষণ রক্তবর্ণ চক্ষে আমার শয্যার দিকে চাহিল। আমি ও তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম।

সে কিয়ৎক্ষণ, শয্যার উপরে নিপতিত, আমার দেহের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া, সহসা ফুঁ দিয়া প্রদীপ নিবাইয়া দিল সমস্ত ঘর আবার ভয়ানক অন্ধকারে পরিণত হইল।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবে অন্ধকারে থাকিলাম। উলাঙ্গিনী রমণী নড়িল না—কোন কথা কহিল না।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আবার সেই অট্টহাসি—হিঃ—হিঃ—

হিঃ—রবে উত্থিত হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না. ভয়ে মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। আমার বোধ হইল, যেন রমণী সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া আমার শয্যার নিকটে আসিতেছে।

এত ক্ষণে রমণী কথা কহিল। দন্ত কিড়িমিড়ির সহিত চিবান চিবান কথায় কুপিত স্বরে কহিতে লাগিল—"নিদ্রা যাও—নিদ্রা যাও! পাপী, মহাপাপী, ব্যভিচারী, আজ জন্মের মত নিদ্রা যাও! অবলার একমাত্র সতীত্ব-ধনই কৌশলে কাড়িয়া লইয়া, যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিস্, আজ তার প্রতিফল দিতে আমি এখানে আসিয়াছি। পাপিষ্ঠ! তুই জীবিত থাকিলে অনেক কুলকামিনীর সর্ব্বনাশ করিবি তোর মৃত্যুই শ্রেয়!!"

এখন আমি বুঝিলাম। এই রমণীর সতীত্ব নাশ করিতে আমাদিগকে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছিল। রাজরাণীর ন্যায় হীরক, মুক্তা, মাণিক্যে সে পরিশোভিত হইবে, এরূপ আশা আমার নিকট পাইয়াছিল; তাই সে বিষম লোভে পড়িয়া অমূল্য ধন সতীত্ব রত্ন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। তার পর তাহাকে আমরা বিতাড়িত করিয়া দিলে, সে উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছিল। তাহার পিতা মাতা "কলঙ্কিনী" বলিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দেয় নাই। তাহার স্বামী তাহাকে "ব্যভিচারিণী" বলিয়া পদাঘাতে বিদায় করিয়াছিল। তাই অভাগিনী, আত্মহারা হইয়া উন্মাদিনী হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে প্রতিহিংসা ভোলে নাই; পাগলিনী হইয়াও আমায় হত্যা করিবার জন্য প্রতি-রজনীতে আমার সন্ধান করিয়াছে। আজ আমার কক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত পাইয়া প্রতিহিংসা-তৃষা পরিতৃপ্ত করিতে, তীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে প্রবেশ করিয়াছে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পূর্ব্বের সকল কথা আমার মনে হইল। দেহে বল পাইলাম, প্রত্যুৎপন্ন-মতি আসিয়া জুটিল। অতি ধীরে ধীরে শয্যার অপরপার্শ্বদেশ দিয়া নামিয়া পড়িলাম। কোন শব্দ হইল না। উলঙ্গিনী রমণী জানিতে পারিল না।

রমণী আবার কথা কহিল। স্বরের অদূরতায় অনুমান করিলাম, সে শয্যার পার্শ্বদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। রমণী বলিল—"মহাপাপী! নারকী!! যা' নরক ভোগ কর্‌গে যা—এ দেহ-ভার আর তোকে বহন

কর্‌তে হবে না—আর সতীর সর্ব্বস্বধন সতীত্ব নাশ কর্‌বার জন্য তোকে কৌশল জাল বিস্তার কর্‌তে হ'বে না—

উলঙ্গিনী রমণীর হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা, শয্যার গদীর উপর আমূল বিদ্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"অঁা—নেই—পালিয়েছে—পালিয়েছে—কি হ'বে? কি হ'বে? খুন কর্‌তে পার্‌লেম না—খুন কর্‌তে পারলেম না—মহাপাপী জীবিত রইল?"

আর স্বর বাহির হইল না। উলাঙ্গিনী রমণী বাত্যাহত কদলীবৎ সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আমি ত্বরিৎ-পদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, একেবারে রামার বাঙ্‌লায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। রামা খুব সাহসী। সে বলিল, "বাবু ভয় কি? মরে' গিয়ে থাকে, এই রাত্রিতে শ্মশানে মাটী চাপা দিয়ে আস্‌ব। বেঁচে থাকে, জ্ঞান হ'লেই, রাতারাতি ভুলিয়ে ভালিয়ে এ গ্রাম ছাড়া করে' দিয়ে আস্‌ব। আপনি কিছু ভাব্‌বেন না।"

রামা চলিয়া গেল। আমি তাহার পশ্চাদ্‌গামী হইলাম। উপরে আর উঠিলাম না। নীচে একটী গাছতলায় একখানি লৌহ-নির্ম্মিত বেঞ্চের উপর বসিয়া রহিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে দেখিলাম, রামা সেই উলঙ্গিনী রমণীকে আমারই একখানি কাপড় পরাইয়া নামাইয়া আনিতেছে। রমণী কোন বাধা দিতেছে না, বা চীৎকার করিতেছে না।

পরে শুনিলাম, রামা আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া, ঘরে আলো জ্বালিয়া, জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতে অভাগিনীর চৈতন্য হইয়াছিল। তাহাকে কাপড় দিলে, সে তাহা পরিয়াছিল। তার পর রামা তাহাকে দেশছাড়া করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল। রামা কি মন্ত্র জানিত।

[এই ঘটনার পর আমি ব্যভিচার ও সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। বৃদ্ধা মাতার অনুরোধে বিবাহ করিয়াছিলাম এবং গ্রামান্তরে, একটী

"কলঙ্কিনী মন্দির",

প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহার যাহার সতীত্বহরণ করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে সেই বাটীতে বাস করিতে দিয়াছিলাম। তাহাদের খাইবার পরিবার চিন্তা রাখি

নাই বটে, কিন্তু পাপের দিন সকল মনে করিয়া কত দিন নিভৃতে কত অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।]

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

প্রাতঃকৃত্য।

প্রভাতকালে সূর্য্যোদয়ে বায়ু বিশুদ্ধ হয়। যেমন কোন দূষিত পদার্থ, অগ্নি-সংযোগে দোষ পরিহার করে, তাহার কোন বৈগুণ্য থাকে না—তদ্রূপ রাত্রিকালের দূষিত বায়ু, প্রাভাতিক অরুণ কিরণ সংযোগে নির্ম্মল হয়। এই বিমল বায়ু-সেবনে জগতের সমস্ত জীব-জন্তু উৎফুল্ল হয় এবং সতেজ ভাব ধারণ করে। প্রভাত-কালে গাত্রোত্থান করিয়া যিনি এই নির্ম্মল জীবন-বৃদ্ধিকর উৎসাহপ্রদ বায়ু সেবন করিতে করিতে প্রাভাতিক ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার শরীর স্বাস্থ্যযুক্ত হয়। যাঁহারা অধিক বেলা পর্য্যন্ত শয্যা পরিত্যাগ করেন না, তাঁহাদের শরীরের জড়তা দূরীভূত হয় না; তাঁহাদের শরীর সর্ব্বদাই গ্লানিযুক্ত থাকে। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া মল-মূত্র ত্যাগ এবং হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালন, দন্তমার্জ্জন এবং মল-নির্গম-পথ সকল পরিষ্কার ও গাত্র মার্জ্জন করা বিধেয়। তাহাতে শারীরিক রক্ত-সঞ্চালনাদি ক্রিয়া সকল সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয়। গাত্র-মার্জ্জনে রোমকূপ সকল পরিষ্কৃত হওয়ায়, শরীর-বিশুদ্ধ বায়ু সংস্পর্শে সুস্থতা বা প্রফুল্লতা লাভ করে। অনেকের এরূপ অভ্যাস আছে যে, মল-বেগ উপস্থিত না হইলে তাঁহারা প্রাতঃকালে মলত্যাগ-স্থানে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন না। এই রূপ অভ্যাস, শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। তাহাতে উদরের গুরুতা দূরীভূত হয় না, শরীরও স্বচ্ছন্দ-ভাব ধারণ করে না। রাত্রিকালের ভুক্তদ্রব্য সকল পরিপাক হওয়ায় স্বভাবিক ক্রিয়ানুসারে প্রাতঃকালই, মল-মূত্র-ত্যাগের উপযুক্ত সময়। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে মল মূত্র পরিত্যাগ না করিলে, ক্রমে অনভ্যাস হইয়া উঠে। তাহাতে শরীর, ক্রমে অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতএব এই কু অভ্যাস পরিত্যাগ করা বিধেয়।

প্রাতঃকালীয় কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ যে সকল

উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে চলিলে স্বাস্থ্য রক্ষিত হইতে পারে। এ স্থলে তাদৃশ কতিপয় উপদেশ উদ্ধৃত হইল।

"ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ।
শরীর-চিন্তাং নির্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ॥"

স্বস্থ ব্যক্তি, ভুক্তদ্রব্য-সমূহের জীর্ণাজীর্ণ অবস্থা নিরূপণ করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা হইতে উত্থান করিবে। অসুস্থ ব্যক্তি বা অজীর্ণাদি-রোগগ্রস্ত লোক, ঐ সময়ে গাত্রোত্থান করিবে না। গাত্রোত্থানানন্তর মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া শৌচ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।

"সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥"

যাহার ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত এবং কফ সমান ভাবে অবস্থিতি করিতেছে; যাহার জঠরাগ্নি, মন্দ বা তীক্ষ্ণ হয় নাই, এবং রস-রক্তাদি সপ্ত-ধাতু, মল ও শারীরিক ক্রিয়া উপযুক্ত ভাবে বহিয়াছে, আর যাহার আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন প্রফুল্ল, তাহাকেই স্বস্থ বলে। এই লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিবে।

"আয়ুষ্যমুষসি প্রোক্তমলাদীনাং বিসর্জ্জনং।
তদন্ত্রকূজনাধ্মানোদর-গৌরব-বারণম্॥"

প্রভাতকালে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়। তাহাতে অন্ত্র-কূজন (পেটে গুড় গুড় শব্দ হওয়া), উদারাধ্মান (পেট ফাঁপা) এবং উদরের ভার বিনষ্ট হয়।

"আটোপশূলৌ পরিকর্ত্তিকা চ সঙ্গঃ পুরীষস্য তথোর্দ্ধবাতঃ।
পুরীষমাস্যাদথবা নিরেতি পুরীষবেগেঽভিহতে নরস্য॥"

উপস্থিত মলবেগ রোধ করিলে, অন্ত্রকূজন, পেটবেদনা, মলদ্বারে কর্ত্তন-বৎ বেদনা, মলরোধ, বায়ুর উর্দ্ধগমন হয়; এমন কি, মুখ দ্বারা পুরীষ-নির্গমও হইতে পারে।

মল-মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে, অনেকে উপস্থিত কার্য্যানুরোধে বা আলস্য-বশতঃ তাহা ধারণ করিয়া থাকেন। তাহাতে উল্লিখিত ভয়ঙ্কর ব্যাধি সকল ঘটিতে পারে।

"ন বেগান্ ধারয়েদ্ধীমান্ ন বেগান্ ঈরয়েদ্বলাৎ।
ন বেগতোঽন্যকার্য্যং স্যাৎ ... ...।

অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, কখনও মল-মূত্রের বেগ ধারণ করিবে না। মল-মূত্রাদির বেগ ধারণে যেরূপ দোষাবহ, সবলে বেগ প্রদানও তদ্রূপ দোষাবহ। তাহাতে অন্ত্র-বৃদ্ধি, মলদ্বার বাহির হইয়া আসা এবং প্রস্রাবের পীড়া জন্মিতে পারে।

"মলায়নেষভীক্ষ্ণং পাদয়োশ্চ বৈমল্যমদধ্যাৎ"।

মল-মূত্রত্যাগান্তে মল-নির্গম-পথ সকল অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত করিবে। পাদদ্বয়েরও বিমলতা সম্পাদন করিবে। দিবসের মধ্যে যে কেবল প্রাতঃকালেই মলায়ন সকল ধৌত করিবে, তাহা নয়; কিন্তু সায়ংকালেও উহা অবশ্য কর্ত্তব্য। দিবসের মধ্যে অন্যান্য সময়েও প্রয়োজন মতে ধৌত করা বিধেয়।

—"কষায়েণ তথৈবামলকস্য চ।
প্রক্ষালয়েন্মুখং নেত্রে স্বস্থঃ শীতোদকেন বা॥"

স্বস্থ ব্যক্তি, আমলকী ফল, কষায় অথবা শীতল বারি দ্বারা মুখ ও নেত্র প্রক্ষালন করিবে। তাহাতে মুখে ব্রণ, ব্যঙ্গ (মেঁচেতা) ইত্যাদি জন্মিতে পারে না।

মুখ ধৌত করিবার কালে দন্ত মার্জ্জন করা বিধেয়। দন্ত সকল যাহাতে দৃঢ়, সুরক্ষিত এবং দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা আবশ্যক। দন্ত থাকিতে থাকিতে তাহার অভাব-ক্লেশ অনুভব করা যায় না। কিন্তু অভাব হইলে, তাহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূত হয়। দন্তাভাবে মুখ-মণ্ডলের চর্ম্ম কুঞ্চিত হওয়ায়, উহা বিশ্রী দেখায়। কথা সুস্পষ্ট উচ্চারিত হয় না। অনেক আহারীয় দ্রব্য হইতে চিরজীবনে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়। ভোজনেচ্ছা সত্ত্বেও ভোজন করিবার শক্তি থাকে না। ইহা কিন্তু মনস্তাপজনক। ফলতঃ জীবনের একটী প্রধান ব্যাপারে চিরকালের নিমিত্ত একবারে বিরত হইয়া থাকিতে হয়। অতএব দন্ত-রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা পালন করা বিধেয়।

আপোত্থিতাগ্রং দ্বৌ কালৌ কষায়কটুতিক্তকং।
ভক্ষয়েদ্দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্ ॥”

প্রাতে ও সন্ধ্যায় কটু, তিক্ত এবং কষায় রস বিশিষ্ট কুট্টিতাগ্র দন্ত কাষ্ঠ (যে দন্ত কাষ্টের অগ্রভাগ ভালরূপ থেঁতো করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিবে। মার্জন কালে দন্তমূলের মাংসে ঘর্ষণ না লাগে, তন্নিমিত্ত সাবধান হইতে হইবে।

“তন্মলোপহরং শস্তং মৃদুশ্লক্ষং দশাঙ্গুলং।
মুখবৈরস্য-দৌর্গন্ধ-শোফ-জাড্য-হর-সুখং ॥”

সেই দন্তকাষ্ঠ মৃদু, মসৃণ, দশাঙ্গুল-পরিমিত হওয়া আবশ্যক। মৃদু এবং গ্রন্থিহীন না হইলে দন্তমাংস বা ওষ্ঠ স্ফীত হইতে পারে। দশাঙ্গুল পরিমিত হইলে ধরিতে সুবিধা হয়। দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলে, মুখ পরিস্কৃত হওয়ায় তাহার দুর্গন্ধ, বিরসতা, জড়তা এবং শোথ দূরীভূত হয়।

“নিম্বশ্চ তিক্তকে শ্রেষ্ঠঃ, কষায়ে খদিরস্তথা।
মধুকো মধুরে শ্রেষ্ঠঃ, করঞ্জঃ কটুকে তথা ॥”

তিক্ত রসের মধ্যে নিম, কষায় রসের মধ্যে খদির, মধুর রসের মধ্যে যষ্টি-মধু এবং কটু রসের মধ্যে করঞ্জ শ্রেষ্ঠ। এই সকল কাষ্ঠ, দন্ত-শোধনার্থ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশে আস্‌সেওড়া, আটকিরা, বকুল, বাব্‌লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা তিক্ত, কষায়, দন্ত-হিতকারী এবং অনায়াস-লভ্য।

এস্থানে দন্ত-শোধন চূর্ণ ব্যবহার করিবার ক্রম বলিব।

ক্ষৌদ্রত্রিকটুকাক্তেন তৈলসিন্ধুভবেন বা।
চূর্ণেন তেজোবত্যাশ্চ দন্তান্নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥
একৈকং ঘর্ষয়েদ্দন্তং মৃদুনা কূর্চ্চকেন চ।
দন্তশোধনচূর্ণেন, দন্তমাংসান্যবাধয়ন্ ॥”

১। ত্রিকটু (অর্থাৎ শুঁঠ, পিপুলি এবং মরীচ এই তিন জিনিষ তুল্য পরিমাণে) চূর্ণ করিয়া রাখিবে। দন্তমার্জ্জন-কালে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে।

২। সৈন্ধব চূর্ণ, তৈল মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা দন্ত মার্জ্জন করিবে।

৩। চৈ চূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং তদ্দারা দন্ত মার্জ্জন করিবে।

এক একটী দন্ত মৃগ্নকুটী (ব্রস্) দিয়া দন্ত-মাংসে পীড়া না জন্মে, এই রূপে দন্ত-শোধন চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিবে।

শ্রীমনোমোহন সেনগুপ্ত।

স্তোত্র।

(১)

তেজোময় তপনে কি দেখেছ কখন
আকাশে আপন কক্ষে করিতে ভ্রমণ?
প্রত্যুষে, প্রদোষে কিম্বা, মধ্যাহ্ন-সময়ে
ভবে যবে কর-দানে তাপিত করয়ে?

(২)

বল কভু হেরেছ কি সতৃষ্ণ নয়নে,
উষার শিশির-বিন্দু, সায়ন্তন ঘনে?
কিম্বা বৃষ্টি-পাত-পরে ইন্দ্রধনু-রেখা।
পূর্ব্ব গগনের মূলে যায় যারে দেখা;

(৩)

রজনীর তমোজাল করি' বিদূরিত
দেখেছ কি শশধরে হইতে উদিত?
মধুর শীতল-কর করি' বিকিরণ
উজলিতে যামিনীর সুন্দর আনন?

(৪)

ভ্রমিয়াছ কভু তুমি শ্যামল প্রান্তরে,
আন্দোলিত শস্য যথা কত শোভা ধরে;
বিহগ-কূজিত চারু নিকুঞ্জ সুন্দর,
দেখিয়া হয়েছ কভু প্রফুল্ল অন্তর?

(৫)

সাগর-সিকতা কভু করেছ দর্শন
শুনেছ কি বিক্ষোভিত সমুদ্রগর্জ্জন ?
প্রভঞ্জন-সমাগমে হ'য়ে উত্তেজিত
উত্তাল তরঙ্গে যবে হয় তরঙ্গিত।

(৬)

হেরেছ কি কভু, তুমি চপলা চঞ্চলা,
নাশি নৈশ অন্ধকার করে যবে খেলা ?
শুনেছ কি কুলিশের গম্ভীর স্বনন,
কাঁপাইতে থর থর প্রশস্ত গগণ ?

(৭)

দেখেছ কি স্বভাবের সৌন্দর্য্য অপার
করিছে চৌদিকে তব মাধুরী-বিস্তার ?
কখন কি কর নাই আঁখি-উত্তোলন
হেন দৃশ্য নির্ম্মাতায় করিতে দর্শন ?

(৮)

বিভু বিরচিত নীল বিশাল বিমান,
জ্যোতিষ্ময় গ্রহ তারা নিত্য ভ্রাম্যমাণ ;
বিশ্ব-চরাচর-বাসী জীবসমুদয়,
এক বিধাতার হস্তে নির্ম্মিত নিশ্চয় ;

(৯)

তাঁহার(ই) আদেশে বহে ভীম প্রভঞ্জন
অশনি অম্বরে করে গভীর গর্জ্জন।
তাঁর আজ্ঞা পঞ্চভূত করিছে পালন
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া তাঁর অনন্ত শাসন।

(১০)

পরম দয়ালু তিনি সর্ব্ব-জীবগণে
চাহেন নরের প্রতি করুণ নয়নে ;

বিশ্ববাসী করে তাঁর মহিমা কীর্ত্তন

এস ভাই! সবে মিলি' বন্দি সে চরণ।

শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জননী।

(১)

স্বর্গাদপি গরীয়সী মা! তুমি আমার
নাহি এ পৃথিবী-মাঝে উপমা তোমার,
দশ দিন দশ মাস, তব জঠরেতে বাস
করিয়া ল'ভেছি এই নর-জন্ম সার,
আমি মা! তোমার সেই স্নেহের কুমার।

(২)

আদ্যাশক্তি তুমি মাতা! জীব-সংরক্ষিণী
মঙ্গল-আধার, পুত্র-সৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী
সুধা-পূর্ণ তব স্তন, পান করি' প্রতিক্ষণ,
বাড়িয়াছি শুক্ল-পক্ষ-চন্দ্রমার মত
জননী! আমার তুমি সদা হিতে রত।

(৩)

জননী! ব্যথার ব্যথী তোমার মতন
কে বা আছে!—কে বা করে স্নেহ-বিতরণ
যখন দুরন্ত ব্যাধি দিত ক্লেশ নিরবধি,
করিত এ দেহ জীর্ণ শীর্ণ অনুক্ষণ
কি দারুণ ক্লেশ তুমি লভিতে তখন।

(৪)

তাই প্রণিপাত করি ও রাঙা-চরণে
মাগি এই ভিক্ষা, দেবী ? প্রসীদ সন্তানে
যেমতি প্রবাস-মাঝে,　　আনন্দ-প্রতিমা-সাজে,
ব'সেছিলে হৃদাসনে, সেই রূপ ধরি,
ব'সো মা ! হৃদয়ে পুন সাধ পূর্ণ করি' !

৫

নয়ন গঙ্গার জলে ও রাঙা-চরণ,
ধোয়াইব মাখাইব ভকতি-চন্দন,
কৃতজ্ঞতা-ফুল দিয়ে,　　মা—মা মন্ত্র উচ্চারিয়ে,
উৎসর্গিব মনসাধে এ ছার জীবন
পরমার্থ ইহা বই কি আছে এমন।

শ্রীরঙ্গবিহারী প্রামাণিক।

একটী হিন্দুরমণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গত মাসের "অনুশীলনে" একটী "হিন্দুরমণী" নামক প্রবন্ধে আমরা উক্ত রমণীর প্রণীত পুস্তক-সম্বন্ধে কিছু বলিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। অতএব তাঁহার লতিকা নামক পুস্তক-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

লতিকার রচনাকারিণী, অন্তঃপুর-বাসিনী হিন্দু-রমণী। আমাদের বর্ত্তমান হিন্দুরমণী-সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাঁহাতে হিন্দুরমণীর পক্ষে এরূপ সুললিত পদ্যময় পুস্তক রচনা করা প্রশংসার বিষয়। পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পবিত্র ও প্রীতি-ভক্তির মধুময় উচ্ছাসে পরিপূর্ণ। যে রমণী—

"কোথা যাব কি করিব,　　কোথা হৃদি জুড়াইব,
হৃদয়েশ বিনা মোর প্রাণ কিছু চায় না।

না দেখিলে তাঁর মুখ, কিছুতে না হয় সুখ,

কিছুতে এ পোড়া মন বুঝাইতে পারি না।

তাঁহার মঙ্গল বিনা অন্য কিছু চাহি না।"

এইরূপ মনোবেগ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, তিনি একটী যথার্থ প্রেমিকা। এরূপ রত্ন অমূল্য।

পতির সুখ-দুঃখ কেমন এক সূত্রে বাঁধিয়া তিনি মধুর ভাবেই বলিয়াছেন,—

"তোমার মঙ্গল বিনা কি আর আছে কামনা

তব সুখে সুখ পাই, বেদনায় বেদনা।"

পতি-পদে সমস্ত প্রাণ অর্পণ করিয়াও তাঁহার মন উঠে নাই। তাই তিনি বলিলেন,—

"সখী! এ, মম একটী প্রাণ

যদি সহস্র হইত পরাণ ভরিয়া

করিতাম তাঁয় দান।"

ইহা বাস্তবিক মধুর মধু। এ প্রেম-পাথারের কুল-কিনারা নাই। রচয়িত্রী, বাল্যে নদীকূলে গিয়া কি বলিতেছেন, পাঠক পড়িয়া দেখুন—

"শিশুকালে প্রাতে উঠে,

যেতাম নদীর ঘাটে

দেখিতাম পূর্ব্ব দিকে রক্ত-রাগে রঞ্জিয়া।" ইত্যাদি।

"লতিকা" ১২৯২ সনে ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়। পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম নাই। তাঁহার স্বামী বাবু উপেন্দ্রগোপাল মিত্র বি. এ. উহা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের উৎসর্গেও লেখিকার সহৃদয়তা প্রকাশ পায়।

"এই ক্ষুদ্র অলঙ্কারহীনা লতিকাটী
বঙ্গদেশবাসিনী সমস্ত
সাধ্বী রমণীগণের শ্রীকর-কমলে
সাদরে উৎসর্গ করা হইল।
ভরসা আছে যে, পুরুষ বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট
আদৃত না হইলেও, আপনাদের নিকট
ইহার অনাদর হইবে না।"

কিন্তু লেখিকা পুরুষগণকে যে ভয় করিয়াছেন, তাহা অমূলক। সংসারে উপযুক্তের প্রায় আদর হয়। কত প্রতিভাই এই যন্ত্রণাময় সংসারে প্রবেশ করিয়া সমসাময়িক ব্যক্তিগণের কঠোর নির্য্যাতনে নীরব হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের হৃদয়োত্থিত অমৃতলহরী চিরকালই জগৎকে বিমোহিত করিতেছে। এস্থলেও উক্ত নিয়মের বিপর্য্যয় হয় নাই। তৎকালীন সংবাদ-পত্র-সমূহের সমালোচনা দেখিলেই পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে লেখিকা কালগ্রাসে পতিতা হন ও তৎসঙ্গেই বঙ্গদেশের একটী উদীয়মানা রমণী কবির জীবলীলা অবসান হয়।

বর্ত্তমান সময়ে মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী প্রভৃতি আমাদের দেশে কতকগুলি রমণী কবি রহিয়াছেন। "লতিকা"-রচয়িত্রী কুসুমকামিনী তাঁহাদের সমতুল্যা না হইলেও বিশেষ সমানুভূতির পাত্রী। তাঁহার প্রতিভা, মুকুলেই বিদলিত হইয়াছে। যে গোলাপ পূর্ণরূপে বিকসিত হইলে সমস্ত কুঞ্জ সুরভিত হইত, তাহাকে অকালে কীটদষ্ট হইয়া ঝরিয়া পড়িতে দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির অন্তর আকুলিত হইয়া না উঠে? তিনি উনবিংশ বর্ষ বয়সে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার যৌবন-"লতিকা" হইতে দুই একটী পুষ্প চয়ন করিয়া আমরা আজ পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করিতেছি। হিন্দুরমণীর স্বামীই সর্ব্বস্ব। প্রণয়ের অর্থ অনেক সময় আত্ম-সমর্পণ। যে প্রেমে আত্মপর-ভেদ আছে, তাহাকে কখন উচ্চ শ্রেণীর প্রেম

বলা যাইতে পারে না। লতিকায় স্বামীর প্রতি যে প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর। যথা;—

"শুন লো সজনী! চাহিস্ পরাণ
তাহাও আমি পারি লো দিতে।
কিন্তু এ দেহেতে পরাণ থাকিতে
রতন আমার দিব না নিতে॥"

"লতিকা"-সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রের মতামত নিম্নে মুদ্রিত হইল।

" Her work, we venture to say, is one of the finest literary productions of the member of her sex." The poem treats of various subjects which are written in a fine spirit in an elegant style. The descriptions are grand and the sentiments expressed therein are noble in their conceptions."(1)

"The pieces are written on a variety of topics and are characterized by much tenderness of thought and elegance of expressions. "(2)

"এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মহিলাগণ তাঁহাদের ন্যায্য সংসারের কর্ম্মত্যাগ করিয়া কালী কলম লইয়া বসেন, ইহা আমাদের মতের বিরুদ্ধ। কিন্তু আমরা অবগত হইলাম যে, এই পুস্তক-লেখিকা কেবল পুস্তক লিখিয়া সময় নষ্ট করেন না। তিনি অন্য হিন্দুমহিলার ন্যায় সংসারের কার্য্যও করিয়া থাকেন। অবসর মত যে সুন্দর পদ্য, স্বামীর উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ করিয়া উপেন্দ্র বাবু ছাপাইয়াছেন; নতুবা লেখিকার ছাপাইবার ইচ্ছা ছিল না। পুস্তক খানি দেশীয় ভাবে পরিপূর্ণ। স্বামী ব্যতীত স্ত্রীর আর কিছুই নাই; স্বামী দেবতা, স্ত্রী তাঁহার সেবিকা, ইহাই পুস্তকের উদ্দেশ্য। পুস্তকের স্থানে স্থানে পদ্য যেমন সুন্দর,

(1) Bengalee, April 30th, 1887.

(2) Indian Mirror, May 13th, 1887.

ভাবও তেমনই উচ্চ এবং মৌলিক। হিন্দুরমণীর কিরূপ কামনা হওয়া উচিত, লেখিকা স্বামী-উদ্দেশে বলিয়াছেন,—

"তোমার মঙ্গল বিনা, কি আর আছে কামনা;
আমার অসুখ সুখ কখনও বুঝি না
তব সুখে সুখ পাই, বেদনায় বেদনা।"

* * *

"জানি যদি অকস্মাৎ একটী কণ্টকাঘাত
হয় তব প্রাণনাথ! অই রাঙ্গা চরণে,
অমনি মম হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়
ভাবি কেন ও কণ্টক ফুটিল না এখানে
শুনিলে তোমার জ্বর ইচ্ছা করে প্রাণেশ্বর!
পোড়া জ্বরে কি কারণ করে তোমা জ্বালাতন
আমি নয় ভুগি জ্বরে, থাক তুমি কুশলে।
অধিক কি কব আর প্রাণনাথ! বারে বার
দেখিলে তোমার হাসি আনন্দসাগরে ভাসি
দেখিলে ও মুখ ম্লান দাসীর না থাকে জ্ঞান
এরে যদি বলে নাথ! ভালবাসা সকলে
তবে বলিতে সাহসী ভালবাসে ক্রীতা দাসী
(কিন্তু) আমি কি মম হৃদয় কে ভালবাসে তোমায়
বুঝিয়া লইবে নাথ! ইতি পদ-কমলে॥" (৩)

* *

ভালবাসা কারে বলে থাকে নাথ! কোন স্থলে
কেমন আকার তার কিবা তার ব্যবহার
কিছুই তো নাহি জানে জ্ঞানহীনা দাসী;

(৩) আনন্দবাজার পত্রিকা ১২৯৩ সাল, ৮ই চৈত্র।

সবেমাত্র এই জানি কি দিবস কি যামিনী
হৃদয় নিযুক্ত থাকে, তব শুভ-ধেয়ানে।'

এই বার "এণ্টিক্রিশ্চিয়ান্ (Anti Christian) কস্‌মোপলিটান্ (Cosmopolitan), "প্রকৃতি" "বঙ্গ-নিবাসী" এই সকল ইংরেজী ও বাঙ্গালা পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, "লুক্রেশিয়া" প্রভৃতি কাব্য-প্রণেতা কবি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যবিশারদের এক খানিমাত্র পত্র উদ্ধৃত হইল,—

"আমি লতিকা-পাঠে অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। দোষশূন্য না হইলেও এই পুস্তক খানি বিবিধ-গুণ-পূর্ণ। এরূপ পুস্তক লিখিতে সক্ষম হওয়া অনেক পুরুষের পক্ষেই গৌরবের বিষয়, স্ত্রীলোকের তো কথাই নাই।

"মেঘের পিঠেতে উঠে" ইত্যাদি। (৪)

এরূপ সরল, মধুর ও সুভাবসম্পন্ন কবিতা অনেকানেক প্রসিদ্ধনামা কবির লেখনী হইতেও সচরাচর বহির্গত হয় না। গ্রন্থকর্ত্রী স্ত্রীলোকের অলঙ্কার-প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়া যে কয়েকটী উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের প্রত্যেক রমণী হৃদ্‌গত করিয়া রাখিলে অনেক পরিবারের সুখ বৃদ্ধি হইতে পারে। বাহুল্য-ভয়ে অধিক লিখিলাম না।" ১৮৮৭, ১৮ই অক্টোবর।

শ্রীকালীপ্রসন্ন শর্ম্মা।

কুসুমকামিনীর লিখিত অনেক কবিতা, গল্প, চিঠি-পত্র ইত্যাদি রহিয়াছে। তাঁহার কতিপয় পত্রের প্রতিলিপি, পাঠকের দৃষ্টি-পথের পথিক করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ যথাস্থানে নিবদ্ধ হইল। এখানে একটী অমুদ্রিত অপ্রকাশিত কবিতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।

তারাদর্শনে।

"কি ঝকিছে ঝিকি মিকি গগনপ্রাঙ্গনে-
জ্বেলেছে কি সন্ধ্যা-দীপ সুর-বালা-কুল,
অথবা ইন্দ্রের পত্নী রাজরাজেশ্বরী।
শচীর কবরী-শোভা পারিজাত ফুল॥

(৪) এই কবিতাটী ৯ চিহ্নিত উদ্ধৃত অংশে পাঠ করুন।

কিম্বা অপ্সরার বস্ত্র রতনে খচিত।
পাতিয়া দিয়াছে মরি সুনীল অম্বরে,
মোহিতে মানবকুল মোহিতে জগত্।
দেখাতে উজ্জ্বল শোভা ধরা রজনীরে॥"

"লতিকা" হইতে নমুনা-স্বরূপ ১০ দশটী কবিতাংশ উদ্ধৃত হইল।

১। "জপিয়া তোমার নাম,　　যাইব শমন-ধাম,
ভাবিয়া তোমার রূপ উন্মাদিনী হইব।
তোমার গুণের কথা,　　গাব নাথ যথা তথা,
এই সুখ চাহি আমি, আর সুখ চাহি না।
এই সুখে সুখী দাসী অন্য সুখ জানি না॥"

২। "বহিতেছে মৃদু বায়ু কাঁপিছে পত্রিকা,
খেলিতেছে তার'পরে চাঁদের কিরণ,
দেখে প্রকৃতির এই মূর্ত্তি মধুমাখা,
থেকে থেকে প্রাণ মোর করিছে কেমন।"

৩। "লও নাথ সঙ্গে করি' পদ-সেবা করিব,
ঘামিলে তোমার অঙ্গ অঞ্চলেতে মুছাব
কণ্টক ফুটিলে পায়,　　বাহির করিব তায়,
সযতনে ক্ষত স্থান, বুকে করে' রাখিব
লিখিতে বসিলে তুমি মসীপাত্র যোগাব।
তোমার অসুখ হ'লে কাছে বসে' থাকিব,
অনাহারে জাগরণে পদ-সেবা করিব।
যা বলিবে তা করিব,　　কিছুতে না বাধা দিব,
তোমার সুখেতে বাধা দিবনাক কখন,
হব না তোমার বিঘ্ন থাকিতে এ জীবন।
শুনেছি জীবন-ধন শুনিয়াছি পুরাণে,

"সীতা নাকি পতি-সনে গিয়াছিল কাননে,
সে দুর্দ্দিনে যদি তাঁরা, সঙ্গে লয়েছিল দারা,
তুমি কেন সুসময়ে সঙ্গে নাহি লইবে,
ভয় নাই দাসী কভু অসুখী না করিবে।
শয়নে স্বপনে আমি তোমা বিনে জানি না
ঈশ্বর করুন যেন জানিতেও চাহি না।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তোমা বিনা নাহি আন,
সেবা করি শ্রীচরণ সদা মনে বাসনা,
পুরাবে কি প্রাণেশ্বর! পুরাবে কি কামনা?"

৪। "গুরুর অধিক গুরু আমার ঈশ্বর,
মৃত্যুকালে এক বার, দেখা দিও দয়াময়,
নেহারি পদারবিন্দ ত্যজি কলেবর।
পুরাও মনের সাধ জুড়াক অন্তর॥"

বাল্যকালের একটী চিত্র গ্রন্থকর্ত্রী কেমন আঁকিয়াছেন;—

৫। "আহা মরি যেই দিন গিয়াছে রে চলিয়া
প্রাণ দিলে এক বিন্দু আসে কি রে ফিরিয়া
উদিত নলিনীনাথ মৃদু মন্দ হাসিয়া।
কিন্তু কিছু সন্দ-মনে বৃক্ষ-আড়ে থাকিয়া
দেখেছেন নলিনীকে উঁকি ঝুঁকি পাড়িয়া
যেথারে অশোক-বনে সীতা-সহ দশাননে
দেখেছিল হনুমান্ বৃক্ষডালে বসিয়া
কি বলে রাবণ, সীতা কি বলে তা শুনিয়া।
দিবাকর, নলিনীর এই রঙ্গ দেখিয়া
সবিস্ময়ে সেই দিকে থাকিতাম চাহিয়া;
সবাই আনন্দ-মনে বসিতাম দূর্ব্বাবনে
বলিতাম এক জন অন্যমুখ চাহিয়া
এ সুন্দর মখমল কে রাখিল পাতিয়া॥

নিশির শিশির-বিন্দু দূর্ব্বাশিরে পড়িয়া
রবি-করে জলিত রে ঝক্ ঝক্ করিয়া
দেখি' ভাবিতাম মনে, বুঝি এই দূর্ব্বাবনে,
রাশি রাশি মুক্তা কেহ রাখিয়াছে ঢালিয়া,
কোন্ ধনী এত রত্ন গিয়াছে লো ফেলিয়া।
বলিতাম এস ভাই! এই মুক্তা তুলিয়া
পুতুলের গলে দিব সাতনোর করিয়া
মুক্তা লইবার তরে, হস্ত দিলে তার' পরে,
হায় রে সাধের মুক্তা যাইত রে গলিয়া,
কি হ'ল কি হ'ল বলে' মরিতাম ভাবিয়া।
লাভে হ'তে মুক্তা-জল হাতময় লাগিল,
হু হু করে' শীতে সব মরিতাম কাঁপিয়া,
তখন সবাই মিলে' যাইতাম নদীজলে,
হাত দুটী রাখিতাম জল-মধ্যে ধরিয়া
উষ্ণজল পরশিতে শীত যেত সারিয়া।
আবার মুক্তার কথা বলিতাম হাসিয়া
বল দেখি মুক্তা ভাই! কেন গেল গলিয়া,
আবার তখনি তার, মীমাংসা হইত সার
শচী-কণ্ঠ-হার বুঝি গিয়াছিল ছিঁড়িয়া,
সেই মুক্তা, মানুষে তা লইবে কি করিয়া।

৬। "কিন্তু কেন বিধি সেই রাঙ্গা পদ
সদাই সেবিতে নারি
সে সাধের চেয়ে বেশী সাধ নাহি
সে পদ না ছুঁয়ে মরি।"

৭। "নম্রতা বিনয় নামে পর অলঙ্কার,
দেখো দেখো কত শোভা হইবে তোমার
লজ্জাবতী লতা দেখ অলঙ্কার বিনে

কত শোভা পায়, শুধু এক লজ্জা-গুণে
কামিনীর রূপ দেখে' আদর কে করে,
কেবল সৌরভে তার মান ধরা'পরে ;
সুন্দর গোলাপে দেখ সুগন্ধই শোভা
তুমিও অমনি হ'লে হবে মনোলোভা
কি ছার বসন দিদী ! কিম্বা অলঙ্কার
গুণের অধিক আর কি আছে বাহার।
"শুনেছ কি দময়ন্তী ভিখারী নলের
সহিত ফিরিয়াছিল ভিখারিণী-বেশে ?
শুনেছ কি সাবিত্রীর কাহিনী ব্রতের
শুনেছ কি সীতা কত সয়েছিল ক্লেশে ?
পিতৃ-মুখে শিবনিন্দা করিয়া শ্রবণ
শুনেছ কি দাক্ষায়ণী ত্যজেছে জীবন ?
রাজার তনয়া সবে ধনহীন পতি
ভাগ্যবশে পাইয়াও, নাহি করে ঘৃণা
ঘটিলে পতির কিন্তু দারিদ্র্য-দুর্গতি
সাধ্যমতে দেখায়েছে সমান-বেদনা।"

৯। "মেঘের পিঠেতে উঠে' কোথা যাও তারা ছুটে
দেখিতে কি তব নাথে চারু শশধরে এত চলেছ সত্বরে।
কেন যাও একাকিনী, আমিও তো বিরহিণী, তোমার মতন।
আমায় লইয়া সঙ্গে করিবে গমন ?
(শুনে') চিকুরে ঢাকিলে মুখ,
আমার কারণে দুঃখ, হইল না মনে
পৃথিবীকে নিত্য দেখে', পৃথিবীর ভাব শিখে'
নিস্বার্থতা বুঝি গেছ ভুলে, পরদুঃখে হৃদয় না গলে ?"

১০। তোমার রোদনে, করিব রোদন

ব্যাথায় পাইব ব্যথা রে।

তোমার নিধনে ত্যজিব জীবন

শুকাবে কোমল পাতা রে।

তোমার রোদনে করিব রোদন

জীবন-ধারণ বৃথা রে॥”

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, উক্ত রমণীর পদ্য লিখিবার যেরূপ ক্ষমতা ছিল, গদ্য লিখিতেও তিনি সেইরূপ পটু ছিলেন। তাঁহার লিখিত পত্রাদি হইতে ইহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিব। এই সমস্ত পত্রে তারিখ অথবা বৎসর দেওয়া নাই। ইহা নিশ্চয়ই মার্জ্জনীয় নয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি অনেক সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তির পত্রেও বৎসরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ কথা বলিয়া অবশ্য আমরা তাঁহার দোষ-ক্ষালন করিতে চাহিতেছি না। সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নিকট অল্পবয়স্ক রমণীর এই সামান্য ত্রুটি বিশেষ ধর্ত্তব্য কিনা, বলিতে পারি না।

সমস্ত কর্ম্মেই তিনি স্বামীর অনুমতি লইতেন। ইহা বর্ত্তমান রমণীকুলের অনুকরণীয়। তাঁহার একখণ্ড পত্রে উল্লেখ আছে,—

১। “আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমার প্রতিজ্ঞা যেন বিচলিত না হয়। স্বামী ভাবিয়া নয়—শিক্ষক ও গুরু বলিয়া আশীর্ব্বাদ চাহিতেছি। আপনি তাহাই ভাবিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। আমার শিক্ষাগুরু যদি অন্য জন হইতেন, তবে আজ তাঁহারই নিকট আশীর্ব্বাদ চাহিতাম—তাহা তো নাই; আপনিই আমার শিক্ষক, তাই আপনার নিকট আশীর্ব্বাদ চাহিতেছি। * * স্বামী অপেক্ষা গুরু, পৃথিবীতে নাই। স্বামীকে না জানাইয়া কোন কার্য্য করিতে নাই, তাই আমার ব্রতের কথা আপনাকে জানাইলাম। * *

মঙ্গলবার।”

কোন কোন পত্রে তিনি স্বামীকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন না করিয়া "তুমি" প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহাও তাঁহার এক পত্রে এইরূপ দেখিতেছি,—

২। "আমি তোমাকে 'তুমি তুমি' করিয়া পত্র লিখিতেছি, এ আমার ভালবাসার কথা; কিন্তু তুমি মনে করিবে, 'এ আমার অপমান হইল'। কাজেই এ কথাটা তোমার মনে থাকিবে; কিন্তু আমি 'আপনি আপনি' করিয়াও যে পত্র লিখিয়া থাকি, তাহা মনে আছে কি?"

পত্রখানিতে মনের ভাব কতক ব্যক্ত হইয়াছে। "আপনি" শব্দে যেন কতকটা দূরত্ব আছে। সুতরাং তাহাতে ঘনিষ্ঠতা আসে না। "তুমি" "তুমি" খুব নিকটস্থ করিয়া আনে।

স্বামী এক সময় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আমায় কিরূপ ভালবাস"? এই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুরমণী যাহা বলিয়াছিলেন, সেরূপ উত্তর কেবল উন্নত-হৃদয় রমণীর পক্ষেই সম্ভবে;—

৩। "তুমি এক দিন আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, 'আমাদের কি পবিত্র স্বর্গীয় প্রেম হইয়াছে?' আজ আবার আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের কি পবিত্র প্রেম হইয়াছে? যে প্রেমের বলে সীতা বনে যাইয়াও রামচন্দ্রের ধ্যান করিতেন,—যে প্রেমের বলে রামচন্দ্র, হিরণ্ময়ী সীতার প্রতিমূর্ত্তি লইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন,—যে প্রেমের বলে মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া দেশে দেশে বেড়াইয়াছিলেন,—আবার যে প্রেমের বলে গৌরী বলিয়াছিলেন—

'পঞ্চাননকে পাবার আশে,
পঞ্চ তপ করি ব'সে।'

যে প্রেমের জন্য মাধবীলতা বলিয়াছিল, তোমা বিনা কে আছে আমার? আমার জীবন-ধারণ বৃথা। সে ভালবাসা কি আমাদের হইয়াছে নাথ?

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ভালবাসা-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'ভালবাসা এক মহাযজ্ঞ। এ যজ্ঞের আহুতি—স্বার্থ। এ যজ্ঞের দক্ষিণা—মান। যেখানে স্বার্থ-রক্ষা করিতে চাও, সেখানে ভালবাসিতে চেষ্টা করিও না। যেখানে মানে মানে রহিতে অভিলাষী হও, সেখানেও ভালবাসা দেখাইও না।'

বল দেখি—প্রাণাধিক! মানে মানে থাকিতে ভালবাস, না ভালবাসিতে ভালবাস?"

তাহার আর এক স্থানে লেখা আছে—'দয়া আর ভালবাসা এক বস্তু নহে।' বল দেখি, নাথ! তুমি আমাকে দয়া কর, না ভালবাস? আবার আর এক স্থান আছে—'কৃতজ্ঞতা আর ভালবসাতে স্পষ্ট পার্থক্য আছে। বল দেখি—প্রাণেশ্বর! আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমাকে ভালবাসি, না যথার্থ ভালবাসি?"

'বীরাঙ্গনা'-কাব্য পাঠ করিয়া তাঁহার যেরূপ মত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল,—

৪। "বীরাঙ্গনার" এমন কোন উপদেশ নাই, যাহার জন্য সে পুস্তক পড়িতে হয়। পড়িতে হয়, কেবল কবিতার মাধুরী দেখিবার জন্য। বাস্তবিক কবিতাগুলি যেন মধুময়! পড়িবার সময় মনে যেন কি এক ভাব হয়। যেন কবিতার সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। আবার সমাপ্ত হইলে মনে যেন কষ্ট হয়। মন বলে—'আর একটু যদি থাকিত।'

দ্রৌপদীর চরিত্র অনেক হিন্দুরমণীর সন্দেহের স্থল। ভাল করিয়া না বোঝায় অনেকে সে চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। একটু ভাল করিয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক বুঝিলেই এই রমণীর ন্যায় ধারণা হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—

৫। "আমি গদ্য ভারত (প্রতাপ রায়ের প্রকাশিত) পড়ি-

তেছি। কাশীদাসের মহাভারত পাঠে আমার দ্রৌপদীর উপর বড় বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তখন ভাবিতাম, কেমন করিয়া একটী মেয়েকে পাঁচ জনে বিবাহ করিয়াছিল? কিন্তু প্রতাপের মহাভারত পড়িয়া সে ভ্রম দূর হইয়াছে। পাঁচ জনেই বিবাহ করুক, আর এক জনেই করুক, দ্রৌপদী যে ধার্ম্মিকা ও পতিপরায়ণা ছিলেন, তাহা তাঁহার সত্যভামার সহিত কথোপকথনে বেশ বোঝা যাইতেছে। সত্যভামা, 'স্বামি-বশীকরণ' মন্ত্র 'শিখিতে চাহিলে, দ্রৌপদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা পড়িয়া দ্রৌপদীর উপর আমার ভক্তি হইয়াছে।"

বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধে এই রমণীর যে রূপ মত ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপ সমীচীন না হইলেও, তন্মতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও, সাধারণের বিবেচ্য। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণের চিত্র স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত। স্বামী, উক্ত বিষয়ের তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—

৬। "প্রাণেশ্বর তুমি আমার নিকট বিধবা বিবাহ ভাল, কি মন্দ, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। নাথ! আমি তার কি জানি যে, তাই বলিব। যদি তুমি বল যে তোমার সহিত তর্ক করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে, তবে দুই একটা কথা লিখিতে পারি। কারণ, তোমার লেখার ভাবে বোধ হইতেছে যে তুমি আমাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়াছ।

"আমি বলি, বিধবার বিবাহ ভাল। তাই বলিয়া সকল বিধবার বিবাহ ভাল বলি না। আর ভাল বলিতেছি বলিয়াই যে আমি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতিনী, তাও মনে করিও না। যে বিধবারা স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছে, যে বিধবারা সেই আরাধ্য দেবতার জন্যে স্বার্থত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছে, সেই সেই বিধবাকে আমি দেবী বলিয়া পূজা করি। তাঁহারা চিরদিন ঐরূপ পবিত্র বেদীতে বসিয়া পূজা পাইতে থাকুন। অপবিত্র বিধবা-বিবাহ-কথা যেন তাঁহাদের পবিত্র কর্ণে প্রবেশ না করে।

"আবার যে বিধবারা ধর্ম্ম-ভয়ে সমাজ-ভয়ে নিজের চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে পারেন, আমি সেই সেই বিধবাকে নমস্কার করি। তাঁহারা চিরদিন জগতে নমস্য হইয়া থাকুন। বিধবা-বিবাহের বাতাস যেন তাঁহাদের অঙ্গে না লাগে; কিন্তু যে বিধবা কেবল সমাজ-ভয়ে সতী থাকে, অথচ লুকাইয়া পাপ কার্য্য করে, আমি বলি, সে বিধবার বিবাহই ভাল। কেন আর লোকে তাহাদের জন্যে দুঃখ করিয়া মরে।

"তুমি বলিবে, যাহার চরিত্র খারাপ, তাহার বিবাহ দিলেও খারাপ হইতে পারে; তবে আর পাপ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া কেন? যাহাদের চরিত্র খারাপ, তাহাদের বিবাহ দিলেও যে খারাপ হইতে পারে, তাহা জানি; কিন্তু ব্যভিচারিণী হইতে হইলে স্ত্রীলোকের অনেক গুলি বাধা এড়াইতে হয়। যথা—ধর্ম্ম-সমাজ-শাসন.দণ্ড, নিন্দা, ভালবাসা। যাঁহাদের চরিত্র খারাপ হয়, ধর্ম্ম-ভয় তাহাদের বড় থাকে না; কিন্তু অন্য ভয় গুলি বিধবা অপেক্ষা সধবার বেশী থাকে। অমুক বিধবা অসতী, ইহা প্রায়ই শুনা যায়; কিন্তু অমুক সধবা যে অসতী, এ কথা অতি অল্পই শুনা যায়। তার কারণ, তুমিঃজান যে, বিধবা অপেক্ষা সধবার শাসন অনেক বেশী। স্বামী বর্ত্তমানে কুলটা হইলে, সে রাজার বিচারে অধিক দণ্ড পায়। সেই দণ্ডের ভয় আছে। আবার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা স্বামী বিদ্যমান। স্বামী মারিয়া ফেলিতে পারেন, কাটিয়া ফেলিতে পারেন, যাহা ইচ্ছা তাই করিতে পারেন। সেই এক ভয় আছে। আবার যদি স্বামী ভালবাসেন, তবে সে তো এক মন্দ ভয় নয়। তাহা হইলে, সধবা অবশ্য মনে করেন যে, ও ব্যক্তি আমাকে এত ভালবাসেন, আমি উঁহার নিকট অবিশ্বাসিনী হইব না। এ কথা যখন পুরুষ মানুষে মনে করেন, তখন অবশ্য স্ত্রীলোকেরও মনে আর এক ভয় আছে—লোক-নিন্দা। চরিত্র খারাপ হইলে, বিধবা অপেক্ষা সধবার অধিক নিন্দা হয়।

"আর, বিধবার এ সব ভয় অতি অল্প আছে। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে সংসারে একাকিনী একটী বিধবা বাস করেন। তাঁহার যদি চরিত্র খারাপ হয়, তবে আর লোকে তাঁহার কি করিবে? অমানুষে একটু নিন্দা করিবে। যে নিজের ধর্ম্ম অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারে. আমার তোমার একটু নিন্দায় তাহার কি হইতে পারে? তাই আমার বিবেচনায় কোন কোন বিধবার বিবাহ ভাল।

"বিবাহ চলিলেই যে, সকল বিধবা, বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহা তুমি মনে করিও না। যিনি চরিত্র ভাল রাখিতে পারিবেন, তাঁহার বিবাহ দেওয়া উচিত নহে। তবে যাহারা সমাজের নিকট সতী থাকে, অথচ যাহারা বেশ্যার অধম, আমি বলি যে. সে সব সতীদের বিবাহই ভাল। তুমি বলিবে যে, বিবাহ দেওয়ার নিয়ম করিলে, সকল বিধবার চরিত্র খারাপ হইবে। খারাপ হইবে, এমন আমার বোধ হয় না। সতীত্ব বলিয়া যে স্ত্রীলোকের একটি অমূল্য বস্তু আছে, তাহা সকল স্ত্রীলোকই জানে। সাধ করিয়া কেহ সে বস্তু বিসর্জ্জন দিবে না। যে দিবে, সে সমাজের নিকট না হউক, ধর্ম্মের নিকট পতিতা হইবে। সে কাহারও নিকট সম্মান পাইবে না, সে তপস্বিনী বিধবার নিকট অপদস্থ হইয়া থাকিবে; প্রকৃত সতীদিগের নিকটে অপদস্থ হইয়া রহিবে। তুমি বলিবে, তবে তাহাদের বিবাহ দেওয়া কেন? সে তো তার বিবাহ নয়, কিন্তু বন্ধন। সে স্বাধীন ছিল. শাসনাধীন হইল। তুমি বলিয়া থাক, মৃত ব্যক্তির স্মৃতির জন্য যে এক জন স্বার্থত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়া থাকেন, তাহা দেখিতে বড় সুন্দর। সেটা যে সুন্দর, তাহা কে না মানে? কিন্তু নাথ!

যে কখন পুস্তক দেখে নাই, মুখে পড়িয়া সে অক্ষর চিনিবে কিরূপে? যে কখন স্বামী দেখে নাই, সে সে স্বামীর স্মৃতি কিরূপে রাখিবে? তাহা না রাখিতে পারিলেই বা তাহার কি অপরাধ? আর—সে স্মৃতি-চিহ্নের যদি এতই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কেন তাহা রাখে না? তাহা হইলে তো আরও সুন্দর দেখাইতে পারে। তুমি হয় তো মনে মনে আমাকে স্বার্থপরা বলিবে। না নাথ! আমাকে কিছু বলিও না। আমি স্বার্থপরা নই। আমি জানি যে, স্ত্রী মরিয়া গেলে বিবাহ না করা অপেক্ষা করাই ভাল, কারণ, স্ত্রী মরিয়া গেলে, পুরুষ মানুষে যথন বিবাহ করে, সেই স্ত্রীর মন যোগাইবার জন্য যথন সঙ্ সাজে, তখন প্রতি কথায় যেমন প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, বিবাহ না করিলে তেমন মনে পড়ে না। আমি যদি এখন মরি, তবে তুমি আবার বিবাহ করিও। যেমন তুমি আমাকে কলহ-বলে ঘৃণা কর, সে আবার তোমাকে তেমনই বুড়ো ব'লে ঘৃণা করিলে তবে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। আর আমি তাই দেখে হি হি করে' হাসিব; আমি বলি, যদি বিধবা-বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা তাহাদের অন্য উপায়ে শাসন করিতে পার, তবে বিবাহ না দিয়া তাই কর। নতুবা বিধবার বিবাহ দাও।"

এখানে আর একটী দোষের বিষয় গোপন করিলে অন্যায় কর্ম্ম হইবে। অনেক কৃতী লেখকের ন্যায় কুসুমকামিনীও বর্ণাশুদ্ধির আক্রমণ অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ঔষধের সংগ্রহও কুসুমকামিনীর ছিল। পলতা, পটোল, ছোলা ইত্যাদি আহারীয়ও বটে; ঔষধও বটে। সেই হিসাবে নিম্নের ঔষধ লিখিয়া দিয়া এক তীরে দুই শিকার করিলাম। এখানে রমণীর অনুসন্ধিৎসা দেখান ও সাধারণের উপকার করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

"আমার নিকট কাশীর অসুখের একটী ঔষধ ছিল, যদি আবশ্যক হয় বলিয়া লিখিয়া দিতেছি।

জিঙ্ক ভেলিরিয়া	৮	আট	ড্রাম
জাবোরাণ্ডি	৮	,,	,,
ইউকলি পটাশ	৪	চারি	,,
ডিজিটালিস্ কিউবেরস	৪	,,	,,
কুবের্স্	৪	,,	,,
ষ্টামেনিয়া	১৬	ষোল	,,

নাইট্রেট্ অব্ পটাশ চারি ড্রাম
ক্যাচ্ কেরিলা বার্ক ১ এক ,,

এই গুলিকে একত্র করিয়া গুঁড়া করিতে হইবে। অর্দ্ধ চামচা পরিমাণ পোড়াইয়া যে ধূম হয়, তাহা আঘ্রাণ করিতে হয়।"

১২৯৫ সালের ৮ই চৈত্রে পতি-পুত্র-শালিনী কুসুমকামিনী মর্ত্তলীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। একটী মাত্র সন্তান রাখিয়া আত্মীয় স্বজনকে হর্ষবিষাদে নিক্ষেপ করিয়া কুসুমকামিনী স্বর্গগামিনী হইয়াছেন। *

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

---

* গত বারে এই প্রবন্ধে ১২৮৩ সালের ১৯ শে ফাল্গুনে কুসুমকামিনীর বিবাহ হয়, এই রূপ লিখিত ছিল। তৎপরিবর্ত্তে ২৭শে ফাল্গুন হইবে। আমাদের সংবাদদাতার দোষে এই ভ্রম ঘটিয়াছে।

কুসুমকামিনী স্বীয় দেবরকে তাঁহার বিদ্যালয়-পাঠ্য মেঘনাদবধ কাব্যের কোন্ কোন্ অংশ শিক্ষা দিতেন, আমাদিগকে অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা কেবল একটীমাত্র স্থল দেখাইতেছি;—

"বহিবার কালে, সখী, প্লাবন-পীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে।" ইত্যাদি।

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০৭ সাল, মাঘ। { পঞ্চম সংখ্যা।

নির্দ্দয় জগৎ।

বিজনে বসিয়া ভাবি, জগতে এত নির্দ্দয়তা আসিল কেন? এ জগৎ দয়ার রাজ্য হইল না কেন? জগতের ঈশ্বর যিনি, তিনি তো দয়ার আধার, তবে তিনি স্বয়ং যাহা, তদ্‌রচিত পদার্থে তাহার পূর্ণতা নাই কি কারণে? কেন এ বিভিন্নতা? মনুষ্য তাঁহারই সৃষ্ট জীব! মনুষ্য, মনুষ্যের প্রাণদণ্ড করে কেন? তবে সে আত্মীয়ের হৃৎপিণ্ড ছেদন কেন করে? তবে সে জগতে অনন্ত কোলাহল তুলিয়া, মতের অনৈক্য বাধাইয়া লোক-ক্ষয়-কর সংগ্রাম উপস্থিত করে কেন? জগৎ নরশোণিতে প্লাবিত কেন হয়? অসংখ্য প্রাণিহত্যা করিয়া সংসার শূন্য হয় কেন? সংসার, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাসোপযোগী কেন? সুখের নন্দন-কাননকে দুঃখের মরুভূমি করিয়া তোলে কেন!

শোনা যায়, জগতের আদিকালে মানুষ নিষ্ঠুরতা জানিত না, তখন তাহাদের হৃদয় দয়ার স্বর্গ ছিল। তাহাতে প্রেমের মন্দাকিনী বহিত, প্রীতির প্রস্রবণ ছুটিত। তখন, তাহা স্নেহের সরসী ছিল। করুণার নির্ঝরিণীরূপে তাহা প্রবাহিত হইত। তাহাদের মতের অনৈক্য ছিল না, তাহাদের দ্বন্দ্ব কোলাহল ঘটিত না; তাহারা কপটতা, কুটিলতা, মিথ্যা

প্রবঞ্চনা জানিত না। তাহাদের স্বর্গোপম হৃদয়ে নিষ্ঠুরতা বিন্দুমাত্র ছিল না।

যে মানুষ তখন এইরূপ ছিল, আজ তাহারা এত পরিবর্ত্তিত হইল কেন? তাহাদের মহৎ হৃদয়, আজ নীচতার এমন নিম্নতম কূপে ডুবিল কেন? সে স্বর্গের দেবতা, আজ নর-রাক্ষস সাজিল কেন? যে দেব-দুর্লভ পারিজাত-কুসুম আজ বিষ-পরাগ-রেণু বিকীর্ণ করিতেছে কেন?

প্রকৃতি বৈচিত্র্যবতী! যখন আমরা পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়া মন্দগতি স্রোতস্বতী-তীরে উপনীত হইয়া তাহার নির্ম্মল শীতল সলিল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করি, তখন নদীর স্থির শান্তি-দায়িনী মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা কত আনন্দিত হই! সুনীল নির্ম্মল আকাশে সুমোহন চন্দ্র উদিত হইয়া যখন রজত-কিরণে চারি দিক্ বিধৌত করেন, যখন দক্ষিণানিল, কুসুম-সৌগন্ধ লইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে, কোকিল যখন পঞ্চমে তান উঠায়, তখন মন প্রকৃতির সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া এক অভূতপূর্ব্ব রসে অবগাহন করে! কিন্তু সেই শান্ত-মূর্ত্তি নদী যখন আবার ভীষণ বাত্যায় আন্দোলিত হইয়া খরবেগে প্রবাহিত হয়, উত্তাল সফেন তরঙ্গ-রাশি তুলিয়া ভৈরব কলরব করিতে থাকে, যখন সেই প্রবল তরঙ্গাঘাতে তীর-ভূমি ভীমনাদে খসিয়া নদী-গর্ভ-শায়িনী হয়, তখন নদীর সে মধুর মূর্ত্তি কমনীয় ভাব থাকে না; আবার নিদাঘে যখন সেই নীলাম্বরে নবজলধর-রাশি সাজিয়া উঠে, যখন সেই মেঘ-মালায় তীব্র বিদ্যুল্লতা খেলিতে থাকে, যখন বজ্রের গম্ভীর নির্ঘোষে আকাশ পাতাল মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কম্পিত হইতে থাকে, যখন সেই ভীম বজ্র, শৃঙ্গধর লইয়া সবলে তাহাকে ধরাতলে নিক্ষেপ করিতে থাকে, যখন নিবিড় অন্ধকারে ভীষণ কুজ্ঝটিকায় চরাচর অদৃশ্য হইয়া যায়, ধ্বংসের করাল মূর্ত্তি বিকট বদন বিস্তারিয়া ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিতে আসে, তখন অন্তর, প্রকৃতির সেই নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠে, চক্ষু আপনা হইতে মুদ্রিত হয়। হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে! তখন চক্ষু; পূর্ব্বে যাহা সুন্দর দেখিয়াছিল, তাহা ভয়ানক দেখে। হৃদয় যাহা সদয় ভাবিয়াছিল, তাহা নির্দ্দয় বলিয়া অনুভব করে। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতি বৈচিত্র্যবতী! প্রকৃতির রাজ্যেই সদয় ভাব, আর নির্দ্দয় ভাব!

মানুষ কি তবে স্বভাবের বৈচিত্র্য হইতে নিষ্ঠুরতা শিখিয়াছে? মানুষের রাক্ষসী প্রবৃত্তির জন্মভূমি কি তবে স্বভাবের লীলা-বৈচিত্র্য? মানুষ দেখিল, স্বভাব নিষ্ঠুররূপে স্বভাবকে আক্রমণ করিতেছে! ভীষণ বাত্যা আসিয়া সুন্দর অটবীকে সাগর-গর্ভে নিক্ষেপ করিল! অগাধ সমুদ্র, ভীষণ কূল-প্লাবনে মহাদেশ গ্রাস করিল! আগ্নেয় গিরি, ধন-ধান্য-পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরকে চূর্ণ করিয়া ফেলিল! প্রবল ভূমিকম্পে জনাকীর্ণ দেশ অদৃশ্য হইয়া গেল। এই রূপে স্বভাব, স্বভাবকে আক্রমণ করিতেছে। প্রজা-পীড়ন, আত্মীয়-বিচ্ছেদ, স্বজনের প্রতি নিষ্ঠুরতা, প্রতিবেশীকে নির্য্যাতন, এ সব নৃশংস কার্য্য কি মানুষ, প্রকৃতির মূর্ত্তি-ভেদ বা ভাব-বিপর্য্যয় হইতে শিক্ষা করিতে অভ্যাস করিয়াছে?

সাধারণতঃ জগতে মনুষ্য-মধ্যে দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটী সমাজের পরিচালক, দ্বিতীয়টী, পরিচালিত; প্রথমটী কর্ত্তা, দ্বিতীয়টী অধীন; প্রথমটী সমাজের জীবনী-শক্তি, সমাজের প্রভুত্ব স্বহস্তে রাখিয়া থাকেন; দ্বিতীয়টী সেই শক্তির অধীনে চালিত হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথমটী ধনবান্, দ্বিতীয়টী নির্ধন। এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বড় সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

অবস্থা-ভেদে মানুষের হৃদয় গঠিত হয়। যিনি আশৈশব সুখে লালিত-পালিত, যত্নে পরিবর্দ্ধিত, প্রচুর পানাহারে পরিপুষ্ট, তাঁহার মনের অবস্থা যেরূপ, ঠিক তদ্বিপরীত লোকের (অর্থাৎ যিনি সংসার-ক্ষেত্রে সদা দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, যাঁহার সময়োচিত অভাব কখনও মোচিত হয় না, যিনি সুখ-সচ্ছন্দের লেশমাত্র কখনও পান না, তাঁহার) মনের অবস্থা কখনও সেইরূপ হইতে পারে না! কিরূপে তাহা হইবে? এক জনের সুখ, অপরের অনন্ত দুঃখ। এক জন আজীবন সুখ-সাগরের শান্তিময়ী শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, অনন্ত ভোগ-তৃপ্তির ফোয়ারায় ডুবিয়া রহিয়াছেন; অপরে আজীবন অনন্ত কষ্টের কণ্টকাকীর্ণ কিরীট মাথায় পরিয়া অগ্নির সমুদ্রে জ্বালাময় তরঙ্গে সাঁতার দিয়া মরিতেছেন; সুতরাং উভয়ের মনোভাব যে সম্পূর্ণরূপে পৃথক, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষা-ভেদেও মনুষ্যের মনোভাব বিভিন্নরূপ হয়।

এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে প্রায় মতের অনৈক্য ঘটিয়া থাকে; এই অনৈক্য কখনও সামাজিক, কখনও রাজনৈতিক। এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর কথা গ্রাহ্য করে, এক শ্রেণী যাহা বজায় রাখিতে চায়, অপর শ্রেণী তাহা উঠাইয়া দিতে চায়; এক শ্রেণী যাহা সমাজের পক্ষে হিতকরী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, অপর শ্রেণী তাহাই অহিতকরী প্রতিপন্ন করিয়া থাকে; এক শ্রেণী যাহা চিরাগত সুসংশোধিত প্রথ বলিয়া, সমাজের পক্ষে অতি শুভদায়ক বোধে অপরিবর্ত্তনীয় রাখিতে ইচ্ছা করে, অপর শ্রেণী তাহাই পুরাতন জীর্ণ বোধে পরিত্যাগ করিতে চায়; এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর ঘোর প্রতিবাদ করে। বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে ক্রমশঃ ঘোর বিবাদ-বিসংবাদে পরিণত হয়।

এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে যাহারা দুর্ব্বল-চিত্ত, তাহারাই বিবাদ বাধাইয়া থাকে। অভিমান, ক্রোধ, হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি অসদ্ বৃত্তি এই দুর্ব্বল-চিত্তগণের প্রধান লক্ষণ; এই সব দুষ্প্রবৃত্তি তাহাদের হৃদয়মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া, তাহাদিগকে মনুষ্যনামের অযোগ্য করিয়া তোলে; তাহাদের মনুষ্যত্ব, পশুত্বে পরিণত হয় এবং অবশেষে তাহারা অতি নিষ্ঠুর-হৃদয় ভীষণ রাক্ষস হইয়া বসে; নানা-দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নে তাহাদের সদ্‌বৃত্তি সকল একেবারে লোপ পাইয়া যায়।

ইহারা আপনাদিগকে মহান্ ভাবিয়া থাকে। সদাই স্বীয় মত বজায় রাখিতে চায়; তাহা ভ্রান্ত এবং অমঙ্গলদায়ক হইলেও বজায় রাখিতে চায়, কখনও সংশোধন করিতে চায় না; তাহাদের মতে কেহ দোষ ধরিলে বা ভুল দেখাইলে, ইহারা তাহা স্বীকার করিবে না; অপিচ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইবে। ইহারা অপরের শত ছিদ্র দেখিয়া থাকে, অপরের তিলপ্রমাণ অপরাধকে প্রকাণ্ড করিয়া ধরেন। ইহারা মনুষ্যত্বের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মনুষ্যকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করিতে চাহে। মানসিক দুর্ব্বল বলিয়া ইহারা প্রায়শঃ হিংসাপরায়ণ এবং অভিমান-প্রবণ বলিয়া সদা অহঙ্কার করিয়া থাকে। অপরের সুখ-সৌভাগ্য ইহাদের পক্ষে সামান্যরূপ অহিতকরী না হইলেও ইহারা তাহা দেখিয়া হিংসায় জ্বলিতে থাকে। ইহারা ঘোর স্বার্থপর, নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত আদর্শ; ইহারা মনুষ্যাকারে পশু।

এই দুর্ব্বল-চিত্ত লোকগণের জন্যই জগতে নিষ্ঠুরতার স্রোত প্রবাহিত হয়; তাহার রাক্ষসী-মূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে জগতের লক্ষ লক্ষ জীবকে গ্রাস করিয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ পরিবার, অনন্ত-দুঃখ-সাগরে ভাসিতে থাকে! কত অসংখ্য প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় একবারে লুপ্ত হইয়া যায়। জগতের ইতিহাসে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে; একবার ক্রূর-প্রকৃতি রাজা দুর্য্যোধনের কথা ভাবিয়া দেখ। তিনি বাল্যকাল হইতে ঘোর অভিমানী। আশৈশব তিনি হিংসাবৃত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিলেন; ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কোন্ কার্য্যে সদসৎ, বিবেচনা করিতেন না। অভিমান, হিংসা, প্রভৃতি নানাদুষ্প্রবৃত্তির সংঘর্ষণে তাঁহার হৃদয় অতি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিয়াছিল; তাহাতে স্নেহ কি করুণার লেশমাত্র ছিল না। তাঁহার নৃশংস হৃদয়ের অভিমান ও হিংসা নির্ব্বাপিত করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ। পিতা, পুত্রের বক্ষে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে! পুত্র, পিতার শোণিতে নৃত্য করিতেছে! সুহৃদ্ সুহৃদের হৃৎপিণ্ড ছেদন করিতেছে! গুরু, শিষ্যের দেহ খণ্ড খণ্ড করিতেছে! শিষ্য, গুরুর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে। কুরুক্ষেত্রে শোণিতের অনন্ত প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে! অতি ভীষণ পৈশাচিক দৃশ্য! অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা, অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছে! এই যুদ্ধে দেশের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, বিদ্যা, প্রতিভা, গ্রন্থ—সকলই একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল! ভারতের গৌরব-সূর্য্য চিরাস্তমিত হইল! স্বাধীনতার সৌধে দারুণ বজ্র পতিত হইল!

আর এক দুর্ব্বল-হৃদয় কনোজ-রাজ জয়চাঁদ! এই হিংসা ও অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া দূরদেশ হইতে শত্রু ডাকিয়া আনিয়া জন্মভূমিকে কঠিন অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল! ভারতের সে অধীনতা-পাশ বোধ হয় যুগ-যুগান্তেও ঘুচিবে না।

এই সমাজ-সংহারকগণ ইয়ুরোপ-খণ্ডে চির-অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছে! ইহাদের এক শ্রেণী, অপর শ্রেণীকে ন্যায্য অধিকার দানে সম্পূর্ণ অসম্মত! ইহারা রাজতন্ত্রী-প্রজাতন্ত্রী প্রভৃতি নামে অভিহিত; বহুশত বর্ষ ব্যাপিয়া ইহারা পরস্পরের অধিকার লইয়া মহাকোলাহল করিতেছে অবিরত অনাচার অত্যাচার করিতেছে; অনন্ত-লোক-ক্ষয়-কর ভীষণ যুদ্ধ-

বিগ্রহে লিপ্ত হইতেছে ; দেশকে মরুভূমি করিয়া ফেলিতেছে ! নগরকে ধ্বংস করিতেছে ! স্বজাতীয়ের জীবনকে অতি তুচ্ছ কীট-পতঙ্গের মত নষ্ট করিতেছে ! এত দিনের ভীষণ যুদ্ধামোদে ইহাদের অধিকার এখনও সুন্দররূপে মীমাংসিত হইল না।

ইয়ুরোপের কথা বাদ দিয়া আমাদের দেশের কথা ভাবিয়া দেখিব ! আজ শিক্ষার দোষে আমরাও নিষ্ঠুর হইয়া বসিয়াছি ! আজ শিক্ষার দোষে আমাদেরও হৃদয় নৃশংস পশু-হৃদয়-তুল্য হইয়া পড়িতেছে ! ইংরেজী শিক্ষার প্রখর উত্তাপে আমাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। ইহাতে আমরা ইংরেজী বিদ্যার দোষ দিতেছি না, ইংরেজী শিখিবার রীতি-পদ্ধতিকে দোষ দিতেছি। ইহা আমরা যে ভাবে শিখিতেছি,—তাহাতে ইহা আমাদের মস্তিষ্কে সুরার ন্যায় বিকৃত ফল জন্মাইয়া দিতেছে; বাল্যকাল হইতে স্বদেশীয়-শিক্ষা-বিবর্জ্জিত হইয়া, স্বদেশীয় আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, এবং বিচার-পদ্ধতিতে সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ হইয়া, কেবল বৈদেশিক শিক্ষা কালকূটের ন্যায় উদরস্থ করিতেছি। বৈদেশিক শিক্ষার সুফল, বৈদেশিক সমাজের সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলা, বৈদেশিকগণের দূরদর্শন, তেজ, উদ্যম, স্বজাতিপ্রিয়তা এ সব ভাল শিখিতেছি না ; কিন্তু সেই শিক্ষায় গর্ব্বিত হইয়া, বৈদেশিক সমাজের দুর্নীতি দুর্ব্ব্যবহার, ভীষণ স্বার্থপরতায় শিক্ষিত হইয়া স্বদেশীয় বস্তুমাত্রকেই অবজ্ঞা করিতেছি ! ইহা শিক্ষার দোষ ভিন্ন আর কি বলিব ? আমরা হিন্দুর সন্তান হইয়া হিন্দুর শাস্ত্রকে, হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতিকে অবজ্ঞা করিতেছি ; যাহার স্তন্যপানে আমাদের দেহ পরিপুষ্ট, জীবন বর্দ্ধিত, সেই জন্মভূমির অযথা নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতেছি ; কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখি না, যাহার রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত, যাহার অন্নপানীয়ে আমাদের দেহ পুষ্ট, যাহার জল-বায়ুতে আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই প্রচলিত রীতিনীতি দ্বারা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্ফূর্ত্তি সাধিত হইবে। স্বীকার করি, সব দেশেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ; আমাদের দেশেও যদি সামাজিক কোন পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়, আমাদের দেশ হইতেই তাহা সাধিত হইবে ; বৈদেশিক কোন দ্রব্যে তাহা সাধিত হইবে না। ভারতের চির-গৌরব-স্বরূপ পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ আমাদের জন্য

যে সব সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত সুশিক্ষিত মনস্বিগণের নিকটে সমাদৃত ; কিন্তু হীনবুদ্ধি দুর্ব্বল-চিত্ত আমাদের নিকটে তাহা অনাদৃত ! আমাদের অনাদরে সে সব জগন্মান্য মহর্ষিগণের গৌরবের বিন্দুমাত্র লাঘব হইবে না ; তাঁহাদের যোগবল-সম্ভূত নির্ভুল সত্যবাণীর তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না ; হইবে কেবল আমাদের সর্ব্বনাশ। আমাদের অধঃপতন আরও গভীররূপে ঘটিবে। জগৎপূজ্য আমাদের আর্য্য ঋষিগণকে আমরা অবজ্ঞা করিতেছি দেখিয়া জগতের সকলে আমাদিগকে উপহাস করিতেছে ; আমাদিগকে স্বজাতি-দ্রোহী বলিয়া কত দোষারোপ করিতেছে—আমরা মহাপুরুষগণের অবজ্ঞাকারী বলিয়া আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক বোধে কত নিন্দা করিতেছে !

আমাদের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে এবং তাহা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তাহার কারণ আমরা অশাস্ত্র-বিহিত শিক্ষা বিকৃত করিয়া শিখিতেছি। আমরা এখন উন্নতি উন্নতি করিয়া, অরণ্যে রোদন করিতেছি মাত্র ; আমাদের ঘরের মধ্যে যে মহামূল্য মণি দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। তাহা আমরা একবারও দেখিতেছি না।

আমাদের এই শিক্ষার দোষে এখন আমাদের সমাজে দুইটী শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ; স্বদেশীয় রীতিনীতি আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিতেছেন এবং অপরকে এই মার্গে চালাইতে সাধ্যমতে চেষ্টা করিতে-ছেন। অপর শ্রেণী, শাস্ত্র-বিহিত বিধি-ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া, ইংরেজী শিক্ষায় গর্ব্বিত হইয়া এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়া তাহার অনুসরণ করিতেছেন এবং অপরকে সেই পথে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন ; উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীই যে অভ্রান্ত এবং পরিণামে যে, তাঁহাদেরই জয়লাভ হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। শেষোক্ত শ্রেণী ভ্রান্ত এবং অসত্য মতের পোষকতা করিতেছেন। পরিণামে তাঁহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পরি-ণামের ফলাফল যাহাই হউক, ইহাতে সমাজ-মধ্যে ক্রমাগত বিভিন্ন মতের আবির্ভাব হইতেছে এবং ভয়ানক বৈষম্য উৎপাদন করিতেছে। স্বজাতি-বৈষম্য যে, সমাজের কত দূর অহিতকারী, তাহার উদাহরণ, ইতিহাসে শত শত রহিয়াছে। সমাজ-পতি-গণ এখন হইতে যদি এই সব বৈষম্যের

মূলোচ্ছেদ না করেন, পরিণামে ইহা হইতে সমাজে লোকক্ষয়কর, ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই সামাজিক বৈষম্য লইয়া ইয়ুরোপ নরশোণিতে কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতেও ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানব, তাঁহার উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। তিনি মানবকে শ্রেষ্ঠ করিবার জন্য তাহাকে নানা সদ্‌বৃত্তির অধিকারী করিয়াছেন; এই সব সদ্‌বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ও পরিস্ফুরণের জন্য তিনি মানবের মস্তিষ্কে জ্ঞান ও বিবেক-শক্তি দিয়াছেন। মানব, জ্ঞান ও বিবেকের আজ্ঞাধীন হইয়া কার্য্য করিবে;—সৎ গ্রহণ করিবে, অসৎ পরিত্যাগ করিবে। এই জ্ঞান ও বিবেক, মনুষ্য ব্যতীত আর কাহারও নাই। এই জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে মনুষ্য, আদি-কালে জগতে দয়ার রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল; নির্দ্দয়তা, নিষ্ঠুরতা জগতের অভিধান হইতে উঠাইয়া দিয়াছিল। জগতে অনন্ত সুখ, অনন্ত শক্তির অধিকারী হইয়াছিল,—মর্ত্তভূমি স্বর্গের আদর্শস্থল হইয়াছিল। অধুনা কিন্তু মনুষ্য, জ্ঞান ও বিবেকের অনাদর করিতেছে;—এই অনাদরে মানবের সদ্‌বৃত্তি গুলি ম্লান হইয়া যাইতেছে। মানব এখন অসদ্‌বৃত্তির অভ্যাস ও আলোচনা করিতেছে। এই অসদ্‌বৃত্তির আলোচনায় তাহার মনুষ্যত্ব, পশুত্বে পরিণত হইতেছে; জ্ঞান ও বিবেকের আজ্ঞা না শুনিয়া মনুষ্য এক্ষণে দিন দিন দুর্ব্বল-চিত্ত হইতেছে; অভিমান, হিংসা, ক্রোধ, অহঙ্কার প্রভৃতি নানা অসদ্‌বৃত্তি এখন মনুষ্য-হৃদয়কে বড়ই কলুষিত করিতেছে; এক জন সমস্ত সুখশান্তি ভোগ করিতে চাহিতেছে; অপরকে চির-দাসত্বে নিক্ষেপ করিতে যত্ন পাইতেছে; ইহার ফলে মনুষ্য-সমাজে স্বজাতিপ্রিয়তা, স্বজাতির উপকারেচ্ছা একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। মনুষ্য, নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত আদর্শ হইয়া উঠিতেছে; স্বজাতির ধ্বংসসাধন করিয়া আত্মগরিমা বাড়াইবার জন্য শত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; মনুষ্য হইয়া সিংহ-শার্দ্দূলের ন্যায় ইহাদের প্রবৃত্তি ঘটিয়াছে। মনুষ্য এখনও যদি হিংসা, অভিমান, পরশ্রী-কাতরতা, বৃথা আত্মসম্মান পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে না দেখেন, পরস্পরের অধিকার, কর্ত্তব্য সহজে মিটাইয়া না লয়েন, তাহা হইলে অতি শীঘ্র জগতে এরূপ ভীষণ বিপ্লবানল গর্জ্জিয়া উঠিবে, যাহাতে কোটী কোটী প্রাণী সামান্য কীট-পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া যাইবে।

এই জ্ঞান ও বিবেকের ফলে মনুষ্যের সংযম-শিক্ষা হয়। এই সংযম-শিক্ষার জন্যই পূজ্যপাদ আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান ও বিবেকের অত্যধিক অনুশীলন করিতেন। এই সংযম-শিক্ষা, ভারতের সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছে; মূর্খ আমরা এই শিক্ষা দূরে ফেলিয়া, যে শিক্ষায় অহঙ্কার, গর্ব্ব শিক্ষা দেয়, তাহারই জন্য লালায়িত হইয়াছি; যাহাতে চিত্তের সুস্থতা হয়, হৃদয় সমজ্ঞান শিক্ষা পায়, সে শিক্ষাকে অনাদর করিয়া যাহাতে চিত্ত অসুস্থ হয়, হৃদয়ে ভেদজ্ঞান আসে, সেই শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি;—অমৃতের সরোবর ছাড়িয়া বিষহ্রদে ঝাঁপ দিতেছি!

সংযম-শিক্ষার ফলে মনুষ্য সামঞ্জস্য-নীতি বুঝিতে পারে। জগৎ-রাজ্য-রক্ষণ ও পালনের জন্য জগদীশ্বর এই সামঞ্জস্য নীতির সৃষ্টি করিয়াছেন; স্বভাবের রাজ্য, একটু ভাল করিয়া দেখিলে, এই সামঞ্জস্যনীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্য, নৈদাঘ-সূর্য্য-তাপিত হইয়া যখন অনন্ত ক্লেশ সহ্য করে হিমকর-শালিনী রজনী তখনই সমাগতা হইয়া তাহাদের কষ্টের অপনোদন করে; নিরবচ্ছিন্ন শীতপাতে বৃক্ষ-লতা-বীজ মনুষ্য সঙ্কুচিত এবং মৃত হয় বলিয়া, স্বভাবের রাজ্যে প্রচুর উত্তাপ, সেই সকলকে জীবিত এবং তাহাদের উৎপাদিকা-শক্তি বর্দ্ধিত করিতেছে; হয়ত্তো কোথাও দূষিত বাষ্প একত্রিত হইয়া, সেখানকার স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু সহসা প্রবল বাত্যা সমুত্থিত হইয়া সে বাষ্পরাশি বিনষ্ট করিল—লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবন রক্ষা হইল; কোথাও হয় তো দেশব্যাপক ব্যাধির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, কিন্তু জলপ্লাবিত হইয়া সে দেশ, ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত, উল্কাপাত প্রকৃতির এই সব লীলা-বৈচিত্র্য, এ সকলের মর্ম্ম, ইহার যথার্থ তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি, আর নাই পারি, কিন্তু এ সকল যে, সামঞ্জস্যনীতির ফল, পরম করুণাময় জগৎস্রষ্টার মঙ্গলময়ী নীতির বিকাশ, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

এই সামঞ্জস্যনীতি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যসমাজে রক্ষা করা চাই; তুমি ধনবান্ বলিয়া যে দরিদ্রকে সদা নিগৃহীত করিবে, ধনগর্ব্বিত হইয়া যে তোমার দরিদ্র প্রজাকে কর-ভারে প্রপীড়িত করিবে, তাহাদিগকে কুকুর, শৃগালের ন্যায় ব্যবহার করিবে, তাহা হইবে না; তোমার ধন থাকে, সদ্ব্যব-

হার কর। অসদ্ব্যবহারের জন্য উহা তোমাকে ঈশ্বর দেন নাই; উহা দ্বারা জগতে অনাচার-স্রোত প্রবাহিত হইবে বলিয়া ঈশ্বর উহা তোমার অধিকারে রাখেন নাই; তুমি উহার সাহায্যে স্বীয় সুখ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি কর; কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র্য-মোচনে উদাসীন থাকিও না; তুমি ধনাধিকারী হইয়া কেবলই যে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার-করণে বিরত থাকিবে, তাহা নয়; কেবল যে স্বীয় সুখ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের কষ্টে চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া রাখিবে, তাহা নহে; কিসে তাহাদের দারিদ্র্য-মোচন হয়, কিসে তাহাদের উদর পূরণ হয়, কিসে জগৎ হইতে হাহাকার ধ্বনি দূর হয়, কিসে দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে কোটী কোটী জীব রক্ষা পায়, এ সব চেষ্টা তোমাকে করিতে হইবে; ইহা ব্যতীত দেশের বিদ্যা, শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ উন্নতি-কর কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য তোমায় নিজ-ধন, বিনিয়োগ করিতে হইবে; এই সব কার্য্যে তোমার আপনার সুখ নাই বলিয়া যদি তুমি নিরস্ত হও, তোমাকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। তুমি সামঞ্জস্য-নীতির বিরুদ্ধাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। আর দরিদ্রের উচিত নহে, ধনবানের ধনে হিংসা করা। কাহাকে কোটী-মুদ্রার অধিকারী দেখিয়া দরিদ্রের উচিত নহে, স্বীয় হৃদয় পরশ্রীকাতরতায় পূর্ণ করা। তাহার উচিত, ধনবানের অনুগ্রহ লাভ করা এবং তাহার সেবা করা; ইহাতে দরিদ্রের পদ বা সম্মানের কোন হানি নাই; এ সেবায় ব্যক্তিবিশেষকে সেবা করা হইল না, সমাজকে সেবা করা হইল। ইহাই তাহার কর্ত্তব্য। সকলেরই বোঝা উচিত,—"এ জগতে আমাদের চিরস্থায়ী কোন অধিকার নাই, কিন্তু বিভিন্ন কর্ত্তব্য রহিয়াছে।"

পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি, অবস্থানুসারে মনুষ্যের প্রকৃতি গঠিত হয়, কিন্তু এই অবস্থার উপর আর এক জন কর্ত্তা রহিয়াছেন; তিনি অদৃষ্ট; মনুষ্যের শত সহস্র চেষ্টার উপর অদৃষ্টের অংকুশ প্রভুত্ব। মনুষ্যের উন্নতি, স্থিতি, অবনতি, লয় এই অদৃষ্টের অনুগ্রহে ও নিগ্রহে ঘটিয়া থাকে। এই অদৃষ্ট, আমাদের পূর্ব্ব-অনুষ্ঠিত কর্ম্মফল; ইহা ঐশী শক্তি দ্বারা নিয়মিত। মনুষ্য তিল-মাত্র ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন না; বরং ইহার শাসন, অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলে মনুষ্য সুখী হইতে পারে; অদৃষ্টের শাসন মনুষ্য

করাই সংযম-শিক্ষা; এই শাসন সহিয়া থাকিতে পারিলে, এই সংযম শিক্ষা হইলে মনুষ্য-সমাজে কেহ কাহারও হিংসায় প্রবৃত্ত হয় না; কেহ কাহারও সুখ-সৌভাগ্যে কাতর-হৃদয় হয় না; কেহ কাহারও ন্যায্য অধিকার লোপ করে না।

কাল-বশে এবং শিক্ষার দোষে আজ আমরা এই সংযম-শিক্ষা বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়াছি! অন্ধ, অমূল্য মণিকে পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু ইহাতে মহারত্নের অনাদর হইবে কেন? হতভাগ্য অন্ধ, অমূল্য রত্নকে দেখিতে না পাইয়া যদি তাহা ত্যাগ করে, কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহাকে উঠাইয়া স্বীয় বক্ষে স্থান দিবে না? সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া আমরা নিজ মঙ্গল, চরণে দলিত করিতেছি; কিন্তু তাই দেখিয়া অপরে সে কাজ করিবে কেন? আমরা যে মহানিধির আদর না জানিয়া ত্যাগ করিয়াছি—আজ ইয়ুরোপ ও আমেরিকার উন্নত শিক্ষিতের হৃদয়ে তাহার আসন হইয়াছে; তাঁহারা অতি সমাদর ও শ্রদ্ধার সহিত আমাদের সম্পত্তি-সংগ্রহ করিয়া লইতেছেন; আমরা যাহা মলিন করিয়াছিলাম, তাঁহারা তাহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেছেন—ইহা দেখিয়াও আমাদের এখন শিক্ষা করা উচিত। আমাদের যাহা ছিল, তাহা জগতে কাহার নাই: এখনও যাহা আছে, তাহার কাছে জগতের শিক্ষিত-সম্প্রদায়, মস্তক অবনত করিতেছে। সেই জন্যই বলি, শিক্ষার গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় শিক্ষার অভিমান হৃদয়ে স্থান না দিয়া প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্র হইতে শিক্ষা সংগ্রহ কর। রাজার ভাষা, রাজার বিদ্যা, শিখিতে হয়, শেখ; শেখাও সঙ্গত; কিন্তু তা বলিয়া স্বদেশীয় শিক্ষা অবজ্ঞা করিও না—যদি হৃদয়ের শিক্ষা চাও, যে দেশে জন্মিয়াছ, সেই দেশের শাস্ত্রটী গুরূপদিষ্ট হইয়া শিক্ষা কর; হৃদয়ের শিক্ষা হইলে সামঞ্জস্য-নীতি বুঝিতে পারিবে; সংযম শিক্ষা আপনা হইতেই হইবে।

ভারতের ভাবী মঙ্গলের জন্য ভারত, এক্ষণে যেরূপ বিভিন্ন শিক্ষার সন্ধি-স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মঙ্গলের জন্য সংযম শিক্ষা একান্ত আবশ্যক; শুধু ভারতের জন্য নয়। এই সংযম-শিক্ষা, সমগ্র ভূমণ্ডলের মঙ্গল বিধান করিবে। ইতর, ভদ্র, ধনবান্, দরিদ্র সকলেই এই সংযম-শিক্ষা করুন জগতের সামঞ্জস্য-নীতি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করুন; সকলেই বুঝুক

সুখ-সৌভাগ্য দুঃখ-দারিদ্র্য ব্যক্তিবিশেষের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, শ্রেণী বিশেষ ইহার অধিকারী নহে; ঈশ্বরের সৃষ্ট অমৃত ফলাস্বাদে সকলের সমান অধিকার। এই সংযম-শিক্ষা হইলে দুঃখ দারিদ্র্যও তখন মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর হইবে না; মনুষ্যের হৃদয়-বল বাড়িবে,দুঃখ দারিদ্র্য তখন স্বকর্ম্মের ফল ভোগ বলিয়া হৃষ্টচিত্তে তাহার কঠোর শাসনে বশীভূত হইবে। এই সংযম-শিক্ষা হইলে ধনবানের স্তূপীকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে; তখন তাহা শিষ্টের পালনে এবং দুষ্টের দমনে বিনিয়োগ হইবে; জগতের অন্নকষ্ট, হাহাকার নিবারণে সমর্থ হইবে; এই সংযম-শিক্ষা হইলে মনুষ্যের সশস্ত্র শিবির, অন্ধ,খঞ্জ, বধির আতুরের আবাস নিকেতন হইবে; সমরাভিমুখী-অসংখ্য সৈন্যের জীবন রক্ষা হইবে; অসংখ্য পরিবার পিতা-পুত্রহীন হইবে না; অসংখ্য জনক জননীর করুণ বিলাপে জগৎ পূর্ণ হইবে না; জগতে রক্তের নদী বহিবে না; নরকের আগুণ জ্বলিবে না—জগৎ ভয়ানক এবং বীভৎস মহা শ্মশানে পরিণত হইবে না। এই সংযম-শিক্ষা হইলে জগতে মনুষ্য মাত্রেই পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে—প্রত্যেক হৃদয়েই অমৃত-পয়োধি উথলিয়া উঠিবে; মানব-হৃদয় দয়ার সাগর হইবে; তখন মতের অনৈক্য ঘটিবে না; নিষ্ঠুরতার বিন্দুমাত্র থাকিবে না; তখন জগতের একটী ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে একটু সামান্য আঘাত লাগিলে সকলেই ব্যথিত-হৃদয় হইবে, সকলেই সাহানুভূতি প্রকাশ করিবে; জগতের এ ভয়ানক, নয়ন-ক্লেশকর দৃশ্য বিদূরিত হইবে; জগত এ নিষ্ঠুর দৈত্য দানবের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থতার নরক ভূমি হইতে যথার্থ মনুষ্যের-দেবতার স্বর্গোপম সৎকর্ম্মের সাধন ভূমিতে পরিণত হইবে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

আশার সুসার নাই ।

(১)

সুনীল আকাশে, রাকা-শশী হাসে,
ঝরে অবিরত সুধা ।
উড়িয়ে উড়িয়ে, সেই সুধা পিয়ে,
চকোর মিটায় ক্ষুধা ॥
মনের হরষে, হাসি-ভরা ধরা,
মেখেছে জোছনা গায় ।
সরসীর বুকে, মলয়-তাড়নে,
রূপের তরঙ্গ ধায় ॥
তরঙ্গে তরঙ্গে, মলয়ের সঙ্গে,
চাঁদের কতই খেলা ।
তরঙ্গে তরঙ্গে, চাঁদ ছুটাছুটি,
শতেক চাঁদের মেলা ॥
মলয়-পরশে, ছোট ছোট কলি,
ফুটিয়া উঠিছে কত ।
নয়ন ভরিয়ে, সুষমা নেহারি,
পাইলে নয়ন শত ॥

(২)

পূরব গগনে, 'রাঙা-রবি-ছবি,
উজল সোনার থালি ।
সাজাতে ধরায় সোনার কিরণ,
দিতেছে কতই ঢালি' ॥
সোনা-মাখা গাছ, সোনা মাখা পাখী
বসি' সোনা-মাখা ডালে ।

সুমধুর স্বরে লহরী তুলিয়ে,
শ্রবণে পীযূষ ঢালে ॥
জলেতে কমল স্থলে ফুল-দল,
হাসিয়ে বিভোর সবে।
এ চারু সুষমা বলিব কেমনে,
আর কত ক্ষণ রবে ॥

(৩)

ওই ওই দেখ, ওই কাল মেঘ,
আকাশের কোণে উঠে।
বড় ক্রোধ-ভরে, ছাইতে গগন,
আসিতেছে যেন ছুটে ॥
থাকিয়ে থাকিয়ে, হানিছে চিকুর,
নয়ন ধাঁধিয়ে যায়।
গভীর শবদে, বজর ডাকিছে,
বধির শ্রবণ তায় ॥
উজল তপন, হ'ল অদর্শন,
আঁধার অম্বর-তল।
প্রকৃতি স্তম্ভিত, সবে চমকিত,
বর্ষিল জলদ-দল ॥

(৪)

জননীর কোলে, সুকুমার ছেলে,
বড়ই মধুর হাসে।
সে হাসি নিরখি' মায়ের পরাণ,
সুখের সাগরে ভাসে ॥
দিন কত পরে যমের ডাকনে,
সে ছেলে চলিয়া যায়।
শূন্য কোলে মাতা কেঁদে গড়াগড়ি,
আপনি মরিতে চায় ॥

বড় দুখে আজ ভাবি মনে মনে,
কালি বুঝি সুখী হব।
বড় সুখে আজি ভাবি মনে মনে,
চির দিন সুখে রব॥

(৫)

এত আশা করে' সাজানু দোকান,
কি মুনফা পেনু তায়।
এত আশা করে' বেচা-কেনা করে'
লাভে মূলে বুঝি যায়॥
এত আশা করে' নানা ফুল তুলে'
গাঁথিনু সাধের মালা।
এত আশা করে' পরিনু গলায়,
ছিড়ে' গেল এ কি জ্বালা॥
তবে আর কেন, মিছে আশা করি,
মিছে আশা-পথ চাই।
আশার আশায়, বসে' আছি শুধু,
আশার সুসার নাই॥

শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল।

বংশাবলী।
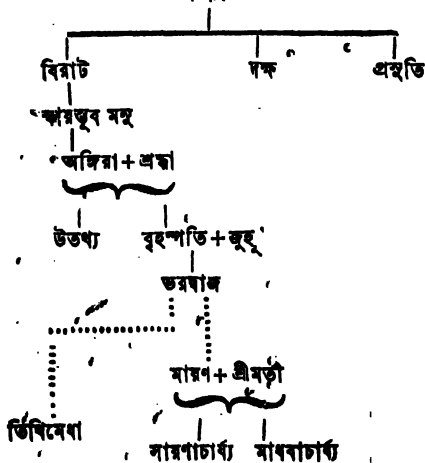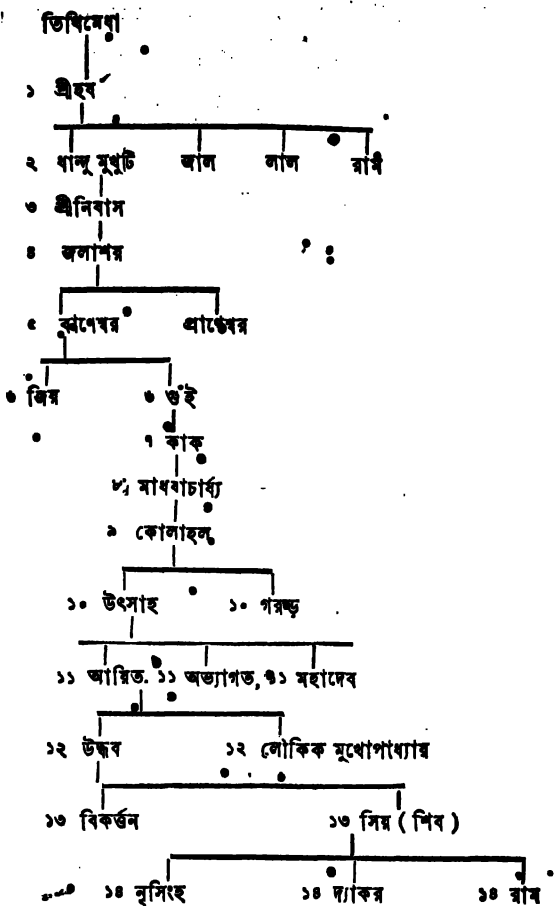
ব্রহ্মা।

হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মা, এই দৃশ্যমান্ বিশ্বচরাচর সৃষ্টির আদি। খৃষ্টানগণের মতে আডাম পৃথিবীর আদি পুরুষ। ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন সনৎকুমার প্রভৃতি ৪ জন মানস-পুত্র উৎপন্ন হন। এতদ্ভিন্ন বিরাট, দক্ষ, প্রহুতি. মরীচি প্রভৃতি তাঁহার অপরাপর সন্তান।

বিরাট ও স্বায়ম্ভুব মনু।—ব্রহ্মার তনয় বিরাট। বিরাটের তনয় স্বায়ম্ভুব

মনু। মনুর পিতামহ বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মার অপর নাম পিতামহ। কিন্তু সকল মতে বিরাটের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। সুতরাং কোন কোন মতে মনু, ব্রহ্মার পুত্র। মনুর প্রিয়তমা ভার্য্যা শতরূপা। হিন্দুগণ এই দম্পতির নানাবিধ গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

অঙ্গিরা ও শ্রদ্ধা।

অঙ্গিরা স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। মতান্তরে ইনি ব্রহ্মার তনয়। অঙ্গিরা ঋষি, দেবহূতির গর্ভজাতা কর্দম মুনির তৃতীয়া কন্যা শ্রদ্ধার পাণিগ্রহণ করেন। অঙ্গিরা ও তদ্বংশীয়গণ এতদ্দেশে অগ্নির আরাধনা প্রচলিত করেন; ইহার প্রমাণ বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঘোর ঋষি এতদ্বংশ-সম্ভূত। বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী, শ্রদ্ধার অষ্টমা ভগিনী। অঙ্গিরার ২ দুই সন্তান ও ৪ চারি কন্যা। অগ্রজ উতথ্য ও অনুজ বৃহস্পতি। কুহু, রাকা, সিনীবালী ও অনুমতি তাঁহার ৪ চারি কন্যা। অঙ্গিরার অন্য কন্যার নাম শশ্বতী। তিনি শ্রদ্ধার গর্ভজাতা কি না তৎ-সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে। ঋগ্বেদ-সংহিতার অষ্টম মণ্ডলে দ্বিতীয় সূক্তের চৌত্রিশ ঋকে তাঁহার বিরচিত মন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উতথ্য, বৃহস্পতি ও জুহূ।

উতথ্য, অঙ্গিরা ঋষির অগ্রজ তনয়, বৃহস্পতি অনুজ। বৃহস্পতি, হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও উদার-মত-সম্পন্ন বলিয়া খ্যাত। তাঁহার রচিত একখানি স্মৃতি-গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। ইনি জুহূকে বিবাহ করেন। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় অল্প লোকেই যুক্তি-তর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন, অর্থাৎ অধিক লোকে তাঁহার ন্যায় উদার মত অবলম্বন করেন নাই।

ভরদ্বাজ।

ইনি বৃহস্পতির ঔরসে, তদীয় অগ্রজ উতথ্যের সহধর্ম্মিণী মমতার গর্ভে জাত। ইহাঁর সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে যে, পুত্র না হওয়ায় উতথ্য, সোম যাগ করেন। তাহাতে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন। ক্রমে মমতা গর্ভবতী হন। বৃহস্পতি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া তাঁহার সহিত কুব্যবহার করেন। মমতার গর্ভস্থ শিশু ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ বীর্য্য

পদ দ্বারা নিক্ষেপ করেন। ত্যক্ত বীর্য্য হইতে ভরদ্বাজ জন্ম পরিগ্রহ করেন। বৃহস্পতির ঔরসজাত ও মমতার গর্ভোৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নাম "দ্বাজ"। আর উতথ্য তাঁহাকে পোষণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইল "ভরদ্বাজ"। ভরদ্বাজ সদ্বিদ্বান্ ছিলেন। ইহাঁর নাম হইতে ভারদ্বাজ গোত্র হইয়াছে। এই গোত্রে মায়ণের উৎপত্তি। মায়ণ, শ্রীমতীকে বিবাহ করেন।

সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য।

মায়ণ ও শ্রীমতী অতি সৌভাগ্যসম্পন্ন দম্পতী ছিলেন। শ্রীমতীর গর্ভে বেদের সুবিখ্যাত টীকাকারদ্বয় সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরে হরিহর ও বুক নৃপদ্বয়ের সভাসদ্ ছিলেন। এখনও মাধবাচার্য্য-বিরচিত পুস্তকাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে পম্পা-নামক গ্রাম অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তিনি উক্ত স্থানে অবস্থিতি করিতেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

বিদায়।

যাও, তবে যাও ;
ভেঙেছে ঘুমের ঘোর, ছিঁড়েছে প্রেমের ডোর,
শূন্য আজি পূর্ণ হৃদিতল ;
আকুল উদাস প্রাণ, চাহিতেছে পরিত্রাণ,
তাই খোঁজ বিদায়ের ছল ;
সুখে কিম্বা দুঃখে যাহা বলিতে পার নি, তাহা
এক দিনে আনিতেছ মুখে ;
ভেবেছ কি কভু সখা ! বাক্য তব রোষ-মাখা,
প্রদানিছে কি যাতনা বুকে ;
যাতনায় নিরাশায়, অশ্রু-জল বহে যায়,
ভ্রমেও না চাহ এর পানে ;

দুই দিন আগে যদি এমনি বহিত নদী,
কতই লাগিত তব প্রাণে;
বাক্য আগে ছিল সুর, দৃষ্টি ছিল সুমধুর,
এবে তাহা শুধু জ্বালাতন;
জীবনে বিরক্ত হয়ে' প্রাণের প্রতিমা লয়ে'
আজি তাই দাও বিসর্জ্জন;
আমি রব এই ধারে, তুমি যাবে পর-পারে,
মাঝে রবে বিস্মৃতি-সাগর;
তুলি' উচ্চ বীচিমালা, গাহিবে সারাটী বেলা,
প্রেম-পরিণাম ধরা'পর;
ভুলে'ও কি এক বার, মনে করিবে না আর,
অশ্রুসিক্ত এই মুখ-খানি;
সংসার-বিপনি-মাঝে, সাজিয়া নবীন সাজে,
মুছে দিবে এই আত্মগ্লানি;
ক্ষণেকের নিরাশায়, ভুলিয়া কি গেলে হায়,
জীবনের এত ভালবাসা;
বারেক বিফল হয়ে' ব্যাকুল হতাশ প্রাণে,
ত্যজিতেছ প্রিয়তম আশা;
প্রেমপূর্ণ এ অন্তরে, চরণে দলিত করে'
ইচ্ছা যদি, যাও তবে যাও;
ভগ্ন এই হৃদিতলে, দিতেছ গৈরিক ঢেলে'
তাই ভাল, দাও তবে দাও;
জীবনের আবর্ত্তনে, যদি কভু পড়ে মনে,
অভাগীর ক্ষীণ-কণ্ঠস্বর;
রোগীর প্রলাপ বলে' দূরে তারে দিও ফেলে'
সুখী হ'ক তোমার অন্তর;
আঁখি-প্রান্তে যদি আর, নাহি বহে অশ্রুধার,
মনে রেখো নামটি তাহার;

ফেলিয়া যেতেছ যারে, সেও তো করিতে পারে,
তুচ্ছ তব কোন উপকার।

শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত।

আমাদের ভ্রমণ।

একবার বড়দিনের ছুটীতে আমরা ভ্রমণে নির্গত হইয়াছিলাম। 'অণ্ডাল'* ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া উখ্ড়া গ্রামে সদাশয় জমিদারগণের আবাসে আতিথ্য গ্রহণ করি। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, এখানকার বৃত্তান্ত লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাই কিছু লিখিত হইল।

ইংরেজেরা যে সকল পল্লীগ্রামের বর্ণন করেন নাই, তাহার মধ্যে যে বর্ণনীয় গ্রাম নাই, এমন নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-পাঠে পাঠকের প্রতীতি জন্মিবে, আমরা যাহা বলিলাম, তাহা ঠিক্ কি না।

উখড়া গ্রাম, তন্ত্র-মতে দক্ষিণ আম্নায়। ইহার প্রায় চারি দিকেই দেব-দেবী অবস্থিত। ভক্ত কবি জয়দেবের লীলাস্থলী কেন্দুবিল্ব এখানকার অনতিদূরবর্ত্তী। উখ্ড়া বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় ভাবে পূর্ণ। অস্থল (মোহন্ত দিগের মঠ) বৈষ্ণব তন্ত্রের পরিচায়ক। প্রেমপুরীর কালী—তান্ত্রিক মতের ঘোষণা করিতেছে। এখন যথায় অস্থল দণ্ডায়মান থাকিয়া শোভমান হইতেছে, তাহা প্রাচীন সময়ে জঙ্গলাকীর্ণ কণ্টকময় শ্বাপদ-সঙ্কুল স্থল ছিল, এ কথা না নির্দ্দেশ করিলেও অনেকে যৌক্তিক কল্পনা-যোগে তাহা অনুমান করিতে পারেন।

গ্রামে যে তিনটি কালীমূর্ত্তি দৃশ্যমান হইয়া থাকেন, তন্মধ্যে 'বামাকালী' প্রেমপুরীর স্থাপিত। ঐ দেবী "ভয়ঙ্করী" সংজ্ঞায় পরিচিত বা প্রখ্যাত। কুঞ্জবিহারী বর্ম্মন্, প্রেমপুরীর নিকট হইতে ঐ দেবী প্রাপ্ত হন। কুঞ্জবিহারী ঐ দেবীর অধিকারী। পাঁড়েরা উহার পূজারী। প্রেমপুরী ইহার পরে গ্রামের উত্তরে গিয়া আপন যোগাসন-স্থান নিরূপণ করিয়া লন ও তথায় তান্ত্রিক-মতোক্ত বামাচারে সিদ্ধ হন।

---

* "অণ্ডাল" ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অন্যতম ষ্টেশন।

এখানে কালক্রমানুসারে অত্রত্য অধিবাসি-বৃন্দের তালিকা দিলাম। তাহাতে পাঠক, সহজ অনুধাবন করিতে পারিবেন, কোন্ পরিবার কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী।

ক। কামারগণ	ঘ। কনোজী ব্রাহ্মণগণ
খ। রায়গণ	ঙ। জমিদার-গোষ্ঠী
গ। চট্টোপাধ্যায়গণ	চ। নয়ন তর্কভূষণ-গোষ্ঠী

এখানে যত গুলি মন্দির আছে, প্রথমতঃ সে গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে।

(১) গোপাল-মন্দির—১৬২১ শকে + নির্ম্মিত হয়। ইহা রায়-গণের অধিকৃত। যাঁহারা 'রায়' খ্যাতিতে পরিচিত, তাঁহাদের উপাধি ছিল বক্সী। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির।

(২) দোলমঞ্চ—১৬২১ শাকে (১১০৬ সালে) প্রতিষ্ঠিত। ইহাও রায়গণের সম্পত্তি।

(৩) বিষ্ণু-মন্দির—১৬৫৮ শাকে (১১৪৩ সালে) প্রতিষ্ঠিত। কেবলরামের অধস্তন সপ্তম পুরুষ এখন জীবিত আছেন। তালিকা এই,—

১। কেবলরাম চট্টোপাধ্যায়
|
২। জগন্মোহন
|
৩। রামরতন
|
৪। রাধাই
|
৫। গোপাল
|
৬। কালিদাস
|
৭। ভোলানাথ

কেবলরামই উক্ত মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কেবলরামের পৌত্র রতন নামেই খ্যাত। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম রামরতন। ইহাকে শুদ্ধ করিলে রামরত্ন বলিতে হয়। চতুর্থ পুরুষ রাধাই। সাধারণ লোকে তাঁহাকে ঐ নামেই ডাকিত। তাঁহার প্রকৃত নাম বোধ হয় রাধামোহন হইবে।

(৪) শিবালয়—১১৯৩ সালে কেবলরামের পুত্র জগন্মোহন কর্ত্তৃক স্থাপিত।

(৫) চাটুয্যে পুকুর—১২২০ সালে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে খনিত

+ ১১০৬ সালে।

হইয়াছিল। ইহার উপর যে শিবালয় বিদ্যমান, তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ১২২০ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণে সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত মন্দির-গাত্রে এই শ্লোক লিখিত আছে,—

"সন্তবে প্রদদে বেশ্ম জগন্মোহনশর্ম্মণা।
শাকেহভীষ্ট-কু-মিতে বাঞ্ছারাম-বিনির্ম্মিতা॥"

এই সরোবরের সলিল সুনির্ম্মল। এখানে যে মোহন্তের অস্থল রহিয়াছে, তাহার সন্ন্যাসীরা এই জলাশয়ের জল ব্যবহার করেন। পুষ্করিণীতে বাহিরের জল প্রবিষ্ট হইবার পথ আছে, কিন্তু জল-নির্গমের জন্য কোন উপায় নাই; সেই জন্য ইহার জল অস্বাস্থ্যকর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

৬। শ্যামরায়ের মন্দির।—১৫৯৩ শাকে (১৭০৮ সালে) কপূর উপাধিধারী ঘনশ্যাম নামক এক ব্যক্তি ইহার স্থাপনা করেন। ইহা 'সুখো' নামক প্রকাণ্ড সরোবরের পূর্ব্ব ঘাটে প্রতিষ্ঠিত। "সুখো" এখন জমিদার মহাশয়-গণের অধিকার-ভুক্ত। এই ঘনশ্যাম কে, তাহার বিস্তারিত বা প্রামাণিক বিবরণ পাইবার উপায় নাই। সুতরাং ধারাবাহিক বংশ-বর্ণনা বা অপরাপর বৃত্তান্ত পাইবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, অজ্ঞাত-নামা কোন অধিকারী উপাধিধারী ঐ দেবতার প্রধান পূজারী ছিলেন। বিদিত হওয়া গিয়াছে, দেব-প্রতিষ্ঠাতা ঘনশ্যাম কপূর অধিকারী উপাধি-ধারীর হস্তেই উহার পূজার্চ্চনার ভার দিয়াছিলেন।

কর্ম্মকার, কনোজ ব্রাহ্মণ, রায় ও অত্রত্য জমীদার—এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। কর্ম্মকারগণ গ্রামের আদিম-নিবাসী। ইহা ভালই কথা। কর্ম্মকারগণ যদি অগ্রে বসতি না করিত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের কেই বা আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত? এই জন্যই জ্ঞানময়ী প্রকৃতির অভিপ্রায়ে এস্থানটী, কর্ম্মকারগণের প্রথম আবাস-ভূমি হইয়াছিল।

এখানকার জমীদারগণের উপাধি "হাণ্ডে।" ইহাঁরা জাতিতে ক্ষত্রিয়। ইহাঁদের যত্নে এখানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বাস হইয়াছিল। কেবলরাম সিংহ, ইহাঁদের আদি পুরুষ। তিনি লাহোর হইতে মুর্শিদাবাদে সমাগত হন। তিনি ও তাঁহার পুত্র রামচাঁদ, পিতা-পুত্রে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন। রামচাঁদের পুত্র মেহেরচাঁদ ১০৬২ সালে উথড়ায় বাস করেন। মেহেরচাঁদের পুত্র

বক্তার সিংহ, কন্যা বিষণকুমারী। ইহারা দুই ভ্রাতা ও ভগ্নীতে মিলিয়া উভয়ের দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

"বান্ধবের" প্রসিদ্ধ সম্পাদক বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

পাঠক! উপরে যে মহাপ্রতিভাশীল সৌম-মূর্ত্তির নাম দেখিতেছেন, তিনি কে, এ কথা কোন শিক্ষিত বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়া দিতে হয় না। কিন্তু যে পাঠ্য-নির্দ্ধারণ-সমিতির গুণগ্রাহিতার অভাবে ও অর্ব্বাচীনতায় আজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্তঃসার-হীন রাশি রাশি উপাধি-জঞ্জাল জড়ীভূত হইতেছে," যে শিক্ষা-সদস্যগণের সম্বন্ধপরা নীতির প্রসাদে আজ সরকার মহাশয় মুহুরী বাবু—সকলেই বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকের গ্রন্থকার—সেই পাঠ্য-নির্দ্ধারণ-সমিতির, সেই সম্বন্ধপরা নীতির প্রভাবেই আজ-কাল বিদ্যালয়ের পল্লবগ্রাহী ছাত্র-সম্প্রদায়ের নিকটে বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শ্রদ্ধাভাজন ঘোষ মহাশয়ের লেখনীর নিকট বঙ্গভাষা বহুপরিমাণে ঋণী। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পরে বঙ্গভাষা, যৎকালে অন্তঃপুর-বিলাসিনী পাচিকা রসিকা কুটিল কটাক্ষ-তাড়নে নিপীড়িতা হইতেছিলেন, তৎকালে কালীপ্রসন্ন আপনার কোমল-কঠোর কর-প্রসারণে ভাষা-জননীর যাতনা-ভার দূর করিতে বদ্ধ-পরিকর হন। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে তিনি বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বাস্তবিক স্বজাতি-ভাষার কৃতী সেবক বাবু কালীপ্রসন্নের গ্রন্থাবলী, যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন, অধিকারী হইলে, তিনি তাঁহার প্রতি-পুস্তকের প্রতি-শব্দে মোহিত হইয়াছেন। কি শব্দ-যোজনার মাধুর্য্য, কি ভাব-নিচয়ের গাম্ভীর্য্য, কি বিষয়-নির্ব্বাচনের ঔদার্য্য, প্রত্যেক বিষয়ে "প্রভাত-চিন্তা" "নিভৃত-চিন্তা" "ভ্রান্তি-বিনোদ" বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য কোহিনুর। যিনি দর্শনের দুজ্ঞের্য় তত্ত্ব-নিচয়ে কাব্যের মধুরিমা ঢালিয়া দিয়াছেন, যিনি অহরহঃ বিষয়-বিপণির গুরু-ভার মস্তকে লইয়া

আজিও স্বদেশীয় ভাষার উন্নতি-কল্পে অতুল অধ্যবসায়ে ও অদম্য উৎসাহে নিযুক্ত, আজি কোন কোন বঙ্গ-কুল-ধুরন্ধর, তাঁহারই প্রতিকূলে অলক্ষ্যে নিন্দা করিতে উদ্যত। পাঠক! মনে রাখিবেন, যে দেশের কবি গাহিয়াছিলেন— "ছেদ্যং চন্দন-চূত-চম্পকবনং রক্ষা চ সাকোটকে"—এ সেই দেশ। যে দেশের কবি গাহিয়াছিলেন,—"হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণে কাকে চ বহ্বাদরঃ" এ সেই দেশ। যে দেশের কবি গাহিয়াছিলেন,—"মাতঙ্গে তুরগে খরে চ সমতা কর্পূর-কার্পাসয়োঃ"—এ সেই দেশ। যে দেশের কবি দুঃখে, মর্ম্ম-পীড়ায় অবশেষে বলিয়া গিয়াছেন—"এষা যত্র বিচারণা গুণিগণাঃ দেশায় তস্মৈ নমঃ"—এ সেই দেশ। সুতরাং এ দেশে কালীপ্রসন্নের ন্যায় প্রতিভা-বান্ লোকের এরূপ পুরস্কার প্রাপ্তি অসম্ভব বা আশ্চর্য্যজনক নয়।

বিগত ২৮শে পৌষের "সময়" পত্রে র, ম, চক্রবর্ত্তী কালী বাবুর প্রভাত-চিন্তা পাঠ করিয়া তাহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। ইহারই নাম "বাঙ্গালীর প্রতিদান"।

র, ম, লিখিয়াছেন—

কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রভাতচিন্তার "জীবনের ভার"-শীর্ষক প্রবন্ধ, ইংরাজী 'ওয়ান্স এ উঈক'* নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত 'উয়েরি অব্ ব্রেথ্' † নামক প্রবন্ধের অনুবাদ। র,ম, স্পষ্টতঃ অনুবাদ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও, তাঁহার লিখন-ভঙ্গী দ্বারা এটী স্পষ্টতঃই বুঝাইতেছে। আমরা বহু অনুসন্ধানেও উক্ত ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকা খানি পাইলাম না, সুতরাং উহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি না। দুই দেশের দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তির চিন্তাস্রোত একই পথে প্রবাহিত হইতে পারে না, এ কথা র, ম, কিসে বুঝিলেন? যাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকের কল্পনা-নেত্রে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ঠিক্ সেই ভাব, এদেশের কোন ভাবুকের জ্ঞান-পথে উদ্ভাসিত হইতে পারে না কি? যাঁহারা ভাস্করা-চার্য্যের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, মাধ্যাকর্ষণ-আবিষ্কারের প্রশংসা একমাত্র নিউটনের প্রাপ্য নয়। তাই বলিয়া কি ইয়ুরোপ খণ্ড নিউটনকে অনুকারক বলিবে? র, ম, ছোকরা কি প্রবীণ জানি না;

* Once a Week.

† Weary of breath.

কিন্তু এই উপায়ে দেশের কোন প্রতিভাবান্ লেখকের গৌরব নষ্ট করিতে গিয়া তিনি যে বালকত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ধ্রুব নিশ্চিত।

দার্শনিক বিষয়ে সত্যতা-প্রতিপাদনের প্রধান অবলম্বন যুক্তি। "জীবনের ভার" প্রবন্ধটীর উপপত্তি-ভাগের উপর যে যে যুক্তির বলে দোষারোপ করা হইয়াছে, সেগুলি লেখকের নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। লেখক, যে যুক্তির বলে কালী বাবুর উপর দোষারোপ করিয়াছেন, আমরা সেই যুক্তি দ্বারাই দেখাইতে পারি, কালীপ্রসন্নের সিদ্ধান্ত সমীচীন ও এই দোষালোচক মহাশয় অদূরদর্শী।

প্রভাতচিন্তায় আছে,—আলস্য ও লক্ষ্যভ্রংশত্ব হইতে জীবনের ভারের উৎপত্তি। অর্থাৎ যাঁহার জীবনভার বলিয়া বোধ হইবে, তিনি অলস অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট। সমালোচক তাঁহার অদ্ভুত দার্শনিক গতিতে ইহাকে যে ভাবে পদ-দলিত করিয়াছেন, দেখুন :—

"দেখিয়াছি অনেক ধনি-সন্তান যৌবনের প্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সংসারের কোন কার্য্য না করিয়া অলসভাবে কেবল বিলাস-লীলার তরল স্রোতে দেহতরী ভাসাইয়া দিয়া চিত্তের সুখে সময় কর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। জীবন তাঁহাদের নিকট ভার বলিয়া বোধ হয় নাই। * * * অবশেষে শেষের সে দিনে দুর্জ্জয় মৃত্যু যখন করাল কঠিন ক্রূর হস্তে সংসারের সমস্ত ভোগ-সুখের কোমল অঙ্ক হইতে ইহাদিগকে কাড়িয়া লইতে উপস্থিত হইল, এমন যে অলস জীবন, তাহাও ভারবোধ না হইয়া, অতীব প্রিয়তম জ্ঞানে উহারা কাঁদিয়া আকুল হইল।"

প্রতিবাদক বলিতেছেন, অলস অথচ বিলাসে মত্ত মানব, মৃত্যুকালে তাহার জীবনকে সুখময় ভাবিয়া উহার বিরহ-ভাবনায় ক্রন্দন করিয়া থাকে। লেখক মহাশয় এ কথা কিসে বুঝিলেন? এরূপ স্থলে জীবনের আলস্য ও লক্ষ্যভ্রংশ-জনিত-গুরুভার-বহন করিতে অসমর্থ হইয়াই যে মৃত্যুশয্যায় শয়িত ব্যক্তি, রোদন করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? যদি না হয়, তাহা হইলে জগতে পাপপুণ্য বলিয়া কোন কথা থাকে কি? কুকার্য্য—অকার্য্য করিয়াও, যদি আজীবন সুখভোগেই অতিবাহিত হইল, মৃত্যুকালেও যদি দুষ্কৃতিভারে জীবন ভারাক্রান্ত না হইল, তবে পাপপুণ্য রহিল কোথায়? কার্য্য-মাত্রেরই ফল

আছে। আলস্য ও লক্ষ্যভ্রংশতা-রূপ কুকার্য্যের ফল কি সুখ, মৃত্যু? এ বিষয়ে লেখক মেয়ে-মহলে গিয়াও একটা উপদেশ পাইতে পারেন;—

"কার্য্যের সাক্ষী স্মরণ।
পুণ্যের সাক্ষী মরণ।

এ কথা মেয়েরাও অহরহঃ বলিয়া থাকে।

বলিতে পার, মুমূর্ষুর দুষ্কৃতি-যাতনা অনুশোচনা; কিন্তু ইহাকে অনুশোচনাই বল, আর পাপের প্রায়শ্চিত্তই বল, ইহার উপাদান কি সেই আলস্য বা লক্ষ্যভ্রংশতা নহে? ইহাতে জীবন কি এক বিষম ভার বলিয়া বোধ হয় না?

র, ম আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য আরও কতকগুলি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, দুষ্কর্ম্মনিরত মাধাই, নরহন্তা তুলসীদাস, লম্পট শিহ্লণ প্রভৃতি সকলেই যৌবনের প্রদোষে ও প্রভাতে লক্ষ্যভ্রংশ থাকিয়াও ভাগ্যক্রমে প্রকৃত লক্ষ্যে পঁহুছিবার পর সুখশান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা এক দিন ও জীবনকে ভার বলিয়া বোধ করেন নাই।

ইহাঁরা কি ক্ষণকালও জীবনকে ভার বলিয়া বোধ করেন নাই? কে বলিল, তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও জীবনকে ভার বোধ করেন নাই? মাধাই, তুলসীদাস বা শিহ্লণ প্রভৃতির যে কেহ যেমন প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়াছেন, অমনই মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সকল নেশা ছুটিয়া পালাইয়াছে। তাঁহাদের নিকট পৃথিবী শূন্যময়, জীবন বিষম ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। দস্যু রত্নাকরের জীবনী ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সংসারী হইয়া অবধি রত্নাকর দস্যু। দস্যুতাই তাহার জীবিকা, দস্যুতাই তাহার সুখ। তাদৃশ দুর্দ্ধর্ষ দস্যু সশস্ত্র! সম্মুখে শিকার, কিন্তু এ কি? সে উৎফুল্লতার পরিবর্ত্তে কাঁদিয়া আকুল। তাঁহার হৃদয় শূন্য, পৃথিবী শূন্য,—সে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিতে একান্ত অসমর্থ। পাঠক! বল দেখি, কেন ইহার এই দুর্গতি? ইহার কারণ কি জীবনের লক্ষ্যভ্রংশ নহে? দস্যু রত্নাকরের মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, অন্যান্যেরও তাহাই হইয়াছিল, ইহাতে অব্যাপ্তি নাই। শিহ্লণ সাধু-প্রকৃতি পাইয়া কি জীবনের ভারে অভিভূত হন নাই? র, ম বোধ করি

শিহ্লণের নামমাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত; তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করেন নাই। শিহ্লণ কি বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক দেখুন ;—

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত! চিন্তামণির্ময়া॥" —শান্তিশতক।

"হায়! সংসারের ভোগলিপ্সায় এই দুর্লভ মানব-জীবন বিফল করিলাম! তুচ্ছ কাচের মূল্যে চিন্তামণি মৎকর্ত্তৃক বিক্রীত হইল!

ইহার পরও কি পাঠক বলিতে চান, শিহ্লণ জীবনকে ভার বোধ করেন নাই?

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত টুকু বুঝিতে পারিয়াছি, কালীপ্রসন্নের "জীবনের ভার" শীর্ষক প্রবন্ধ, গীতার কর্ম্মযোগাধ্যায়ের ভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত। গীতার কর্ম্মে ও কালীপ্রসন্নের জীবনের লক্ষ্য কর্ম্মে বিশেষ পার্থক্য নাই। গীতায় কর্ম্ম শব্দ অতি বিস্তৃতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শুধু কর্ম্ম বলিলে সৎ কর্ম্ম অসৎ কর্ম্ম দুইই বুঝায়, সুতরাং অকর্ম্মকও কর্ম্ম হইয়া উঠে। অতএব গীতার—

"সততং কুরু কর্ম্ম ত্বং"

প্রভৃতি স্থলে কর্ম্ম পদের লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিতে হয়। কালী বাবু বলিয়াছেন,—

"আলস্যের নাম অকার্য্য। উহা মানব-জীবন-রূপ কল্পতরুর কোটরস্থ বহ্নি। এক বার যদি উহা অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষটিকে ভস্মরাশি না করিয়া আর উহা বাহির হয় না।"

গীতা বলেন,—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥"

যাহারা এই প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-চক্রের অনুবর্ত্তন করে না, সেই পাপ জীবন ইন্দ্রিয়ারাম (ভোগসুখ-নিরত) ব্যক্তির জন্ম নিষ্ফল।

যাহারা কর্ম্ম-চক্রের অনুবর্ত্তন করে না, তাহাদের জন্ম নিষ্ফল, এই কথাটার কি কোন অর্থ নাই? এইরূপ 'জন্ম নিষ্ফল', মনুষ্য যদি আজীবন সুখেই কাটাইতে পারিত এবং ইহাই যদি সুখের হেতু হইত, তাহা হইলে—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ" ॥—গীতা ৩।৫

অকর্ম্মকারী মানব, ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। উদ্ধৃত গীতোক্তির সার্থকতা কোথায়? যে কর্ম্ম করে না, সে ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না অর্থাৎ সে কর্ম্মহীন মুহূর্ত্তে সংসার শূন্যময় দেখে, জীবন এক বিষম ভার হইয়া উঠে, কাজেই আহার, শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

"শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।"—গীতা ৩।৮

এই হেতু সেই জীবন-ভারে ভারাক্রান্ত হৃদয়কে হয় সু নয় কু একটা পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। কালী বাবু বলেন—

"যখন অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই সেই কেমন এক শূন্য শূন্য ও পুরাতন শূন্যতায় পরিপূর্ণ জ্ঞান হইতে থাকে, তখন পাপজন্য পরিবর্ত্তনের নূতনতাও নিতান্ত প্রীতিকর হইয়া উঠে; এবং যাহাদিগের অধঃপাত অন্য কোন রূপে আশঙ্কিত হয় নাই, আলস্যের জন্য হৃদয়ভাই তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অধঃপাত সাধন করে।"

র, ম. বলেন, শত সহস্র ব্যক্তিকে দুষ্কর্ম্মনিরত দেখা যায়; কিন্তু তাহাদিগকে জীবনের ভারে ভারাক্রান্ত হইতে দেখি কই? কিন্তু তিনি বুঝিবার ত্রুটিতে এ টুকু বুঝিতে পারেন নাই যে, মানুষের যে অবস্থা হইতে ভোগ-বিলাসের মত্ততার উৎপত্তি, সেটাই জীবনের ভার ও আলস্য। চোর অবিশ্রান্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অনাহারে অনিদ্রায় আত্মকার্য্যের সুযোগ অন্বেষণে ব্যস্ত, তাহাকে অলস বলিতে হইবে কি? বিলাসীর প্রত্যেক ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যদি অহরহঃ বিলাস-লীলার তরল তরঙ্গে নাচিয়া বেড়াইল, তাহা হইলে সেই বিলাসীকে অলস বলা যায় কিরূপে? কিন্তু উহার দুষ্কৃতির নিদান আলস্য বা লক্ষ্যভ্রংশ এবং পরিণাম জীবনের ভার বহন। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল অবশ্য 'দুষ্কার্য্যকারীকেও সুতরাং তাহার দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতে হইবে। আজ হউক, কাল হউক, এক দিন তাহাকে জীবনের বিষম ভার বহিতেই হইবে। সে তখন কিছুতেই আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। গীতা বলেন,—

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।" —৩। ১৭।

দুষ্কর্ম্মনিরত ভোগবিলাসের অদম্য শিশু যদি বিলাসেই মগ্ন রহিল, যদি বিলাসই তাহার অবিচ্ছেদ আত্ম-তৃপ্তির কারণ হইল, তবে মুমুক্ষুর সহিত তাহর পার্থক্য কোথায়? কালী বাবুর মত প্রতিভাশালী উন্নতহৃদয় পুরুষ আলস্যের এই মধ্যাবস্থাকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারেন না। কেন না বিলাতী মাল মসলাই তাঁহার গ্রন্থের উপাদান নহে। কালী বাবুর কাব্য-কাননের এক দিকে জর্ডনের জল-স্রোত, অপর দিকে মন্দাকিনীর পবিত্র বারি-ধারা; উহার এক দিকে মিল্, বেকন্, নিউটন্—অপর দিকে কণাদ, কপিল, গৌতম। তাঁহার কবিত্ব-তরুর এক শাখায় প্রিমরোজ, অপর শাখায় পারিজাত। কোট পেণ্টুলন পরিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা চলে না, নামাবলি লইয়া তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা চলে না—উভয়ের সংমিশ্রণ চাই। কবি হইয়া চলে না, দার্শনিক হইয়া চলে না—উভয়ের সংমিশ্রণ চাই।

এ সম্বন্ধে র,ম, আর বাক্য ব্যয় করিবেন না। তাঁহার দর্শনের বিদ্যা তো এই পর্য্যন্ত, ভাষাজ্ঞান ততোধিক। ভাষায় ও ব্যাকরণে তাঁহার কত দূর দখল, পাঠক নিম্নে তাহার কয়েকটা নমুনা দেখুন,—

"প্রথমে হাতে লইয়াছি প্রভাত-চিন্তা। পুস্তকের মধ্যস্থিত জীবনের ভার শীর্ষক প্রবন্ধটী প্রথমেই দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইয়াছিল।"

রাম না জন্মিতেই রামায়ণের সৃষ্টি। প্রভাতচিন্তা হাতে লইবার পূর্ব্বেই বুঝি "জীবনের ভার" শীর্ষক প্রবন্ধ, সমালোচকের দিব্যচক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল?

"এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যাহা নোট করিয়াছি, সংক্ষেপত তাহার মর্ম্ম আপনার পাঠকবর্গের সদয় দৃষ্টির জন্য সেই শ্রমফলের কিয়দংশ সসম্ভ্রমে প্রেরিত হইল।"

মর্ম্ম-দেখা কথাটা কি বুঝিলাম না। ইনিই কিন্তু কালী বাবুকে বলিয়াছেন, "প্রচ্ছন্ন পাপ ব্যাপারটা কি?"

স্থানান্তরে লিখিয়াছেন;—"১৮৬৯ সালের ১৩ ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যক"। অদ্ভুত! আর কয় দিন পরে গাছ মাছ গুলিও সংখ্যা হইয়া উঠিবে

দিন মাস যদি সংখ্যা হইতে পারিল, গাছ মাছ হইবে না কেন? চক্রবর্ত্তীর বিদ্যাটা অনেক স্থলেই প্রায় এইরূপ। এবারে আর বেশী কিছু বলিব না।

শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য।

রমণীর সৌন্দর্য্য-বোধ ও অলঙ্কার-প্রিয়তা।

দেশভেদে ও সভ্যতার পরিমাণানুসারে, সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিভিন্ন হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশের নারীগণের নিকট গাউন (ঘাগরা) জ্যাকেট্ প্রভৃতিই অতি পরিপাটী পরিধেয়। আবার ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, চীন, ইত্যাদি গ্রীষ্মাধিক দেশে ধুতি, চাদর, সাটীনের কাপড় প্রভৃতিই অধিক ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ যে জাতি, সভ্যতার যে স্তরে অধিরোহণ করিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য-বুদ্ধিও তদনুযায়িনী, হইয়াছে। বর্ত্তমান উন্নত জাতিরা পূর্ব্ববৎ আর সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কি পরে না, নানারূপে আপনাদের দেহ, ক্ষত বিক্ষত করিয়া সৌষ্ঠব-সংবর্দ্ধনের চেষ্টা করে না। এই রূপে সভ্যতা-বিস্তারের সহিত প্রায় সকল জাতিরই রমণীয়তা-জ্ঞানের তারতম্য হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বিলাসিতা ও দেহের সুশ্রী-সম্পাদনেচ্ছা কামিনীগণের মধ্যেই প্রবল। নারীগণের অলঙ্কারলাভাকাঙ্ক্ষা চির-প্রসিদ্ধ। সৃষ্টির এই বিভাগের ভিতর কেন যে এরূপ অভিলাষ, এত আধিপত্য করে, তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পুরুষদিগেরও যে এরূপ উন্মত্ততা নাই, তাহা নয়। তবে যোষিৎসমাজে উহা অপেক্ষাকৃত সুলভ। সর্ব্বদা কিরূপ উপায়ে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবে, কামিনীকুল এই চিন্তায় নিমজ্জিত থাকে বলিয়াই, বামাগণের সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি পুরুষদিগের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর। সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে নারীজাতি পুরুষের গুরু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সকল দেশে এখনও কিছু সভ্যতার তীব্র রশ্মি বিকীর্ণ হয় নাই। সকল স্থান এখনও সভ্যতার স্রোতে ভাসমান হয় নাই। সকল জাতির রুচি, এখনও

মার্জিত হয় নাই। সুতরাং, এখনও অনেক দেশে অতিমাত্র হাস্যোদ্দীপক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মণ্ডনের প্রথা, প্রচলিত দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে তাহাই উল্লিখিত হইবে।

জাপান দ্বীপের রমণীরা তাঁহাদের দাঁত সোনালি রঙে রঞ্জিত করে। আমেরিকার অসভ্যজাতির নারীগণ দাঁতে লাল রঙ মাখায়। গুজরাটে দাঁতে কালী লাগায় (১)। গ্রীনলণ্ডে স্ত্রীলোকগণ, মুখে নীল ও হলদে রঙ্ মাখাইয়া থাকে। মামকোভি দেশের কামিনীদের বর্ণ যতই উজ্জ্বল ও সুন্দর হউক না কেন, তাহা কৃত্রিম রঙে; রঞ্জিত না করিলে, রূপসীর মন উঠে না; আপনাকে অতি কুদর্য্যরূপা মনে করে। চীন দেশের রমণী-সমাজে পদদ্বয়ের ক্ষুদ্রতা, সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। চরণদ্বয় যত ছোট হইবে, ততই যুবতী সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইবে। পদের আয়তন ছোট করিবার জন্য, চীনদেশীয় বালিকারা বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। অতি শিশুকাল হইতে তাহাদিগকে পায়ের আঙুল, বাঁকাইয়া বাঁধিতে হয় *। প্রথম প্রথম, উহাতে এতই যাতনা হয় যে, কোমলাঙ্গী বালিকাগণ দুই তিন দিন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকে। এইরূপ বন্ধন হেতু পদের অঙ্গুলি ক্রমশঃ বক্র হইয়া পদ দেশের নিম্নে গিয়া পড়ে। যে সকল সুন্দরীর পাদ-দেশের পরিমাণ, ছাগলের খুরের ন্যায়, তাহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া গণ্য হন। সুতরাং চীনে সুন্দরীদের চলিবার ক্ষমতা থাকে না। চাকাবিশিষ্ট চৌকিতে বসিয়া তাহাদিগকে বেড়াইতে হয়। এক ব্যক্তি তাহাদিগকে টানিয়া লইয়া যায়। পুরাকালে পারস্য দেশে বক্র নাসিকা রাজ-চিহ্ন-মধ্যে, ধর্ত্তব্য ছিল। সিংহাসন লইয়া দুই রাজার বিবাদ হইলে যাঁহার বাঁকা নাক, তিনিই প্রজাবর্গের মনোনীত হইতেন। কোন্ কোন দেশে প্রসূতিগণ নবজাত সন্তানের নাসিকা হস্তদ্বারা চাপিয়া বসাইয়া দেয়। তথায় খাঁদা নাকের গৌরব অধিক। সুমাত্রাদ্বীপবাসীর আপন সন্ততি-দিগের মাথায় পাতলা কাটের টুকরা

(১) ইংরেজেরা মুক্তানিভ দন্তরাজির পক্ষপাতী, সুতরাং লাল, কাল, দাঁত তাঁহাদের নিকট অসভ্যতার পরিচায়ক। এদেশীয় নারীগণ মিশি ও পান খাইয়া, দাঁত কাল ও লাল করেন। এখনও এদেশে উহা অসভ্যতার লক্ষণ নহে; পরে কি হইবে বলা যায় না।

* চীন-রমণীরা, বাল্যে লৌহপাদুকা পরিয়া পদ-যুগল সঙ্কুচিত করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে।— তত্ত্বাবধায়ক।

চাপিয়া বাঁধিয়া রাখে। এইরূপে মস্তক চেপ্টা হইয়া যায়। মাথা যত চতুর্ভূজ-আকৃতি ধারণ করে, উহা ততই সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হয়। আধুনিক প্রাচ্যবাসীরা চুলের লাল রঙ্‌ বড়ই ঘৃণা করে। কিন্তু তুর্কীরা এইরূপ কেশের অত্যন্ত পক্ষপাতী। হটেন্‌টট্‌ দেশের রমণীরা স্বামীর নিকট রেশমী-সাটী বা মুক্তার মালার আব্‌দার্‌ করে না। স্বামী যদি সদ্যোহত জন্তুর নাড়ী-ভুঁড়ি আনিয়া দিতে পারেন, তবেই পত্নীর প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠেন। উক্ত নাড়ী উহাদের কণ্ঠীস্বরূপ হইয়া থাকে। কি সুন্দর ভূষণ! কি পরিপাটী পছন্দ! কেমন রুচির নির্ব্বাচন! রাক্ষস আর কাহাকে বলে?

চীন দেশে ছোট ছোট চক্ষু, বড়ই মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই নয়নের কটাক্ষপাতেই চীন যুবকেদের মাথা ঘুরিয়া যায়। ইহারা ঘন-লোমযুক্ত ভ্রূ ভালবাসে না। তাই সর্ব্বদা ভ্রূর চুল খুঁটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। পাত্‌লা ও অধিক লম্বা ভ্রূ ইহাদের আদরণীয়। তুর্কীর স্ত্রীলোকেরা আঁবার (এক প্রকার কাল রঙে) তুলী ডুবাইয়া ভ্রূতে মাথাইয়া দেয়। দিবাভাগে উহা বেশ স্পষ্টরূপে দেখা যায় বলিয়া বড়ই কদাকার দেখায়। কিন্তু রাত্রিতে বেশ চক্ চক্ করে। ইহারা গোলাপি রঙে নখ-রাজি রঞ্জিত করে। এদেশেও যুবতী ও বালিকারা মেন্‌তি পাতার রঙে নখ রঞ্জিত করে। বিলাতি সভ্যতার সহিত এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

আফ্রিকা দেশে সুন্দরী বলিয়া অভিহিত হইতে হইলে, ক্ষুদ্র চক্ষু একান্ত প্রয়োজনীয়। চেপ্টা নাক, পুরু ঠোঁট ও আবলুষের মত কৃষ্ণ কর্ণ, সৌন্দর্য্যের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ। চীনের লোকেরা বড় বড় নখ রাখে এবং যাহাতে ঐ নখ ভাঙ্গিয়া না যায়, সেই জন্য বাঁশের ঠোল করিয়া উহার ভিতর আঙ্গুল পুরিয়া রাখে। আরব দেশের কামিনীগণও হাত ও পায়ের নখে লাল রঙ্‌ মাথায়। ইহারা ভ্রূতে কাল ও ঠোটে নীল রঙ্‌ লাগাইয়া দেয়। পারসীক-ভামিনীগণ চক্ষু বেড়িয়া কাল দাগ দেয় ও কর্ণে বিচিত্র রকমের উলকি কাটে। নিউ-জিলাণ্ড প্রদেশে বালিকাদের কর্ত্তৃপক্ষ বামহস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলির অগ্রভাগ কাটিয়া দেয়। দেহের সকল স্থানেই শামুকের খোলা দিয়া ক্ষত বিক্ষত করে। এই ক্ষত যত দিন বর্ত্তমান থাকে, তত দিন যুবতীদের সৌন্দর্য্য অক্ষুন্ন থাকে। তাহারা ইচ্ছা করিয়া ক্ষত-জনিত 'ঘা'

শুকাইতে দেয় না। পের দেশীয় স্ত্রীলোকগণ, নাকে প্রকাণ্ড ছিদ্র করিয়া এক খুব ভারি কড়া আটকাইয়া দেয়। রমণীদের স্বামীর সম্ভ্রম অনুসারে এই কাঁড়টার গুরুত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। পেরুর কথায় কাজ কি ? ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরাঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগকে যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন। দেশভেদে এই নাসিকার ছিদ্র দিয়া নানাবিধ বস্তু ঝুলান হয়। 'পলা', সোনার তাল, পাথর কুচি, কখন কখনও অনেকগুলি একত্র করিয়া ঝুলান হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ ভার-বহন করিয়াও নাসিকা অক্ষত থাকে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এই প্রথা দেখিয়া এক জন ইংরাজী লেখক কি বলিয়াছেন দেখুন,—

"This is rather troublesome to them in blowing their nose; and the fact is as some have informed us, that the Indian ladies never perform this very useful operation."

ইহার ভাবার্থ এই—

এইরূপে স্ত্রীলোকদিগের নাক ঝাড়িবার বড়ই কষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের রমণীরা কখন নাক ঝাড়ে না।

নাসিকার অলঙ্কার-সম্বন্ধে ইংরাজের যেরূপ রুচিই হউক না কেন— ষোড়শীর নাকের নোলক কিন্তু বড়ই সুন্দর। বোধ হয়, ইংরাজেরাও ইহা স্বীকার করিবেন।

স্ত্রীলোকদের শিরোভূষণও কোন কোন দেশে বড়ই হাস্যোদ্দীপক। চীনে সুন্দরীরা মস্তকে এক কৃত্রিম পক্ষী বাঁধিয়া রাখে; রমণীর সামাজিক অবস্থানুসারে পক্ষীটা তাম্র বা সুবর্ণ-নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই পাখীর ডানা-দুটী, রমণীর কপাল ও গণ্ডস্থল ঢাকিয়া রাখে। পালকের লেজ লম্বা করিয়া পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। পাখীর ঠোঁট বক্রভাবে আসিয়া নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। ঘাড়ের সহিত একটী স্প্রীং সংযোগে পক্ষীটী বাঁধা থাকে; অল্প নাড়া পাইলেই পাখীটী নড়িতে থাকে। সুতরাং সুন্দরীদের গমন-কালে বোধ হয়, যেন যথার্থই একটী পক্ষী তাহার মাথার বসিয়া রহিয়াছে।

মিয়ানটেস্ প্রদেশের নারীর মাথা সাজাইবার কথা শুনিলে কেহই হাস্য

সংবরণ করিতে পারিবেন না, ইহারা চীন-রমণীদিগকেও পরাভূত করিয়াছে। ইহারা ১ এক ফুট লম্বা ৬ ছয় ইঞ্চি প্রশস্ত এক খানি পাতলা কাঠ মোম্ দিয়া মাথার চুলের সহিত জুড়িয়া দেয়। ইহাদের খাইতে শুইতে সুস্থতা থাকে না। সর্ব্বদাই ঘাড় সোজা করিয়া রাখিতে হয়, আবার দুর্ভাগ্যক্রমে এই দেশে বৃক্ষাদির প্রাদুর্ভাব বড়ই অধিক। সুতরাং অনেক সময় সুন্দরীদের মস্তক-সংলগ্ন কাষ্ঠ, গাছ-পালায় আটকাইয়া গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে। চুল আঁচড়াইতে হইলেই এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে আগুনের তাপ মাথায় লাগাইতে হয়। মোম গলিয়া যাইলে, কাষ্ঠ খুলিয়া চুল আচড়ান হয়। এই চুল আচড়ান বৎসরে দুই বারের অধিক হয় না। কারণ, পরিশ্রম তো সহজ নয়।

নেটাল প্রদেশের অধিবাসিগণ ৬ ছয় হইতে ১০ দশ ইঞ্চি উচ্চ, গরুর চর্ব্বী-নির্ম্মিত টুপী ব্যবহার করে। ক্রমে আরও নানা-বিধ চর্ব্বী দ্বারা এই টুপী জন্মের মত মাথায় সংলগ্ন থাকে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয়, প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা ঘোমটার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন *।

"সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে নানা-মুনির নানা-মত। বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেই গোলযোগ; অন্তর্জগতে সকলেরই এক মত। যে রমণীর হৃদয় স্নেহ, দয়া ও পতিব্রতারূপ রত্ন-রাজিতে বিভূষিত, জগতের সকল লোক মিলিয়া তাহারই আদর করে! সেই রমণীই প্রকৃত সুন্দরী। যে সমস্ত গুণে জগৎ মুগ্ধ হয়, তাহাই তো প্রকৃত সৌন্দর্য্য।"

শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

* যুক্তিটী সঙ্গত নয়।—তত্ত্বাবধায়ক।

☞ পাঠকগণ কয়েকটী ভ্রম শোধন করিয়া লইবেন।

১৮৯ পৃষ্ঠায়—"সম্ভবে" পরিবর্ত্তে 'শস্তবে' হইবে।
"১৭০৮ সালে" ,, '১০৭৮ সালে' ,,
১৯৫ পৃষ্ঠায়—"প্রকৃতিবৈগুণৈঃ" পরিবর্ত্তে 'প্রকৃতিবৈগুণৈঃ' ,,

রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত।

১৩। বিধবা-বিবাহ-নাটক। (১)

(১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ—১২৬৬ সাল।)

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রেলের পূর্ব্বে এই ঘটনার সূত্রপাত হইয়াছিল। পৌরাণিক ইতিবৃত্ত-মূলক নাটকাদির রচনা করিয়া অভিনয় করার প্রথম পথ-প্রদর্শক বেলগাছিয়া-নাট্যসমাজ।

কেশবচন্দ্র সেনের নাট্যাভিনয়ের কথা, কেহ কেহ অস্বীকার করেন। কেহ তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন। কেহ বা আমাদের বর্ণনায় সংশয়াপন্ন। সুতরাং এমন স্থলে তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর একতমের লিপি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রতিপাদন করিতেছি।

"সিন্দুরিয়াপটির মৃত গোপাল মল্লিকের ভবনে অভিনয়ের রঙ্গভূমি ছিল।" (২)

"ব্রাহ্মসমাজে যোগ-দানের পর কিছু দিনের জন্য কেশবচন্দ্র "বিধবাবিবাহ" নাটকাভিনয়ে ব্যাপৃত থাকেন। অভিনয়ের অধ্যক্ষতা-কার্য্যে তাহার একটু বিশেষ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্ম-সংস্কারের কার্য্যের সঙ্গে নাটকাভিনয়ের সৌসাদৃশ্য তিনি সময়ে সময়ে বর্ণন করিতেন। প্রত্যেকে আপনাপন অংশ উৎকৃষ্টরূপ অভিনয় করিলে, যেমন নাট্যাভিনয় সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, বিধানের

(১) রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনে "চৈতন্য লাইব্রেরি" হইতে কোন কোন পুস্তকের সাহায্য পাইতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু বৈকণ্ঠনাথ বসু রায় বাহাদুর, শ্রীমান্ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও মিনার্ভা থিয়েটরের তিন জন কর্ম্মচারীর (বাবু দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ধর্ম্মদাস সুর, দুর্গাদাস দে—ইহাদের) সকাশে অনেক আনুকূল্য পাওয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছাত্র বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফির নিকট হইতে যে সংক্ষিপ্ত লিপি (নোট) দিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। প্রাচীন নিপুণ অভিনেতা বাবু রাধামাধব করও, আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

(২) কেশব চরিত, ২১ পৃষ্ঠা।

কার্য্যও তদ্রূপ। রঙ্গভূমির কার্য্য সকল যথানিয়মে নির্ব্বাহ-বিষয়ে তাঁহার যে স্বাভাবিক প্রতিভা-শক্তি ছিল, তাহা "নববৃন্দাবন"-অভিনয়ে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। "বিধবা-বিবাহ" নাটকে তিনি ক্রমাগত বৎসরাবধি পরিশ্রম করেন। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বড় লোকেরা তাহা দেখিয়াছিলেন। "নববৃন্দাবন"-নাটকে কলিকাতা নগরকে যেরূপ আন্দোলিত করে, "বিধবা-বিবাহ" নাটকে সে সময় তদ্রূপ করিয়াছিল। কিন্তু কেশব যে, তাহার প্রধান পৃষ্ঠ-পূরক, তাহা কে জানিত? জানিলেই বা তখন সে অল্পবয়স্ক যুবাকে কে চিনিত?" (৩)

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদারও কেশবচন্দ্রের ইংরেজি জীবনীতে বলিয়াছেন,—

"In the splendid building at Chitpore Road, to which the Brahmo School was removed in 1859, Keshub found a somewhat unexpected occupation. He was entrusted with the management of an institution very different from the Brahmo School. It was a dramatic club to put on the stage Bidhaba Bibaha Natak (Widow marriage drama) written with the object of reforming the cruel custom of the forced celibacy of young Hindu widows. By repeated representation of Hamlet and other performances, half musical, half dramatic, Keshub had developed such a talent for stage-management, that the gentlemen, who projected this company, most of them our relatives and neighbours, seniors to us in age, implicitly trusted Keshub with sole charge of the new undertaking. Keshub's love for Shakespeare, and for good dramas in general, was unbounded; it was one of those dispositions which his early asceticism never wholly effaced, strange as that may seem and which adhered to him till the last day of his life. He always looked upon dramatic representation not only as a most enlightened form of public amusement, but also as a most potent agency for the reformation of social evils.

(৩) কেশব-চরিত, ২১ পৃষ্ঠা।

Abstemious in his own personal habits, he never grudged to the community its legitimate share of rational recreation. Natural innocent joyousness he held to be the safety-valve of a hundred ill-humours in the human mind, also as a great force by which an individual and a nation might be raised to the most exalted ideals. To all these motives was added the intense sympathy he felt with the cause of the remarriage of Hindu Widows. Since the inauguration of the widow marriage reform in 1856, Keshub though then a very young man, wished well to the cause, and did what he could to contribute to its success. He therefore cheerfully accepted the management of the Widow Marriage Drama. Four institutions now ran abreast each other under Keshub's supervision. There was the Colutola Evening school, the Goodwill fraternity, the Brahmo School and the Theatre at Chitpore Road. As nearly the same individuals comprised the staff of them all, it was sometimes amusing and perplexing to hear the several bells ring almost simultaneously for the classes of the first, the services of the second, the lectures of the third, and the rehearsals of the fourth ! * * The plot of the drama was the miserable life of a Hindu widow shut up in the Zenana, who in her solitary friendless condition, formed an attachment to a young neighbour, by whom she was led to a course of sin. The concluding scenes depicted her sufferings, her suicide, her confessions, with appeals to all patriotic men to put an end to the forced celibacy of Hindu Widows. The performance was first opened to the public in the beginning of 1859, and produced a sensation in Calcutta, which those who witnessed it can never forget. The representatives of the highest classes of Hindu society were present. The pioneer and father of the widow-marriage movement Pandit Iswar Chandra Vidyasager came more than once, and tender-hearted as he is, was moved to floods of tears. In fact there was scarcely a dry eye in the great audience ; undoubtedly the most wholesome effect was produced. Keshub

as Stage-manager, was warmly complimented on his energy and intelligence, and we, his friends, as amateur actors, who had done our best, also received our humble share of praise. Though this dramatic success brought Keshub a good deal before the public, in that dawn and flush of his spiritual character the occupation of a stage manager could not but soon grow uncongenial. He and his companions were often thrown into heterogenous company; some of the parts played were undoubtly harmful in their moral tendency; there was inevitable dissipation, frivolity and a dangerous love of public applause. So before the end of the year the theatre was given up completely and Keshub turned his attention to more serious and important subjects." (4)

উল্লিখিত অংশের বাঙ্গালায় তাৎপর্য্য লিখিত হইল,—

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে চিৎপুর রোড্-স্থিত একটী সুবিস্তৃত ভবনে ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র, এখানে অচিন্তিতপূর্ব্ব এক কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। ব্রাহ্ম-বিদ্যালয় হইতে একটী স্বতন্ত্র বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব-ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল। ইহা বিধবা-বিবাহ নাটক অভিনয়ার্থ একটী নাট্য-সম্প্রদায়। হিন্দু-বিধবাদিগের চির-বৈধব্য যন্ত্রণা অপসারিত করা ইহার উদ্দেশ্য। হাম্লেট এবং অপরাপর সঙ্গীত-নাট্যের বিচিত্র অভিনয়, বার বার সম্পাদন করিয়া কেশবের অভিনয়ের অধ্যক্ষতা কার্য্যে এত দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, যে সমস্ত ভদ্র মহোদয়, এই সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাদের আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও. কেশবের উপর তাঁহারা এই অভিনয়ের অধ্যক্ষতা-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কেশবের সেক্ষপীয়র এবং সাধারণতঃ উত্তম নাটকের উপর অনুরাগ অসীম। বাল্য-কালে তাঁহার যোগিগণ-সুলভ ভাব, একবারেই তিরোহিত হইতে পায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উহা

(4) Life and Teachings of Keshub Chunder Sen, by P. C. Mozumdar, pp-114—116

তাঁহার জীবনের শেষ অংশ পর্য্যন্ত সমভাবেই রহিয়াছিল। নাট্যাভিনয়ে সভ্য-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর আনন্দ হয়। তাঁহার কিন্তু ধারণা ছিল—সামাজিক দোষ-দূরীকরণের ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি নিজে পরিমিতাচারী হইলেও উপরোক্ত সম্প্রদায়ে মনুষ্যোচিত আনন্দ উপভোগ করিতে কখন বিরক্ত হইতেন না। তিনি বিবেচনা করিতেন, এইরূপ স্বাভাবিক নির্দ্দোষ আনন্দ, শত শত নিকৃষ্ট বিদ্রূপের অন্তরায়। এই বলবতী শক্তি দ্বারা মনুষ্য এক মহান্ উচ্চ আদর্শের সম্মুখীন হইতে পারে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যের সহিত হিন্দু-বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের প্রতি তাঁহার অন্তরে প্রগাঢ় সমবেদনা নিহিত ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র তৎকালে অল্পবয়স্ক হইলেও তাহার সফলতার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের সহিত বিধবা-বিবাহ-নাটক অভিনয়ের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে কেশবের কর্ত্তৃত্বে চারিটি সম্প্রদায় সমানরূপে চলিতেছিল। যথা,—কলুটোলা সান্ধ্য বিদ্যালয়, সদ্ভাব-সমিতি, ব্রাহ্মবিদ্যালয় এবং চিৎপুর রোড-স্থিত রঙ্গালয়। একই লোককে অবলম্বন করিয়া ঐ চারিটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিক একই সময়ে নৈশ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান, সদ্ভাব-সমিতির প্রার্থনা, তৃতীয়ের বক্তৃতা, চতুর্থের আখড়াই সম্পন্ন করিবার আবশ্যকতা হইত।

নাটকের ঘটনা এইরূপ,—

গৃহ-প্রাঙ্গণে আবদ্ধা, একটি দুঃখিনী হিন্দু-বিধবা নির্জ্জন বন্ধুহীন অবস্থায় একটী যুবক প্রতিবাসীর প্রতি আসক্ত হইয়া পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে। নাটকের শেষাংশে তাহার যন্ত্রণা, অপরাধ-স্বীকার, দেশ-হিতৈষী মহোদয়গণের নিকট এই চির-বৈধব্য দূর করিবার জন্য অনুযোগ এবং আত্মহত্যা এই সমস্ত ব্যাপার আছে। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রথমতঃ সাধারণের দর্শনার্থ এই অভিনয় আরম্ভ হয়। ইহা কলিকাতায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। যাঁহারা উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই উহা ভুলিতে পারিবেন না। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। বিধবা-বিবাহের উদ্যোগকর্ত্তা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একাধিক বার এ স্থলে আসিয়াছিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। দর্শকবৃন্দের মধ্যে কাহারও চক্ষু শুষ্ক থাকিত না। ইহাতে যে বিশেষ ফল হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

অভিনয়াধ্যক্ষ, কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও কার্য্যকুশলতার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা (তাঁহার বন্ধুগণ) সাধ্যমত অভিনয় করিয়াছিলাম বলিয়াও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলাম। তিনি ধর্ম্মাবস্থার প্রথম অংশে ও উন্মেষের সময়ে এই অভিনয় দ্বারা যদিও সাধারণ-সমক্ষে বিদিত হইয়াছিলেন, এই অভিনয়াধ্যক্ষের কার্য্য তাঁহার পক্ষে প্রীতিকর হয় নাই। তিনি এবং তাঁহার অনুচরগণকে অনেক সময় স্বভাব-বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ে পড়িতে হইত। কতকগুলি অভিনীত অঙ্গ, বাস্তবিক যে সুনীতির বিরোধী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাতে অপরিহার্য্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও রসিকতা আছে। সাধারণের প্রশংসা-ভাজন হইবার জন্য বিশেষ অনুরাগ রহিয়াছে। এই জন্য উক্ত বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে রঙ্গভূমি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইল। কেশবের মন, গম্ভীরতর প্রধান ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময় বিধবা বিবাহ-প্রচলনের নিমিত্ত তুমুল আন্দোলন করিতেছিলেন। উমেশচন্দ্র মিত্র-রচিত উক্ত বিধবা-বিবাহ নাটক পুস্তকখানি লইয়া সমাজে ভয়ানক আলোচনা হইতেছিল। এই উমেশচন্দ্র বাবু, বিচারপতি রমেশচন্দ্র বাবুর অগ্রজ। সময়োপযোগী নাটকের অভিনয়ের সহিত যাহাতে কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারা যায় ও সমাজের যাহাতে উন্নতি হয়, এ অভিলাষে কেশবচন্দ্র সেন বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ের উদ্‌যোগ করেন। তাঁহার এই উদ্যম, কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। এই অভিনয়ে রমাপ্রসাদ রায়, বিদ্যাসাগর, দিগম্বর মিত্র, সেন-বংশীয়গণ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই সহায়তা করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখন নাট্যাভিনয়-সন্দর্শনে সমুপস্থিত হইতে কেহ দৃষ্টিগোচর করেন নাই। অধিক কি, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষজ, যখন স্বরচিত "লক্ষ্মণবর্জ্জন" তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া সাক্ষাৎ করিতে গিয়া উহার অভিনয়াবলোকনার্থে অনুরোধ করেন, তখনও তিনি নাট্যশালায় পদার্পণ করেন নাই। বিদ্যাসাগরের জীবনের সঙ্গে বিধবা-

বিবাহের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সেই হেতুই তিনি এই অভিনয়ের একতম দর্শক হইয়াছিলেন। আমোদ, কৌতুক বা শিক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া গমন করেন নাই।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয় করিতেন,—

(১) শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন—পুত্রবধূর অংশ অভিনয় করিতেন। ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক, এই পরিচয় পূর্ব্বেই এক বার দিয়াছি।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে আলবার্ট কালেজের রেকটার (সর্ব্বাধ্যক্ষ)। ইঁহা দ্বারা পাঠশালার প'ড়োর অংশ অভিনীত হইত।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ সেন। ইনি "কৃত্তিরাম ঘোষের" বেশে অভিনয় করিতেন।

(৪) শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। ইনি "মন্মথের" অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন।

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়। ইনি "সুলোচনার" অংশ গ্রহণ করেন। বিহারিলাল বাবুর পরিচয়, পূর্ব্ব বারে বলা গিয়াছে।

এই সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সাহায্যে বিধবা-বিবাহের অতি সুন্দর অভিনয় হইত।

এই অভিনয় লোকের এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, সহস্র সহস্র লোকে, অভিনয়-দর্শনার্থ আগমন করিত। বস্তুতঃ সে সময়ে এইরূপ অভিনয়ই অত্যন্ত প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

যে সকল প্রবীণ ব্যক্তি, পাইকপাড়ার রাজাদিগের বাটীতে "রত্নাবলী" নাটকের পূর্ব্বে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাও আগ্রহের সহিত এই অভিনয় দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহারা এই অভিনয় দর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা এই অভিনয়ের গুরুত্ব হৃদগম্য হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সুশিক্ষিত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ, সুলোচনার অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। এই অভিনয়

দর্শন করিয়া "সুলোচনার" অংশ স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনীত হইয়াছে, ইহা অনেকেরই হৃৎপ্রত্যয় হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তকে "সুলোচনার" অংশ, বাস্তবিক কোন স্ত্রীলোকে অভিনয় করিতেছে কিনা জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। নারীবেশী পুরুষ, এমনই স্বাভাবিক অপরূপ অভিনয় করিয়াছিলেন! ইহাকেই প্রকৃত অভিনয় বলে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

অভিনয়-সমালোচনা।

মিনার্ভা থিয়েটার।

(২১শে পৌষ, ৬ই জানুয়ারি, রবিবার—দ্বিতীয় অভিনয়).

("সভ্যতার পাণ্ডা"—পঞ্চরঙ—শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত—"মিনার্ভা থিয়েটারে" অভিনীত।) অভিনয় দর্শনের পূর্ব্বে মনে হয়, ইহাতে আছে কি? অভিনয় দর্শন করিয়া স্পষ্টই বোঝা যায়—ইহাতে নাই কি? সবই তো আছে! বাঙ্গালীর সাহেব হওয়া আছে, সমাজ-সংসারের অপূর্ব্ব ছবি আছে, মদ্দদের মর্দ্দানী আছে—মহিলাদিগের কার্দ্দানী আছে, বথামীর বেহদ্দ আছে—ইয়ারকির চূড়ান্ত আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির বৈদেশিক সভ্যতায় যত দূর সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে, তাহার ফটোগ্রাফ আছে, জীয়ন্তে দীপ-শলাকায় মুখাগ্নি পর্য্যন্ত আছে, তবে আর ইহাতে নাই কি?

সাজ-সজ্জা দৃশ্য-পট সমস্তই নূতন—সমস্তই সুন্দর। বোবার ন্যায় ইঙ্গিতে নির্ব্বাক্-অভিনয়কারীকে ধন্যবাদ করিতে হয়। সে ব্যক্তি সিটী থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব অভিনেতা। উহা অতি চমৎকাররূপে অভিনীত হইয়াছিল)। যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য এবং দর্শকগণও প্রফুল্ল হন। গিরিশ বাবু প্রাচীন পথ অবলম্বন না করিয়া বাহাদুরির পরিচয় দিয়াছেন। (সভ্যতার পাণ্ডা দেখিবার জিনিষ বটে। তাহার উপরে আবার ষড় ঋতুর দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন ও কেবল সঙ্কেতে নীরব ভঙ্গিমায় এক অভি-

নেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা ঋতুবর্ণন করা এক উপাদেয় বস্তু।) গিরিশ বাবু শুধু নাটককার নহেন। তিনি এক জন উচ্চ অঙ্গের কবি। সে পরিচয় "সভ্যতার পাণ্ডায়" ষড়ঋতুর পট-পরিবর্ত্তন-সন্দর্শনে যথেষ্টই জানা যায়। কবি রাজকৃষ্ণ রায় একবার বেঙ্গল থিয়েটারে এই ষড়ঋতু প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর এবার গিরিশচন্দ্র বাবু নিজ-কল্পনা, প্রহসনের সহিত সুমধুর ভাবে চালিত করিতেছেন। ("সভ্যতার পাণ্ডা" সাজ-সজ্জায়, দৃশ্যপটে, সংগীতে দর্শকগণের মন আকৃষ্ট করে।)

আজ-কাল প্রহসন, পঞ্চরঙ, বা হাস্যরসোদ্দীপক কোন প্রকার পুস্তক পুস্তিকা লিখিতে হইলে, অপ্রবীণ গ্রন্থকারগণ আগে একটা জাতীয় ভাব, কোন ব্যক্তি বা সামাজিক কোন বিশেষ কথা লইয়া আরম্ভ করেন। ব্যক্তি-বিশেষকে গালি দেওয়া যেন আজকালের প্রহসন-লেখকগণের উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্ম বা সমাজের কোন কেচ্ছা বর্ণনা করিতে হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তাঁহাদের সমাজ যেন আগে ধরা পড়ে। তার পর হিন্দুর কন্যাদায়, দলাদলি প্রভৃতি অল্প অল্প পরিমাণে আক্রান্ত হয়। গিরিশ বাবু সে পন্থা অবলম্বন না করিয়া সাধারণভাবে সমাজের ও দেশের চিত্র দেখাইয়াছেন, অথচ গালি দেওয়া হইয়াছে সকলকেই। আক্রোশ প্রকাশ করা হইয়াছে, জাতীয় রীতি-নীতি, অবস্থার পরিবর্ত্তন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিকারগ্রস্ত বাঙ্গালীর উপর। এক কথায় বলি, গালি সকলকেই দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন জাতি, কোন লোক, বা কোন সম্প্রদায়কে উল্লেখ করিয়া নয়। পঞ্চরঙ লিখিবার এ বেশ পন্থা। দর্পণে যেমন সকলেই নিজ নিজ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত দেখিতে পান, সেইরূপ পঞ্চরঙ-রূপ দর্পণে যিনি যে প্রকৃতির লোক, তিনি তাঁহার প্রতিরূপ দেখিতে পাইবেন।

("সভ্যতার পাণ্ডা"-দর্শনার্থে লোক-সমাগম বিলক্ষণ হইতেছে। তবে পুস্তক নির্দ্দোষ হয় নাই। স্থানে স্থানে আপত্তি-যোগ্য অংশ আছে।

একশ্রেণীর সমালোচকের মতে সভ্যতার পাণ্ডায় ভাবী সমাজের চিত্র অঙ্কিত। এ বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় ভিন্ন। আমারা অন্যরূপ বুঝিয়াছি। ভবিষ্যতের ভয়-নিবারণোদ্দেশ্যে এই অদ্ভুত প্রহসন-প্যাণ্টোমাইমের সৃষ্টি।

সুতরাং ইহা অনেকের ভাল লাগিবে। এই মজাদার সৃষ্টিতে সুধাবৃষ্টি হইয়াছে; সুধা, চিরকালই শিষ্টের নিকট মিষ্ট। সুতরাং এ সুধাবৃষ্টি সাধারণের যে বড় সুমিষ্ট বোধ হইবে, তাহা বলা অনাবশ্যক—অমুক্ত-সিদ্ধ। উপযুক্ত সময়ে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তপ্ত নিদাঘে—বারি-বর্ষণ, কেন চিত্তহরণ না করিবে।

বেঙ্গল থিয়েটার।

(১৭ই পৌষ, ১লা জানুয়ারি, মঙ্গলবার।)

যমের ভুল।—বড়দিনের সময় হইতে এই নূতন প্রহসন এখানে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। একটী প্রাচীন উপাখ্যান, এই প্রহসনের উপাদান। আমাদের স্মরণ হয়, সুলভ-সমাচারে ও অনুসন্ধানে এই গল্প মুদ্রিত হইয়াছিল। সে আখ্যায়িকা এইরূপ,—

এক ঘোর নারকী, সর্ব্ববিধ পাতকই করিত। দৈবক্রমে সে অকস্মাৎ একটী মুমূর্ষু গো-বৎস, ব্রাহ্মণকে দান করে। তৎপরে তাহার মৃত্যু হয়। যমরাজের অমাত্য চিত্রগুপ্ত, খাতা উল্টাইয়া বহু সন্ধান করিয়া শেষে তাহাকে বলিলেন, তোমার স্বল্পমাত্র পুণ্য।

মৃতপ্রায় গো-বৎস-দানের ফল, তুমি প্রথম সম্ভোগ করিবে, কি অগ্রে পাপ-ভার বহন করিবে? চতুর পাপী, অগ্রে সুকৃতির ভাগী হইবার কামনা করিল। ঐ পুণ্য-বলে সে, এক বৃষ পাইল। পাপীর অনুজ্ঞায় বৃষ, ধর্ম্মরাজকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিল। শেষে সকল দেবতা, যমালয়ে সমবেত হইলেন। মহেশ্বরাদি দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়ায় এই মীমাংসা হইল—পাপী, দেবাদিদেবগণের সন্দর্শন পাইয়াছে; অতএব সে পাপনির্মুক্ত হইল।

এই গল্পই, যমের ভুলের মূল। ইহার আনুষঙ্গিক অবান্তর কিছু কিছু সংযোগ-বিয়োগ করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে। শাস্ত্রমতে ভূমিদান, অন্নদান—যেমন মহাপুণ্যজনক, গো-দানও প্রায় তেমনই ধর্ম্ম প্রদান করিয়া থাকে।

কাহাকে কাহাকে আমরা এই প্রহসনের বিপক্ষে মতামত প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। তাঁহাদের বিপক্ষতার কারণ বলিতেছি। থিয়েটারে সুনীতির তাঁহারা

প্রত্যাশা করেন। কোন কোন রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণের ধারণা থাকিতে পারে, তাঁহারা সমাজ সংস্কৃত করিতে বসিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে আমরা বলি, নাট্যশালার নিকট সুশিক্ষার সম্ভাবনা স্বল্প। আমোদ-কৌতুক, গল্প-গুজবের উদ্দেশ্যেই লোকে সাধারণতঃ রঙ্গশালায় গিয়া থাকে। নট-নটীদের বদন-মণ্ডল হইতে উচ্চারিত মতকে, ধর্ম্মসমাজের বেদী হইতে প্রচারিত তত্ত্ব মনে করা ভ্রম। তবে স্বীকার করিতে পারি যে, অভিনয় দেখিলে সামাজিক কোন কোন অন্যায় কর্ম্মের জন্য সময়ে সময়ে দর্শকের মনে বিবেচনা আসিবার সম্ভাবনা।

ফলতঃ কোন কোন স্থল বাদে যমের ভুলে হাস্য-কৌতুক প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য দর্শকমণ্ডলীর চক্ষু-কর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে।

সেদিনে প্রভাস-মিলন ও শকুন্তলার অভিনয় ভাল হইয়াছিল।

মাসিক পত্র ও সমালোচন

তত্ত্বাবধায়ক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

সূচী।

	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
১।	একটী মানবজীবনের পরিণাম	শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল	২১৩
২।	নিবেদন	শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য	২৩০
৩।	সাহিত্য-সংক্রান্ত চিঠিপত্র	(৺ অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র)	২৩০
৪।	রঙ্গভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্ন	শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা	২৩৪
৫।	বালিকার আমরণ	শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত	২৩৫
৬।	রাজকীয় বঙ্গরঙ্গভূমিতে 'রজনী'	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার	২৩৭
৭।	গীতি	শ্রীবিরিঞ্চিমোহন সেন	২৫৪
৮।	সমালোচনা	শ্রী—ম, ও শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু	২৫৫
৯।	পুস্তক-সমালোচনা	তত্ত্বাবধায়ক	২৬০
১০।	আমাদের ভ্রমণ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি	২৬১
১১।	প্রতিবাদ	শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত	২৬৬
১২।	সমালোচনের অনুশীলন	শ্রী—ফ	২৭০

কলিকাতা

৭৭।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৪৯ নং ফিয়ার লেন, "মোহন প্রেস" হইতে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৩০১ সাল।

"অনুশীলনের" নিয়মাবলী।
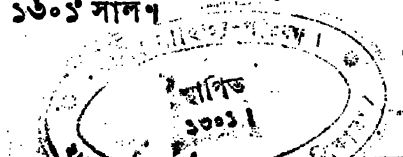
১। "অনুশীলন" প্রতি মাসে, ডিমাই ৮ আট পেজী ৬ ছয় ফর্ম্মা ৪৮ আটচল্লিশ পৃষ্ঠা আকারে প্রকাশিত হয়।

২। ধর্ম্ম, সমাজনীতি, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পদ্য, জীবনচরিত, সমালোচন, নানাবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই অনুশীলন, "অনুশীলনে" স্থান পাইবে।

৩। "অনুশীলনের" জন্য প্রবন্ধ, বিনিময় এবং সমালোচনার্থ পুস্তক ও পত্রিকাদি, ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে "চোরবাগান ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে" শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার—সহকারী তত্ত্বাবধায়কের নামে পাঠাইতে হইবে।

৪। টাকা, কড়ি ইত্যাদি ৪৯ নং ফিয়ার লেনস্থ "মোহন প্রেসে" শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫। বার্ষিক মূল্য মফঃস্বলে মায় ডাকমাশুল ১।০ পাঁচ সিকা ও কলিকাতায় মায় পিওনেজ ১৵০ আঠার আনা।

৬। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

৪৯নং ফিয়ার লেন,
কলুটোলা,—কলিকাতা।

শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে
প্রকাশক ও কার্য্যাধ্যক্ষ।

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—∽—

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা

৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, "চোরবাগান ইউনিয়ন্ লাইব্রেরী" হইতে
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

---

৪৯ নং ফ্রিয়ার লেন, "মোহন প্রেস" হইতে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
১৩০১ সাল।

অনুশীলনের প্রথম বর্ষের—প্রথম ভাগের

(অর্থাৎ ১৩০১ সালের)

সূচী।

	প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পত্রাঙ্ক
১।	অভিনয়-সমালোচনা	সম্পাদক	২০৯
২।	আত্মনিবেদন	—	১
৩।	আমাদের ভ্রমণ	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	১৮৭, ২৬১
৪।	আলেক্‌জান্দ্রিয়ার কৌতুকাগার	শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত ...	১২৯
৫।	আশার সুসার নাই	শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল ...	১৮০
৬।	একটী মানবজীবনের পরিণাম	,, ...	২১৩
৭।	একটী হিন্দুরমণী	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	১১১, ১৫১
৮।	এমারেল্‌ডে পুনরভিনয়	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	৫৫
৯।	এমারেল্‌ডে "মাব"	সম্পাদক	১১০
১০।	গীতি	শ্রীবিরিঞ্চিমোহন সেন ...	২৫৪
১১।	চন্দ্রা	শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু	২২, ৮৩
১২।	জননী	শ্রীরঙ্গবিহারী প্রামাণিক ...	১৫০
১৩।	দুটী সনেট	শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৩
১৪।	দুটী তারা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ ...	১১৯
১৫।	নির্দ্দয় জগৎ	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন ...	১৬৮
১৬।	নিবেদন	শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য ...	২৩০
১৭।	পাগলিনীর প্রতিহিংসা	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার ...	১৩৭
১৮।	প্রতিবাদ	শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ও শ্রী—ক ...	২৬৬
১৯।	প্রভাত	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত ...	১২১
২০।	প্রাতঃকৃত্য	শ্রীমনোমোহন কবিরত্ন ...	১৪৪
২১।	বঙ্গরঙ্গ ভূমিতে "রজনী"	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার ...	২৫৭
২২।	বর্ষান্তরে	শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত ...	৮১
২৩।	বালিকার আমন্ত্রণ	শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত ...	২৩৫
২৪।	বান্ধবের প্রসিদ্ধ সম্পাদক বাবু কালিপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীভুবনমোহন ভট্টাচার্য্য ...	১৯০

প্রবন্ধ	লেখকের নাম	পত্রাঙ্ক
২৫। বাসন্তী পূর্ণিমা	শ্রীদ্বিজেন্দ্রচরণ গুপ্ত	২৩১
২৬। বিদায়	শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত ...	১৮৫
২৭। রেঙ্গুনে 'পুরুবিক্রম' ও 'নাট্যবিকার'	সম্পাদক	১১০
২৮। বংশাবলী	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	১৮২
২৯। ভদ্রেশ্বর হইতে ত্রিবেণী	„	১৩৪
৩০। মিনার্ভায় "স্বপ্নের ফুল"	শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার ...	১০৩
৩১। রঙ্গভূমির ইতিবৃত্ত	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	৩৪,৫৭,২০২
৩২। রঙ্গভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্ন	„	২৩৪
৩৩। রমণীর সৌন্দর্য্য বোধ ও অলঙ্কার প্রিয়তা	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,	১২৭
৩৪। ষ্টারে চন্দ্রশেখর	শ্রী—প	৯১
৩৫। সমালোচন	——	৪৩
৩৬। সমালোচনা	চোরবাগান সাহিত্যসমালোচক সমাজ*	২৫৫
৩৭। সমালোচনা	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ	১২৪
৩৮। সাহিত্যাদি সংক্রান্ত চিঠিপত্র	প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, অক্ষয়কুমার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পত্র ও তত্ত্বাবধায়কের টিপ্পনী	২৩০
৩৯। স্তোত্র	শ্রীশান্তশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ,	১৪৮
৪০। স্বাস্থ্য	শ্রীমনোমোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন ...	২
৪১। সমালোচনের অনুশীলন	শ্রী—ফ	২১৬
৪২। হাবড়া ঘুসুড়ির বৌদ্ধমঠ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি ...	৬
৪৩। হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর	শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	১১৬

* সমালোচকগণের নাম ক্রমান্বয়ে এই, শ্রী—ম। শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু ও তত্ত্বাবধারক।

অনুশীলনের সমালোচনা।

(১) "অনুশীলন—মাসিক পত্র, ১ম ও ২য় এবং ৩য় সংখ্যা—এই মাসিক পত্রিকা খানির তত্ত্বাবধায়ক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। মাসিক পত্রিকা পরিচালন-সম্বন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয়ের অভিজ্ঞতা বহু কাল হইতেছে, সুতরাং যে হস্তে অনুশীলনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আশান্বিত হইতে পারি। এই তিন সংখ্যায় রঙ্গ-ভূমির ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আমরা অত্যধিক প্রীত হইয়াছি; সম্পাদক মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া নাটকের যে ইতিহাস লিখিয়া যাইতেছেন, সে পথ ইতিপূর্ব্বে কেহ অবলম্বন করে নাই—সুতরাং কেবলমাত্র এই প্রবন্ধ-নিচয়ের নিমিত্তই অনুশীলনের সকলের নিকট সমাদর হওয়া উচিত। অন্যান্য প্রবন্ধ গুলিও বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। সর্ব্বশেষ প্রবন্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। দুই খানি মাসিক পত্রিকার সমালোচনা করিয়া অনুশীলনের ৫ খানি পৃষ্ঠাকে মসীলিপ্ত করাকে আমরা অপব্যয় ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না—ইহাতে পাঠকের বিরক্তি উৎপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নহে; ইহার স্থলে যদি সমুদয় মাসিক পত্রিকাগুলির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে তাহা সুপাঠ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যাহা হউক, উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধারণে অনুশীলন দিন দিন বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করুক—ইহাই আমরা পূর্ণান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।"

—সুলভদৈনিক, ১৩০১ সাল, ২৯শে পৌষ।

(2) We have received the first five numbers of this Bengali monthly edited by Pandit Mahendranath Vidyanidhi. It was not long since that we had an occasion to say, in noticing a book of his, that Pandit Vidynidhi was well known to the literary world as a notable writer of Bengali prose. From the numbers before us, we can say that Pandit Vidyanidhi has well sustained his reputation. The new magazine contains many pieces and it promises to be a welcome accession to the ranks of the Vernacular literature of the day.

Amritabazar Patrika, March 4,1895.

(3) A new Bengali Magazine.—We have received the first three numbers of a new Bengali monthly magazine named *Anushilan*, edited by Pandit Mahendranath Vidyanidhi, who has already achieved for himself a distinguished place amongst Bengali writers. The name of the Magazine is fully vindicated in the series of articles, from the pen of the editor, on the origin of Native theatrical performances in Calcutta, in which many interesting facts have, through the diligence of the writer, been for the first time brought to light. It would appear that the first theatrical performance by a native party, took place in 1833 under the auspices of Nobin Bose of Shambazar, to whom his hobby cost the ransom of a prince, although the party was dissolved in three years, causing

the dissolution of his wealth. What is still more interesting to learn, is, that the feminine parts were performed by females and so skilfully and creditably did the actresses go through their respective roles that the sight inspired the chronicler of the day, the Hindoo Pioneer (1835)—to wax eloquent over the latent intellectual capacity of the softer sex and to expatiate on the necessity of female education. One special feature of this series of performances was, that the nearest approach was made to nature, different scenes being enacted in different parts of a big garden and the audience following the performers from one part to another. The play was Vidya Sundar, and the scene representing the underground passage was no arrangement of canvas and boards, but an actual underground passage of brick and mortar. But those days are gone.

The old actors are dust.
Their names are all lost
But their souls are with the saints we trust.

Hindu Patriot—February 3, 1895

(4). Anushilan vol 1 nos 23. Out of the thirteen papers embodied in the double number of the above magazine before us, no less than six are devoted to the notice of Bengali Theatricals. Five of these, relate to current plays, and the sixth, rather the first and foremost, contains an account of amateur theatricals in Bengali which in point of painstaking research forms a valuable contribution on the subject. The magazine is under the supervision of pandit Mahendranath Vidyanidhi., who seems to have taken an active and important part in its conduct.

Indian Mirror, 23rd Feb., 1895.

(৫) "অনুশীলন নূতন মাসিক পত্র ও সমালোচন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার তত্ত্বাবধায়ক। বিদ্যানিধি মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে 'অনুশীলন' বেশ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে। অনেক নূতন লেখক নবানুরাগে, নূতন উৎসাহে, ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেছেন। 'অনুশীলনে' অনেক বিষয়েরই অনুশীলন হইয়া থাকে। বিদ্যানিধি মহাশয়, নিজে আমাদের দেশীয় রঙ্গভূমির এক দীর্ঘ ইতিবৃত্ত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান, গবেষণা ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ হইলে বাঙ্গালার একটী নূতন জিনিষ হইবে। "অনুশীলনে" বেশ নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভাবে গ্রন্থাদির সমালোচনা হইয়া থাকে। সমালোচক এজন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

জন্মভূমি, ১৩০১। ফাল্গুন।

(৬) "অনুশীলন মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত। এই নবপত্রে বিষয় সন্নিবেশের বৈচিত্র্য ও রচনার পারিপাট্য আছে। নবীন পত্র দীর্ঘজীবী হইলে আমরা সুখী হইব।"

হিতবাদী, ১৩০১ ১১ই ফাল্গুন।

(৭) "আমরা এই পত্রিকার ১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যা পাইয়াছি।" "বৌদ্ধমঠ" ও "সখের থিয়েটারের ইতিবৃত্ত" এই দুইটী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধ গুলিও বড় মন্দ হয় নাই। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ, ১৩০১। ২৮ মাঘ।

(8) "The recent issue of the *Anushilan*, which is edited by the veteran journalist pandit Mahendranath Vidyanidhi, is published. It contains some articles of interest and one among them which we may fully recommend, is the History of the Native stage which reflects credit on the learned pandit, who doubt not, took good deal of troubles in bringing the different stages of growth and developement of the native theatres before the public. It would amply repay a perusal. We wish the Pandit every success and trust he will enlighten the public mind with similarly or more important matters in future."

Queen, Jan, 7th, 1895.

(9) "This is the latest accession to the ranks of periodical literature in Bangali, this being conducted under the supervision of pundit Mahendra nath Vidyanidhi, who enriches the pages of the first issue by an account of amateur theatricals conducted by Bengali gentlemen since 1840. This is an important contribution and unearths many facts which are dying out with the older generation. Some of the other papers furnish entertaining reading.

The "Indian Mirror"—December, 16th, 1894.

(১০) "অনুশীলন পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবারেও মূল্যরূপ। তবে এই সংখ্যাদ্বয়ের প্রবন্ধগুলি উপাদেয় হইয়াছে। 'বঙ্গালয়ের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা কিছু বলিব না। পত্রে চন্দ্রশেখরের সমালোচনা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদর্শনের পর এরূপ নির্ভীক সমালোচনা আমরা অতি অল্পই দেখিয়াছি। 'স্বপ্নের ফুল' কিন্তু আমাদের ভাল লাগিল না। অভিনয়ের সমালোচনা-সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলাম, এই সংখ্যায় তদনুযায়ী কার্য্য হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি-লিখিত "হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর প্রবন্ধটীতে" অনেক শিখিবার বিষয় আছে। সর্ব্বাপেক্ষা এই সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটী কবিতা অতি হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। আমরা পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও উন্নতি কামনা করি।

—সোমপ্রকাশ, ১৩০১ সাল, ১লা মাঘ।

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০১ সাল, ফাল্গুন। { ষষ্ঠ সংখ্যা।

একটী মানবজীবনের পরিণাম।

এই জনতাপূর্ণ মহানগরীর জনতাপূর্ণ পথিমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক দিন না এক দিন এমন এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, যাহাকে দেখিয়াই পূর্ব্ব-পরিচিত বলিয়া বোধ হইয়াছে; অথচ কোথায় কি কারণে তাহার সঙ্গে পরিচয় হয়, তাহার কিছুই স্মরণ হয় না। যেন এখন যে অবস্থায় তাহাকে দেখিলাম, সে অবস্থায় তাহাকে বুঝি অন্য সময়ে দেখি নাই। রোগে জীর্ণ, কষ্টে দারিদ্র্যে মলিন হইয়া সে পথ-প্রান্ত দিয়া অবনত-মস্তকে চলিয়া যাইতেছে; যেন কিছু ত্রস্ত, যেন কিছু শঙ্কিত, নিজের অবস্থায় নিজে লজ্জিত। পাছে কেহ দেখে, পাছে কেহ জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ে ভীত হইয়াই জনতা-মধ্যে আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে। বুঝি কোন সময়ে তাহাকে অন্য অবস্থায় দেখিয়াছিলাম—বুঝি এক দিন সেই ব্যক্তির দেহে বল ছিল—ভাণ্ডারে ঐশ্বর্য্য ছিল, মনে সুখ ছিল। বুঝি এক দিন নিজের প্রতি, জনতার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিবার জন্য সেই ব্যক্তি, পথিমধ্যে, নিজের ঐশ্বর্য্য বিকাশ করিতে বড়ই তৎপর ছিল। যদি তাই হয়, তবে অবস্থার পরিবর্ত্তন বড়ই শোচনীয় দেখিয়া দুঃখের ছায়া পড়িয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে ব্যক্তি জনতা-মধ্যে মিশাইয়া গিয়াছে; কিন্তু মনোমধ্যে দুঃখের ছায়া কিছু ক্ষণের জন্য রহিয়া গিয়াছে।

এক দিন যাহাকে বড়ই সুখী দেখিয়াছি, আবার এক দিন তাহাকে বড়ই দুঃখী দেখিয়াছি। এক দিন যাহাকে আত্মীয়-স্বজন ও দাস দাসীতে পরিবৃত দেখিয়াছি, আবার এক দিন তাহাকে সকলের ঘৃণিত, সকলের পরিত্যক্ত— উদরান্নের জন্য লালায়িত দেখিয়াছি। দুঃখ নানা কারণে ঘটে। অবস্থার পরিবর্ত্তন নানা কারণে ঘটে। কোন কোন সময়ে অবশ্যম্ভাবিনী ঘটনা-পরম্পরা, দুঃখ আনিয়া উপস্থিত করে। তাহার প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকে না। কিন্তু পতঙ্গ যেমন ইচ্ছা করিয়া চেষ্টা করিয়া আগ্রহ-সহকারে বহ্নিতে পড়িয়া পুড়িয়া মরে, সেইরূপ কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়া দুঃখ-সাগরে ঝাঁপ দেয়—ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরে। যে, ইচ্ছা করিয়া বিষ তুলিয়া মুখে দেয়—যে বিষ, ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে অল্পে অল্পে জীবনের শেষ করে, যে বিষ পান করিলে আত্মহারা হইতে হয়, যে বিষ-পানে বিষের তৃষা দিন দিন বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান থাকে, অথচ বিষের আক্রমণ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা থাকে না—এমন দারুণ সুরা-বিষ যে জানিয়া শুনিয়া সাধ করিয়া পান করে, সে আত্মঘাতী নয় তো কি?

কেহ কেহ দুঃখের জ্বালায় সুরার সেবায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের চির দিনের আশা নষ্ট হইয়া যায়। জীবন, মরুভূমি হইয়া যায়। বড় দুঃখ, বড় কষ্ট। জীবন ভাঙ্গিয়া গেল অথচ জীবন নষ্ট হইল না—যন্ত্রণার শেষ হইল না। সেই যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য, সেই কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকে সুরার সেবায় প্রবৃত্ত হয়; ইচ্ছা করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হয়; জীবনে সুখ থাকে না; জীবন ভার বোধ হয়; সেই জন্য ভার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সে রূপ কয় জন? অধিকাংশই ক্ষণিক সুখের নিমিত্ত মদ্যপানে উন্মত্ত। পরে এই দারুণ বিষের বিষম ফল, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, ভোগ করিতে থাকে।

এই মহানগরীর একটী ক্ষুদ্র পল্লী মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পথের ধারে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে শেষোক্ত প্রকৃতির এক জন সুরাপায়ীর পত্নী, মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। রাত্রি দ্বিপ্রহর। গগন মেঘাচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিক্ ঘোর অন্ধকারাবৃত। বায়ুর সঞ্চার নাই, বৃক্ষপত্রটী পর্য্যন্ত কম্পিত হয় না; জগৎ সুপ্ত নিস্তব্ধ। কুটীর মধ্যে একটী প্রদীপ। ক্ষীণ আলোক জ্বলিতেছে। কুটীর অমার্জ্জিত, অপরিচ্ছন্ন ও

দারিদ্র্য-চিহ্ন-ব্যঞ্জক। একটী ছিন্ন শয্যোপরি একটী কঙ্কালাবশিষ্টা রমণী, মৃত্যু-যন্ত্রণায় অস্থিরা। তাহার মস্তকের নিকট একটী বালিকা বসিয়া সযত্নে রমণীর মস্তকটী উপাধানে তুলিয়া দিতেছে—কিন্তু রোগের যন্ত্রণায় রমণী অধীরা। উপাধানে তাহার মস্তক থাকিবে কেন? উপাধান হইতে মস্তক সরিয়া পড়িতেছে। বালিকা আবার সন্তর্পণে শির, উপাধানে তুলিয়া দিতেছে ও নীরবে অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে।

ক্ষণেক পরে নারী, অতি ক্ষীণ স্বরে কি বলিল, বালিকা বুঝিতে পারিল না।

"কি বল্‌ছ মা?" বলিয়া বালিকা, জননীর মুখের কাছে কর্ণ লইয়া গেল।

রমণী তদ্রূপ ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "রাখাল এসেছে?"

বালিকা। "না।"

রমণী। "তবে বুঝি এ জন্মে আর দেখা হ'ল না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া রমণী নীরব হইল।

বালিকা ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা! একটু দুধ খাবে কি?"

রমণী। দয়াল এক বার যাক্।

বালিকা। তা যাচ্ছে। তুমি একটু দুধ খাবে কি?

রমণী। না, একটু জল দাও।

বালিকা ধীরে ধীরে তিন চারি বিন্দু জল, মায়ের মুখে দিল। রমণী অতি ধীরে অতি কষ্টে সেই জল টুকু গলাধঃকরণ করিল। বালিকা মায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু, বালিকার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল।

রমণীর তিনটী পুত্র ও এক কন্যা। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রাখাল; বহু ক্ষণ হইল, আপন মাতার আসন্ন-মৃত্যু-সংবাদ লইয়া পিতার অনুসন্ধানে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। রমণীর সাধ, মৃত্যু-সময়ে এক বার স্বামীকে দর্শন করে। হিন্দু-রমণীর স্বামী বড়ই অন্তরের বস্তু—বড়ই যত্নের ধন। বনিতার নিকট স্বামী সাক্ষাৎ দেবতা। অতি শৈশবাবস্থা হইতে তাহারা

আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হয়। স্বামী ভাল হউক, মন্দ হউক, হিন্দু-রমণী স্বামীকে দেবতা ভিন্ন অন্য কোন রূপে ভাবিতে জানে না। সেই জন্য আজি এত দুঃখে, এত কষ্টে, এত যাতনাতেও, নারী, মৃত্যুসময়ে এক বার স্বামী-সন্দর্শন-প্রার্থনা করিতেছে।

অপর দুই সন্তান দয়াল ও গোপাল, কুটীরের এক ধারে বসিয়া নিঃশব্দে এই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিতেছিল ও নীরবে রোদন করিতেছিল। এখনই মাতা, জন্মের মত ছাড়িয়া যাইবেন, ইহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ বিষম শোক ধরে না—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। চীৎকার করিয়া তাহাদের রোদন করিতে শত বার ইচ্ছা হইতেছিল; কিন্তু কি করে? কাঁদিলে মা কাঁদেন, তাই চীৎকার করিয়া রোদন করিতে পারিতেছিল না।

মায়ের মুখে "দয়াল এক বার যাক্" এই কথা শুনিয়া দয়াল, পিতার অনুসন্ধানে রাখালের অনুসন্ধানে কুটীর হইতে বহির্গত হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই দয়াল দেখিল, রাখাল পিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছে। সে শুনিল, পিতা জড়িত-স্বরে রাখালকে বলিতেছে, "যদি তোর মিছে কথা হয়, এক-কিলে তোর মাথার ঘি বার্ করে' ফেল্‌ব।"

দয়াল আর অপেক্ষা করিল না, কুটীরাভিমুখে ফিরিল। কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "বাবা আস্‌ছেন।"

রমণী কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিল, "কোথা?"

অমনই কুটীর-দ্বার সবেগে উন্মুক্ত করিয়া কম্পিত-পদে সুরাপায়ী কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সুরাজনিত মত্ততা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল, হৃদয় মথিত হইয়া গেল।

বামা, ক্ষীণ বামা-স্বরে বলিল, "কাছে এস। অত দূরে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।"

সুরাপায়ী কি করিবে কি উত্তর দিবে, কি করিয়া অগ্রসর হইবে! অতীত ঘটনার স্মৃতি—সুখের স্মৃতি—দুঃখের স্মৃতি রমণীর অপরিমেয় ভালবাসার স্মৃতি—নিজের নৃশংস আচরণের স্মৃতি যুগপৎ প্রবল বেগে হৃদয় মধ্যে প্রবা-

হিত হইয়া এক তুমুল কাণ্ড উপস্থিত করিল; তাহাতে তাহার হৃদয়কে ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিল। তাহার ইচ্ছা, রমণীর নিকটে যায়; কিন্তু হস্ত, পদ যেন আবদ্ধ। সর্ব্ব শরীর নিশ্চেষ্ট; হৃদয় শতবিদীর্ণ। সে বাসনা করে, চীৎকার করিয়া রোদন করে, কিন্তু গল-দেশ যেন রুদ্ধ—বাক্য নিঃসৃত হইতেছে না, কাঁদিবে কে?

রমণী আবার বলিল, "এক বার কাছে এস।"

সুরাপায়ী বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিল।

রাখাল আসিয়া পিতার হস্ত ধরিয়া পিতাকে মাতার মুখের নিকট লইয়া গেল।

রমণী বলিল, "আমি চল্‌লেম। আমার বড় ভাগ্য, তাই তোমায় রেখে চল্‌লেম। একেবারে অনেক কথা বল্‌তে পার্‌ব না, সে ক্ষমতা নেই।"

বালিকা, মায়ের মুখে দুই চারি বিন্দু জল দিল।

কামিনী, কিঞ্চিৎ পরে আবার বলিল "তোমার এই সব ছেলে মেয়ে রইল, আমায় যেমন হেনস্তা করেছ, এঁদের হেনস্তা ক'রো না।"

রমণী আবার নীরব হইল। বালিকা আবার মায়ের মুখে দুই চারি বিন্দু জল দিল।

রমণী পুনরায় বলিল, "পায়ের ধূলো দাও, আশীর্ব্বাদ কর, পর-জন্মে যেন তোমায় নিয়ে সুখিনী হই।" এই বলিয়া রমণী অতি কষ্টে শীর্ণ দক্ষিণ হস্ত খানি প্রসারণ করিল। হস্ত, স্বামীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যায় পড়িয়া গেল।

সেই স্পর্শে সুরাপায়ীর দেহ চমকিত হইল। তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুদ্বেগে শোণিত-প্রবাহ ছুটিল। "কোথা যাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া সে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। বালক-বালিকাগণও আর থাকিতে পারিল না; সেই সঙ্গে রোদন করিয়া উঠিল। রমণীর শুষ্ক গণ্ডদেশ বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল।

রমণীর আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। এক বার মাত্র কম্পিত করে, নিজ ললাট দেশ স্পর্শ করিল। ক্রমে তাহার হস্ত পদ শিথিল হইয়া আসিল; দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল, নয়নের পুত্তলী মলিন হইয়া স্থির হইয়া আসিল,

শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। বালিকা এতাদৃশ বিকৃত ভাব দেখিয়া মায়ের মুখে কিঞ্চিৎ জল দিল। জল, মুখ হইতে চিবুক বহিয়া পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে রমণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। সকল যন্ত্রণার শেষ হইল। বালকবালিকাগণ পুনরায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল। গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সেই রোদনধ্বনি, নৈশ-গগনে উত্থিত হইল। সুরাপায়ী অসহ্য যন্ত্রণায় বেগে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

তার পর সে, পথে পথে সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিতে লাগিল। কেহই তাহার অনুসন্ধান লইল না, কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিল না। এক সময়ে তাহার কত বন্ধু ছিল, কত আত্মীয় ছিল! বিনা কারণে বা সামান্য কারণে তাহারা আসিয়া কত আত্মীয়তা প্রকাশ করিত! আজি তাহারা কোথায়—একে একে সকল বন্ধু, সকল আত্মীয়ই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেবল তাহার পত্নী সুখে, দুঃখে, দারিদ্র্যে, রোগে, কষ্টে সকল অবস্থাতেই তাহাকে অবলম্বন করিয়াছিল। কত দিন সুরাপায়ী, পত্নীকে অযথা প্রহার করিয়াছিল; কিন্তু সে এক দিনও একটী দুর্ব্বাক্য বলে নাই।

ক্রমে প্রভাত হইল। পথে লোক-সমাগম হইতে আরম্ভ হইল। সুরাপায়ী এক মদের দোকানের সম্মুখে যাইয়া বসিল। দোকান খুলিবামাত্র সুরাপায়ী দোকানে প্রবিষ্ট হইল। এত ক্ষণ লজ্জা, ভয়, অনুতাপ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। সে এক গেলাস মদ উদরস্থ করিল। এক গেলাসের পর আর এক গেলাস—তার পর আর এক গেলাস। সুরা উদরস্থ হইল। শোণিত-প্রবাহ মস্তকের দিকে ছুটিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। সুরাপায়ী একে একে সকল কল্পনা বিস্মৃত হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—মৃত্যু? মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী। মরে না কে? কেনই বা সে না মরিবে? সে বড়ই ভাল ছিল। আমার অদৃষ্টে থাকিবে কেন? যাহা হইয়াছে, ভালই হইয়াছে। দুঃখ করিলে তাহাকে ফিরাইয়া পাব কি? আর এক গেলাস। হাঃ-হাঃ এ দেহ স্ফূর্ত্তির জন্য, যত ক্ষণ প্রাণ আছে, স্ফূর্ত্তি চাই।

অনেক প্রতিবাসী, রাখালকে সঙ্গে লইয়া সেই সুরাপায়ীকে সেই অবস্থাতেই পত্নীর চিতা-পার্শ্বে লইয়া উপস্থিত করিল।

(২)

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। অযত্নে, দুঃখে কষ্টে সন্তানেরা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বালকেরা ক্রমে যুবা হইল, অসৎসঙ্গে বিনা শিক্ষায় দুশ্চরিত্র হইল। বালিকা, বিবাহ-যোগ্যা হইল; কিন্তু বিবাহ হইল না। নির্ধনের কন্যাকে বিবাহ কে করিবে? পিতার সে বিষয়ে কোন উদ্যোগ নাই। কে তাহার কন্যার বিবাহ দিবে? বিশেষতঃ কন্যাটীর বিবাহ দিলে চলে না, পুত্রেরা ক্রমে ক্রমে সকলেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে; কন্যটী কোন গৃহস্থের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা কিছু লইয়া আইসে, তাহাতেই আপাততঃ চলিতেছে। কন্যাটীর বিবাহ দিলে সে পথ বন্ধ হয়, কাজেই এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ হইল না।

সময়ে সকলই পরিবর্ত্তিত হইল। কত বস্তুর হ্রাস, কত বস্তুর বৃদ্ধি, কত বস্তুর লয়, কত বস্তুর জন্ম, হইল। নানা বিষয়ের নানা রূপ পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু সুরাপায়ীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। সে আজিও সেই সুরার দাস। ভিক্ষায় হউক, প্রবঞ্চনায় হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, তাহার যাহা কিছু সংগৃহীত হইতে লাগিল, তাহা সুরার সেবায় নিয়োজিত হইল। দারিদ্র্য, কষ্ট, আত্মীয়-স্বজনের অনাদর কিছুতেই তাহার চৈতন্য হইল না। অনাহারে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইতেছে, কিঞ্চিৎ সুরায় সে কষ্ট নিবারণ হইবে। রোগের যন্ত্রণা অসহ্য, এক টুকু সুরা তাহার মহৌষধ।

প্রায় এক পক্ষ হইল, কন্যাটীর পীড়া হইয়াছে। কাজেই সে কাজে যাইতে পারে না, গৃহকর্ম্ম করিতে পারে না। সকল দিকই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। কন্যাটী মাত্র ভরসা, কিন্তু সেটীও রুগ্না। গৃহে যাহা কিছু ছিল, ক্রমে ক্রমে সমস্তই নিঃশেষ হইল। সমস্ত দিন সুরাপায়ীর কিছুই আহার হইল না। না হউক, একটু সুরা হইলে চলিত, কিন্তু কি করিবে? সুরা ক্রয় করিবার অর্থ নাই। সর্ব্বনাশ! কি উপায়? সুরা না পাইলে যে প্রাণ বহির্গত হইয়া যাইবে। মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল, নিরুপায় হইয়া ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইল। যাহা কিছু পাইল, তাহার অর্দ্ধেকে সুরাপান করিয়া জীবন শীতল করিল, অবশিষ্ট অর্দ্ধেকও এইরূপ সদ্ব্যবহারে নিয়োজিত করিতে নিতান্ত বাসনা সত্ত্বেও সে কষ্টে লোভ সংবরণ করিল। কন্যাটীর জন্য কিছু ভাল খাদ্য সামগ্রী আবশ্যক; কিছু ভাল আছে, এই সময়ে

একটু যত্ন করিলে, শীঘ্র আরোগ্য হইবে। যত শীঘ্র আরোগ্য হয়, ততই মঙ্গল। অর্থ চাই, অর্থ বিনা সুরা হয় না। কন্যাটী আরোগ্য না হইলে কে পরিশ্রম করিবে, কে পরিশ্রম করিয়া অর্থ আনিবে? এই ভাবিয়া কন্যাটীর জন্য কিছু খাদ্য লইয়া গৃহে চলিল

গৃহে আসিয়া দেখিল পীড়িতার শয্যা পার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি উপবিষ্ট। ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, পরে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; দেখিয়া চিনিতে পারিল, সে তাঁহারই মধ্যম পুত্র। একেবারে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, মুখ বিকৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "এখানে মর্‌তে এলি কেন"? পুত্র কোন উত্তর করিল না, কেবল পিতার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিল। কন্যার হৃদয় কম্পিত হইল, দেখিল লক্ষণ ভাল নয়। অতি কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া পিতার চরণে নিপতিত হইল। রোদন করিতে করিতে কহিল, "বাবা চুপ কর, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

পিতা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল "তোর কি চাই?"

পুত্র। আশ্রয়, লুকাবার স্থান, আমার ভয়ানক বিপদ্, পুলিষে আমায় ধর্‌লে আমার ফাঁসি হ'বে, আমাকে স্থান না দিলে আমি ধরা পড়্‌ব।

এই বলিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিল।

পিতা ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল "তুই কি করেছিস্?"

পুত্র উত্তর করিল "খুন।" ক্ষণেক পরে কহিল, "এটা কি অধিক আশ্চর্য্যের কথা" এই কথা বলিয়া পিতার মুখের প্রতি পুনরায় চাহিল; পিতার আর তাহার প্রতি চাহিতে সাহস হইল না।

অনেক ক্ষণ পরে পিতা জিজ্ঞাসা করিল, "আর আর হতভাগারা কোথা?"

পুত্র উত্তর করিল, "দাদা দ্বীপান্তর গেছে আর রাখাল মরেছে"। মরেছে এই কথা শ্রবণমাত্র পিতার আপাদ-মস্তক কম্পিত হইয়া উঠিল।

পুত্র উত্তর করিল "খুন হ'য়েছে—এক জন বদমায়েসের সঙ্গে দাঙ্গা কর্‌তে কর্‌তে বদমায়েস তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সে আমার হাতের

উপর ঢলে' পড়্‌ল। আমার হাত ব'য়ে তার রক্ত, ঝর ঝর করে' পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে মর্‌বার সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লে "দাদা আমি মার কাছে চল্‌লাম, আমি মার আদরের ছেলে ছিলেম। মা নাকি কখন আমার তিরস্কার করে নি? দাদা, মা না মরে' যদি বাবা মর্‌ত! যে দিন তুমি মদের ধমকে রাখালকে বেদম্ মেরেছিলে, সেই দিন আমরা প্রাণভয়ে বাড়ী ছেড়ে' পালাই। দেখ, শেষে কি ফল হল।"

এই সকল শুনিয়া কন্যাটীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পিতা সেইস্থানে বসিয়া পড়িল।

আবার পুত্র বলিল, "যে রাখালকে খুন করেছিল, আমি তাকে খুন করেছি। আমার সন্ধানে চারি দিকে লোক ঘুর্‌ছে, ধর্‌তে পার্‌লেই আমার প্রাণ যাবে। এ অতি নির্জ্জন স্থান। তুমি না বল্‌লে এস্থানে কারও সন্ধান পাবার উপায় নাই; আমাকে দুই চারি দিন লুকায়ে রাখ, সুবিধা পেলেই আমি এদেশ হ'তে পালাব।"

দুই দিন তিন জনে একত্র রহিল। অর্থের আবশ্যকও বাড়িল; যাহা কিঞ্চিৎ ছিল, সমস্তই শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া গেল। কন্যাটী এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই, কে অর্থ আনিবে? কাজেই পিতা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নের জন্য বহির্গত হইল। ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পথে মদের দোকান। ও দিকে আর না চাহিয়া দ্রুতপদে দোকান অতিক্রম করিল। আর পা উঠিল না—দাড়াইল—ফিরিয়া দোকানের সম্মুখে আসিল। হৃদয়-মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কি করে? কি করিয়া চির দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করে? হৃদয়ের বেগ আর সহ্য করিতে পারিল না। আপনা হইতে পদ, দোকানের দিকে অগ্রসর হইল। পদে পদে সুরাপায়ী সুরার চরণ-মূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা কিছু সম্বল ছিল, সুরার পূজায় ব্যয় করিল। সেদিনকার সম্বল অতি অল্প; সুতরাং মনের আক্ষেপ মিটিল না। যাহা কিছু সঙ্গে ছিল, সমস্তই নিঃশেষ হইয়াছে—আর অর্থ নাই। সে ইতস্তত করিতে লাগিল।

সেই দোকানের অল্প দূরে দুই ব্যক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল।

সুরাপায়ীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহারা দোকানে প্রবেশ করিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া সুরাপায়ীর স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া কহিল "কি হে চিন্‌তে পার ?"

সুরাপায়ী কিছু থতমত হইয়া, উত্তর করিল "কৈ না।"

সে ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে কহিল "সে কি হে ? এরই মধ্যে ভুলে' গেলে ? আচ্ছা ব'সো। পরস্পর পরিচয় করা যাক।" এই বলিয়া সুরা-বিক্রেতাকে কহিল "ওহে আমাদের এক বোতল ব্রাণ্ডি দাও।" সে কয়েকটী মুদ্রা তাহার সম্মুখে ঝণাৎ করিয়া ফেলিয়া দিল। সুরার নামে মুদ্রার শব্দে সুরাপায়ীর মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। মনে ভাবিল—অবশ্যই এ ব্যক্তি কোন বাল্যবন্ধু, অতি সজ্জন, চিনিতে পারিয়াছে তাহাতেই এত যত্ন করিতেছে। এমন যত্ন অনেক দিন কাহারও নিকট পাই নাই। সুরার নামে এই মরীচিকা উৎপন্ন হইল— এই ইন্দ্রজাল প্রকটিত হইল। সুরাপায়ীর মন এই ভয়ানক প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইল।

মদ্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিন জনে একত্র উপবিষ্ট হইয়া সুরার সেবায় নিযুক্ত হইল।

একবার মাত্র রুগ্না কন্যার কথা সুরাপায়ীর মনে পাড়ল, একবার মাত্র বিপদ্‌গ্রস্ত সন্তানের কথা সুরাপায়ীর স্মরণ হইল। সুরা উদরস্থ হইল আর সুরাপায়ী সমস্ত কথা ভুলিয়া গেল।

এক, দুই, তিন গেলাস সুরা সুরাপায়ীর উদরস্থ হইলে পর তাহার সমক্ষে প্রথম আগন্তুক দ্বিতীয় আগন্তুককে উদ্দেশ করিয়া বলিল "এত ক'রে সমস্ত ঠিক্ ক'রলেম্ কিন্তু সে কোথা ?"

দ্বিতীয় আগন্তুক তদ্রূপ ভাবে উত্তর করিল, "আজ রাত্রে বড় সুবিধা ছিল, এর পরে হওয়া দায় হবে।"

সুরাপায়ী ক্ষিপ্তের ন্যায় উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রথম আগন্তুক এক পাত্র মদ্য ঢালিয়া "খাও ভাই" বলিয়া সুরাপায়ীর হস্তে দিল। পরে আপনা আপনি বলিতে লাগিল "কত করে' টাকা যোগাড় করে রেঙ্গুনের টিকিট কিন্‌লেম—বেনামা করে' টিকিট কিনলেম, পাছে কোন

গোলযোগ হয়। আজ রাত্রেই জাহাজ ছাড়্‌বে। কাজ মিটে যেত, কিন্তু তাকে পাই কোথা? সুরাপায়ী পাত্রস্থ মদ্য শেষ করিল।

দ্বিতীয় আগন্তুক আর এক পাত্র মদ্য ঢালিয়া সুরাপায়ীর হস্তে দিয়া বলিল, "এ গেলাসটী খাও ভাই! আমি হাতে করে' দিচ্ছি আমার মান্ রাখ্‌বে না—" পরে প্রথম আগন্তুককে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল "এমন সুবিধা আর হবে না, এখনও এখানকার পুলিষে বোধ হয় খবর পায় নি, গোলযোগ হ'লে এর পরে 'সুরা' দায় হবে। কিন্তু তারই বা অপরাধ কি? এতটা যোগাড় হবে, এখানে আস্‌বার সময় সে তো জানত না। তা হ'লে সে ঠিকানা বলে' আসত।"

এ পাত্রটীও শেষ করিয়া সুরাপায়ী জিজ্ঞাসা করিল "কার কথা বল্‌ছ?"

প্রথম আগন্তুক বলিল, 'তোমারি মেজ ছেলে গোপালের কথা কেন আমাদের কথা সে কি তোমায় বলে নি?'

সুরাপায়ী বলিল 'কৈ না?'

আগন্তুকদ্বয় পরস্পরের দিকে চাহিল।

প্রথম আগন্তুক এক পাত্র সুরা ঢালিতে ঢালিতে বলিতে লাগিল 'আমরা গোপালকে নিজের ছেলের মত ভালবাসি, তাই এত যোগাড় করে' এত দূর পর্য্যন্ত তার জন্য এসেছি।' এই বলিয়া পাত্র সুরাপায়ীর হস্তে দিল। সুরাপায়ী পাত্রস্থ সুরা উদরস্থ করিল।

প্রথম আগন্তুক আর এক পাত্র সুরা ঢালিয়া বলিতে লাগিল "তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে, হয়েছে ভাল। আজ রাত্রেই গোপালকে সরাতে হবে।" পাত্রটী সুরাপায়ীর হস্তে দিল, সে পাত্রটীও নিঃশেষিত হইল।

এইরূপ মুহূর্ত্তেক মধ্যে আগন্তুকদ্বয় গোপালের সমস্ত সন্ধান জানিয়া লইল। জানিয়া লইয়া উভয়ে সুরাপায়ীর সহিত কুটীরাভিমুখে চলিল।

নিভৃতে কুটীর মধ্যে ভ্রাতা ও ভগ্নী প্রাণ-ভয়ে লুক্কায়িত হইয়া পথিমধ্যস্থ প্রত্যেক শব্দ, ভয়ে ও সন্দেহে শ্রবণ করিতেছিল—সময় আর কাটে না। বহু ক্ষণ পরে পথে পদশব্দ শ্রুত হইল। বোধ হইল, কে যেন কুটীরাভিমুখে আসিতেছে। কন্যা, পদশব্দ-শ্রবণে বুঝিতে পারিল, ইহা তাহার পিতারই

পদশব্দ। বুঝিতে পারিল, পিতা প্রকৃতিস্থ নাই। পিতা, ক্রমে কুটীরে প্রবেশ করিল।

কন্যা একটী আলোক লইয়া পিতাকে লইয়া আসিতে অগ্রসর হইল। দেখিল, কুটীর-দ্বারে পিতার সহিত অপর দুই ব্যক্তি। দেখিয়া চীৎকার করিয়া কন্যাটী সেই খানে মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। অমনই আগন্তুক দুই ব্যক্তি কুটীর-মধ্যে বেগে প্রবিষ্ট হইয়া গোপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল।

সুরাপায়ী, কুটীরের এক কোণে দণ্ডায়মান হইয়া বিহ্বলের ন্যায় এই সকল ব্যাপার দেখিতে লাগিল।

আগন্তুকদ্বয়, গোপালকে ধরিয়া লইয়া চলিল। যাইবার সময় গোপাল মূর্চ্ছিতা ভগ্নীর প্রতি ক্ষণেক নীরবে চাহিয়া রহিল। পরে পিতার দিকে ফিরিয়া বলিল—"তুমি ইচ্ছা ক'রে মাকে যমের হাতে দিয়েছিলে; মনে কর দেখি, তাঁকে কত কষ্ট দিয়েছিলে—কত যন্ত্রণা দিয়েছিলে। তোমার অত্যাচারে তার বুক ভেঙ্গে গিয়েছিল। শেষে তাঁর সকল জ্বালা চিতার আগুনে শেষ হয়েছে। তোমারই জন্য দাদা দ্বীপান্তর গিয়েছে, তোমারই জন্য রাখাল মরেছে। আজ তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে যমের হাতে দিলে। এক দিনের তরে আমরা তোমার কাছে যত্ন পাই নাই, এক দিনের তরে মিষ্ট কথা শুনি নাই, এক দিনের তরে তুমি আমাদের ভাল করে' দেখ নাই। আমার মৃত্যুর সময়—আর আমার মরিবার বাকী কি? আমি তোমাকে বলছি "তুমি মনে রেখো, এক দিন ইহার ভয়ানক শাস্তি, তোমাকে ভোগ করতে হবে; আর তখন আমার এই মর্ম্মান্তিক কথা গুলি তোমার মনে হ'য়ে তোমাকে জীবন্তেই দগ্ধ করতে থাকবে।"

গোপালের চক্ষু রক্তবর্ণ, নাসারন্ধ্র স্ফীত, ক্রোধে গ্রীবা ঈষৎ বক্র ও মনের আবেগে সর্ব্বশরীর কম্পিত। মধ্যে মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তের আন্দোলনে শৃঙ্খলের শব্দ হইতেছিল।

গোপালের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ও ভয়াবহ কথা শুনিয়া সুরাপায়ীর হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া গেল।

ইহ জন্মে পিতা-পুত্রের ভ্রাতা-ভগ্নীর আর দেখা হইল না।

(৩)

পর দিবস যখন সুরাপায়ীর সুরাজনিত মত্ততা দূর হইয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন বেলা প্রায় এক প্রহর হইয়াছে; কিন্তু শীতকাল, কুজ্ঝটিকা প্রযুক্ত তখনও সূর্য্য প্রকাশিত হন নাই। কুটীর-মধ্যে সামান্য-মাত্র আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুরাপায়ী দেখিল, কুটীর মধ্যে সে একাকী রহিয়াছে। কন্যার ছিন্ন শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিল, শয্যায় কেহ নাই; শয্যায় কেহ ইতি-পূর্ব্বে শয়ন করিয়াছিল, বলিয়াও তাহার বোধ হইল না। সে দেখিল, কুটীর-মধ্যস্থ সামগ্রীগুলি পূর্ব্ব রাত্রিতে যেখানে যে ভাবে ছিল, এখনও ঠিক সেই খানে সেই ভাবে রহিয়াছে। ভাবিল, কন্যা বুঝি কার্য্যান্তরে কুটীরের বাহিরে গিয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিবে। অনেক ক্ষণ সে অপেক্ষা করিল, কিন্তু কন্যা ফিরিয়া আসিল না। তখন সুরাপায়ী উঠিয়া কন্যার অনুসন্ধানে বহির্গত হইল।

প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল; কেহ কিছু বলিতে পারিল না। পথে পথে কন্যার অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। যেখানে জনতা দেখে, সেই খানেই যায়; ভাবে, জনতা-মধ্যে কন্যাকে পাইবে। পথবাহী লোক-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লগিল; কেহ কেহ সমস্ত শুনিয়া বলিল "দেখি নাই বাপু।" কেহ বা বিরক্ত হইয়া গালি দিয়া চলিয়া গেল। অনেক দিন অবধি সুরাপায়ীর সন্দেহ হইয়াছিল, যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কন্যাটী তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। বুঝি এত দিনে তাহাই ঘটিল। সমস্ত দিন অনুসন্ধান করিয়া কিছুই হইল না। সে, ঘুরিয়া আসিয়া কুটীর মধ্যে একাকী রাত্রি যাপন করিল। পর দিন আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু সে দিনও নিষ্ফল হইল। এরূপ সপ্তাহ কাল অতীত হইল। তখন সুরাপায়ীর নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, তাহার কন্যা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই অবস্থায় অনাহারে মরিবার জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সুরাপায়ী, কন্যাকে দারুণ অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

সুরাপায়ী তখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। দয়া করিয়া যদি কেহ তাহাকে একটী পয়সা দিত, সে তৎক্ষণাৎ তাহা সুরা-সেবায় নিয়োজিত করিত। এক বৎসর অতীত হইল। আশ্রয়হীন সুরা-

পায়ী পথ-প্রান্ত ভগ্নাবশেষ জনহীন অট্টালিকার কোন অংশে কাহারও বাটীর সম্মুখে যে কোন স্থানে যেখানে হিম বা বৃষ্টি হইতে কথঞ্চিৎ নিস্তার আছে. সেই. খানে, পড়িয়া নিদ্রা যাইত ও দিবসে ভিক্ষা করিত। অতীব দারিদ্র্যগ্রস্ত, বিষম-রোগগ্রস্ত ও আশ্রয়হীন হইয়াও সুরাপায়ীর সুরার প্রতি ভক্তি অচলা রহিল।

শীতকালে সন্ধ্যার পরই মহানগরীস্থ পথিমধ্যেও জনসমাগম মন্দীভূত হইয়া আইসে। বিশেষতঃ সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। রাত্রিকালে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন—অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, বায়ু অল্প বেগে বহিতেছে। শীতে বৃষ্টি বড়ই অসহ্য। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে ইচ্ছা করিয়া এরূপ সময় কেহ পথে যাইতে চাহে না, কাজেই পথ প্রায় জনহীন, মধ্যে, মধ্যে দুই একটীমাত্র পথিক বেগে পথ অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে। এমন সময়ে সুরাপায়ী আসিয়া একটী রুদ্ধদ্বার বাটীর সম্মুখস্থ সোপানোপরি উপবিষ্ট হইল। সুরাপায়ীর শরীর জীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ, দেহ-যষ্টি বক্র, গণ্ডস্থল শুষ্ক, নয়নদ্বয় কোটরগত, রক্তবর্ণ অথচ জ্যোতিহীন। সেই জ্যোতিহীন নয়নদ্বয় হইতে এক এক বিন্দু জল-মধ্যে মধ্যে শুষ্ক গণ্ডস্থল বহিয়া স্বেচ্ছায় পড়িয়াছে। মস্তকে কেশ বিরল, অথচ দীর্ঘ হস্ত-পদ সর্ব্বদা কম্পিত, পরিধানে একখানি মলিন শতগ্রন্থি বস্ত্র, তাহাও বৃষ্টিধারায় সিক্ত। শীতে বৃষ্টিতে কম্পিত-কলেবরে সুরাপায়ী আসিয়া সোপানোপরি উপবিষ্ট হইল।

সুরাপায়ীর, সমস্ত দিন আহার নাই—দারুণ শীতে দেহের মজ্জা পর্য্যন্ত শীতল হইয়া যাইতেছে। সিক্ত বস্ত্রে; বিনা আশ্রয়ে আজি সুরাপায়ীর বড়ই কষ্ট। বড় কষ্টেই আজি পূর্ব্ব-সুখের স্মৃতি, হৃদয়-মধ্যে জাগিয়া উঠিল। সুন্দর, সুসজ্জিত, অট্টালিকার কথা মনে পড়িল। মনে হইল, কোথায় সেই অট্টালিকার সজ্জিত প্রকোষ্ঠমধ্যে সুখসেব্য শয্যায় সুকোমল উপাধানে মস্তক রাখিয়া সুখে শয়ন করিয়া থাকিত, সেই অট্টালিকার অধিপতিকে দাস দাসী আসিয়া কত সেবা শুশ্রূষা করিবে, না, কোথায় এই দারুণ শীতে নিরাশ্রয়ে পথে পতিত! ক্রমে নিজের ঐশ্বর্য্যের কথা মনে পড়িল, বন্ধু-বান্ধবদের কথা মনে পড়িল, সুখের দিনের আনন্দোৎসবের কথা মনে পড়িল। ক্রমে

নিজের অধঃপতনের কথা মনে পড়িল; কেমন করিয়া পদে পদে অল্পে অল্পে অধঃপতন হইয়াছে, তাহা মনে পড়িল। ক্রমে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগের কথা, তাহাদের প্রতি কিরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছে, তাহা মনে পড়িল। সুরাপায়ী শিহরিয়া উঠিল। চিন্তনীয় বস্তুরও অভাব নাই, চিন্তা-স্রোতের বিরাম নাই। ক্রমে সুরাপায়ী জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন একটী সজ্জিত গৃহে সে উপবিষ্ট। গৃহে নানাবিধ সুখদ্রব্য খাদ্যসামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে, বহুসংখ্যক নির্ম্মল স্ফটিক পাত্রে সুরা পূর্ণ রহিয়াছে। সুরা, পাত্র হইতে উথলিয়া পড়িয়া যাইতেছে, হস্ত প্রসারণ করিলেই ধরিতে পারে। সমস্ত দিবস কিছুমাত্র আহার হয় নাই, উদর পূরিয়া আহার বহু কাল ঘটে নাই। ক্ষুধার জ্বালায় অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সম্মুখে এত খাদ্য-সামগ্রী আর চিন্তা কি? সুরাপায়ী যেমন আনন্দে বেগে খাদ্য সংগ্রহ করিতে যাইবে, কি অমনই বৃষ্টিপাত-জনিত পিচ্ছিল সোপানাবলিতে পদ-স্খলিত হইয়া পথি মধ্যে পড়িয়া গেল।

সুরাপায়ী সংজ্ঞা পাইয়া উঠিল। উঠিয়া অতি কষ্টে অনতিদূরে দ্বার-দেশে পথ-প্রান্তে একটী আশ্রম ছিল, তথায় যাইয়া বসিল। পথে তখনও দুই একটী লোক যাইতেছে। সুরাপায়ী অস্ফূট স্বরে তাহাদের নিকট ভিক্ষা চাহিল। কিন্তু কেহ সুরাপায়ীর কথা শুনিতে পাইল না, বা শুনিয়াও কর্ণপাত করিল না। সুরাপায়ীর তখন হঠাৎ মনে হইল, এ বিষম যন্ত্রণার একমাত্র মহৌষধ মৃত্যু। ভাবিতে ভাবিতে বেলা হইল। কে যেন তাহার পশ্চাৎ হইতে বলিতেছে, 'তবে আর কি মর্‌বে চল' সুরাপায়ী ত্রস্ত ফিরিয়া দেখিল। দেখিল কেহই নাই। সম্মুখে চাহিল, দেখিল, তাহার স্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া মলিন মুখে সজল চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, দৃষ্টি বড়ই স্নেহব্যঞ্জক! দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন নিজে এক ভীষণ শ্মশানমধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। চারি দিকে অনেক গুলি চিতা। চিতাগুলি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, দেখিতে দেখিতে একটী জ্বলন্ত চিতা মধ্য হইতে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্থিত হইল! পুত্র যেন রোষ-কষায়িত-লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মাতার দিকে দেখাইতেছে। অমনই অপর একটী চিতা হইতে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র উত্থিত হইল। তাহার বক্ষঃস্থল

হইতে শোণিত-প্রবাহ নির্গত হইতেছে।এক হস্তে ক্ষত স্থান ধরিয়াছে, অঙ্গুলি মধ্য হইতে রক্ত-ধারা ছুটিয়াছে, অপর হস্তে মাতার দিকে দেখাইতেছে। হঠাৎ বিকট হাস্যধ্বনি সুরাপায়ীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সুরাপায়ী দেখিল, তাহার মধ্যম পুত্র চিতাগ্নি-মধ্য হইতে উথিত হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে সুরাপায়ীকে নদীর দিক্‌ দেখাইতেছে। হঠাৎ বোধ হইল, তাহার নিজের স্বরে তাহাকে কে যেন বলিতেছে, 'চল আর কেন মরিবে চল।' সুরাপায়ী উন্মত্তের ন্যায় বেগে নদীতীরাভিমুখে ছুটিল। বোধ হইল, তাহার মধ্যম পুত্র যেন তাহার অগ্রে অগ্রে নদী তীর দেখাইতে দেখাইতে ছুটিয়াছে। সেই ভীষণ অট্ট হাস্য ও শৃঙ্খলের শব্দ তাহারি কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে।

সুরাপায়ী গঙ্গাতীরে আসিয়া ঘাটের সোপানাবলিতে নিঃশব্দে অবতরণ করিল। তখন জোয়ার আসিয়াছে, কূলে কূলে নদী বাহিয়া চলিয়াছে। জলের ধারে সোপানোপরি সুরাপায়ী উপবিষ্ট হইল। সেই সময়ে প্রহরীর পদ শব্দ শ্রুত হইল। হতভাগ্য যথায় উপবিষ্ট আছে, প্রহরী সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে। বড় ভয় হইল, প্রহরী পাছে তাহাকে দেখিতে পায়। দেখিতে পাইয়া তাহার প্রাণত্যাগের চেষ্টা বিফল করে। তাহার একমাত্র নিষ্কৃতির পথ বন্ধ করে। সুরাপায়ী নিঃশব্দে রুদ্ধশ্বাসে তথায় বসিয়া রহিল। প্রহরী অগ্রসর হইয়া ক্রমে সেই স্থান অতিক্রম করিয়া চলিল, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পদশব্দ ক্রমে দূরগত হইলে সুরাপায়ী, জলে অবতরণ করিল। অবতরণ করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। আকাশ তখনও ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, কিন্তু বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে, বায়ুর বেগ মন্দীভূত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক্‌ বড়ই নিস্তব্ধ। কেবল স্রোতের অস্ফুট কুল কুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল। সুরাপায়ী একবার আকাশের দিকে চাহিল। আকাশ বড়ই অন্ধকার, সুরপায়ীর বোধ হইল, যেন এমন অস্বাভাবিক অন্ধকার বুঝি আর কখন দেখে নাই। নদীর দিকে চাহিল। নদীর বক্ষেও সেই অন্ধকার প্রতিফলিত। বোধ হইল, সেই অন্ধকার মধ্যে অসংখ্য ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া অঙ্গুলী সঙ্কেত দ্বারা তাহাকে আহ্বান করিতেছে। জলমধ্য হইতে সেইরূপ মূর্ত্তি সকল মস্তক উত্তোলন করিয়া জলন্ত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া যেন তাহার বিলম্বকে উপহাস

করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে যেন কাহারা বিষম কোলাহল করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন। আবার সেই অট্টহাসি, সেই শৃঙ্খলের শব্দ, সেই ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি সকলের মধ্যে তাহার মধ্যম পুত্র দাঁড়াইল। সুরাপায়ী পাঁচ সাত পদ পশ্চাৎ সরিয়া আসিয়া বেগে লম্ফ দিয়া গভীর জলমধ্যে গিয়া নিমগ্ন হইল।

অল্প ক্ষণ পরেই সুরাপায়ী ভাসিয়া উঠিল। সেই অল্পক্ষণ মধ্যেই সুরাপায়ীর মানুসিক প্রবৃত্তির সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে? প্রাণ,—প্রাণ চাই, দুঃখ হউক, কষ্ট হউক, রোগ হউক, যন্ত্রণা হউক, প্রাণ চাই, কেন মরিতে আসিলাম? কেন জলে ঝাঁপ দিলাম? আর কি তীরে উঠিতে পারিব না? এই যে, এই যে, বুঝি পাদ তীর স্পর্শ করিতেছে, আর একটু, আবার সেই অট্ট হাসি, সেই শৃঙ্খলের শব্দ, সম্মুখে তাহার মধ্যম পুত্রের মূর্ত্তি। সুরাপায়ীর হস্তপদ শিথিল হইয়া গেল। সুরাপায়ী ডুবিল, ডুবিয়া স্রোতভরে বহু দূর ভাসিয়া গেল।

সুরাপায়ী আবার ভাসিল। একবার মাত্র আলোক-মালা-সজ্জিত মহানগরী দেখিতে পাইল, এক বার মাত্র আকাশে কাল মেঘের ছুটাছুটি দেখিতে পাইল। পর ক্ষণেই তাহার নয়নের সম্মুখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল ছুটিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে নদী-বক্ষ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত যেন অগ্নিশিখা সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অগ্নিশিখা সকল দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। কর্ণে শত বজ্রনাদ ধ্বনিত হইতে লাগিল। সুরাপায়ী ভাসিতে ভাসিতে চলিল; একবার ভাবিল, চির-স্নেহময়ী কন্যা কোথায়? জীবিতা থাকিলে অবশ্যই আমার নিকট আসিত। অমনই সুরাপায়ী বিস্মিত নয়নে দর্শন করিল, ভাগিরথীর বিশাল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এক স্নিগ্ধোজ্জ্বল শ্বেতমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছে। উজ্জ্বল কিরণে চিনিল, সে তাহারই কন্যা। মধুর গম্ভীর কণ্ঠে রমণী মূর্ত্তি বলিল, "পিতঃ এই পবিত্র স্রোতেই তোমার স্নেহের কন্যা তোমার জন্য সেই রাত্রেই দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এই স্বর্গীয় জননী ত্রিদিব ধাম হইতে বলিতেছেন: "সময় শেষ হইয়াছে, তুমি দেহ বিসর্জ্জন কর।" আলোক রশ্মি নির্ব্বাপিত হইল। সেই ঘন তমসাবৃত নৈশ আকাশের নিবিড় নিস্তব্ধতা প্রতিধ্বনিত করিয়া কে যেন বলিল—"সংসারে সুরাপায়ীর পরিণাম এই"।

হতভাগ্য একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ডুবিল। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাসের পর, তাহার প্রাণ অনন্তের সহিত মিশিয়া গেল। শ্রীকেদারনাথ মণ্ডল।

নিবেদন।

তত্ত্বাবধারক মহাশয়! আপনি অনুশীলনে কোন কোন কার্য্য নূতন করিতেছেন দেখিয়া, একটী প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করিয়া, আপনার নিকটে আমার এই বিনীত সুসঙ্গত 'নিবেদন' প্রেরণ করিতেছি। 'যদি আপনি মধ্যে মধ্যে অনুশীলনে সাহিত্যাদি-সংক্রান্ত চিঠিপত্র মুদ্রিত করিতে থাকেন, তাহাতে বঙ্গভাষানুরাগীদের অনেক উপকার দর্শে। ইতি।

শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যাদি-সংক্রান্ত চিঠিপত্র।

এইরূপ অনুরোধ-পত্র আমরা প্রায় প্রাপ্ত হই। অনেকে মুখে এ সম্বন্ধে অনেক বার আমাদিগকে বলিয়াছেন। অসম্বদ্ধ পত্রাবলী-প্রকাশে সাধারণের কিছু উপকার হইবে কি না, এ বিষয়েও অনেকে অনেক আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন। আমরা জানি. ইহাতে কতকটা উপকার দর্শিতে পারে। ভবিষ্যতে মহাজনগণের জীবনী-সঙ্কলয়িতৃগণের এতদ্দ্বারা কতক সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু পাছে লোকে ইহা উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া মনে করেন. এই ধারণায় আমরা এত দিন "সাহিত্য-সংক্রান্ত-চিঠিপত্র" প্রকাশিত করি নাই। এরূপ অনেক পুরাতন পত্র আছে। যদি সাধারণের নিকট ইহা প্রীতিকর জ্ঞান হয়, তাহা হইলে আমরা ক্রমান্বয়ে এই রূপ ভাবে অনেক পত্র প্রকাশিত করিব। তাহাতে ভবিষ্য ইতিহাসের বিস্তর প্রয়োজনীয় বিষয় লিপিবদ্ধ হওয়ায় স্থায়ী রহিয়া যাইবে। নিম্নে তিন খানি পত্র প্রকাশিত হইল ;—

আমাদের বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়কে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

"জগদীশ।

"প্রিয়তম

"আপনার প্রণয়-রসাভিষিক্ত মনোরম পত্র প্রাপ্ত হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম। আপনি যে তপোবনটি মনোমত করিতেছেন, তথায় প্রবেশ করিয়া সংবাদ লিখিবেন। গত সাম্বৎসরিক সমাজের দ্বিতীয় বক্তৃতা মহর্ষি শৌনক-প্রণীত। তিনি তাহাতে আপনার স্নিগ্ধ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন; আর তন্মধ্যে যে অংশ, কোন মিত্রের রচিত বলিয়াছেন, তাহা জরৎকারুর লিখিত।

"আপনি আমার পুস্তক প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যে অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং চেষ্টা করিতেছেন, ইহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম এবং মনে মনে আপনাকে সাধুবাদ করিলাম। ফলতঃ কূম্ব সাহেবের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ, যে ভাষায় লিখিত হউক না কেন, যে যে দেশে তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপিত হইবে, সেই সেই দেশেরই বিশিষ্টরূপে উপকার দর্শিবে, তাহার সন্দেহ নাই। পদার্থবিদ্যা সমাপ্ত হইলে আপনাদের অভিপ্রায়ানুসারে এক খানি যন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ লিখিবার মানস থাকিল। কিন্তু ভাই! একে নূতন ভাষায় নূতন শব্দ সঙ্কলন করিয়া লিখিতে হয়, বিদ্যা-সাধ্য যত, তাহা আপনার অবিদিত নাই। আবার এ দেশের যে প্রকার স্বভাব এবং আমাদের যেরূপ বলবীর্য্যহীন প্রকৃতি, তাহাতে ঐ সকল বিষয়ে কোন মতেই সাহস করা যায় না। সময়ে সময়ে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, মনোমত কোন কার্য্য হইয়া উঠিল না। আপনার সংশোধিত বক্তৃতা সকল পাঠ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র রহিলাম। আমরা সকলে ভাল আছি। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বৈকুণ্ঠ বাবু ও গুম্ফরাজ আপনাকে নমস্কার জানাইলেন। ইতি। ৫ই বৈশাখ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।"

"মহর্ষি শৌনক" শব্দে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। "জরৎকারু" স্বয়ং অক্ষয়কুমার বাবু। "জরৎকারু" শীর্ণকায় ছিলেন; দত্তজও শীর্ণ-জীর্ণ ছিলেন, এই জন্য এই নাম গৃহীত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ বাবুকে উদ্দেশ করিয়া "মহর্ষি" বিশেষণ এই প্রথম প্রদত্ত হয়।

অক্ষয়কুমারের লেখনী হইতে দেবেন্দ্রনাথ বাবুকে "মহর্ষি" বলিয়া এই প্রথম ও শেষ নির্দ্দেশ। উহার বহু পরে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, দেবেন্দ্রনাথ বাবুকে "মহর্ষি" উপনামে সম্বোধন করিতেন। গুরুই, শিষ্যকে উপাধি দিয়া থাকেন, কিন্তু এস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।

—তত্বাবধায়ক।

বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়, বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন-কালে লিখিয়াছিলেন ;—

"My dear Rajnarayan Babu

"I have much pleasure in sending you this day twenty-five copies of Vidyasagar's second pamphlet on the marriage of Hindu widows. I send these pamphlets by Dak Bahagy in two packets, in one of which you will find also a printed copy of our petition to the Legislative council on the subject of widow marriage, the draft of a supplementary petition on the same subject and a sheet of flank foolscap paper. Kindly send as many signatures as can be procured on this flank sheet of paper, shewing to the parties of course the draft petition. We are procuring here signatures in the similar manner from different quarters. Kindly try to send the paper soon. Vidyasagar being a little unwell, could not do himself the pleasure of writing to you on the subject.

"Hoping that this will find you in good health and that you will excuse the trouble.

I remain

Yours sincerely

PRASANNAKUMAR SARVADHIKERI.

Babu Rajnarayan Basu

Midnapur."

বাবু রাজনারায়ণ বসুজ মহাশয়ের এই পত্রের উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্—

"কয়েক দিবস হইল, মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি; কিন্তু নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা-প্রযুক্ত এত দিন উত্তর লিখিতে পারি নাই; ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

"আপনার কন্যার বিবাহ-বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়াছি, কিন্তু আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোন ক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্র বাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি আপনি দেবেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ, ব্রাহ্মপ্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্ব্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

"উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য। কারণ, যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনকার হিতাহিত বা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

"এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয়ের স্বয়ং কর্ত্তব্য নিরূপণ করিলেই আমার মতে সর্ব্বাংশে ভাল হয়।

"আমি কায়িক ভাল আছি। ইতি ৩রা ৬ আশ্বিন।

ভবদীয়

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।"

অক্ষয়কুমার বাবুর পত্রে ও এই পত্রে সালের উল্লেখ নাই। না থাকিলেও, আমরা জানিয়াছি, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে শেষোক্ত পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল।

তত্ত্বাবধারক।

রঙ্গভূমি-সংক্রান্ত প্রশ্ন।

পাঠকগণের মধ্যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে বিশেষ বাধিত হইব। নাট্যশালা-সংসৃষ্ট কোন কোন ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া ও পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর না পাওয়ায়, অগত্যা প্রকাশ্য পত্রিকাতে সেগুলি মুদ্রিত করিতে হইল।

১। বাবু মধুসূদন সান্ন্যালের বাটীস্থ ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্ব্বশুদ্ধ কয়টী অভিনয় হয়?

২। কালক্রমানুসারে অভিনীত পুস্তকগুলির সংখ্যা কত?

৩। কোন্ তারিখে ঐ রঙ্গশালা বন্ধ হয়?

৪। "ন্যাশনাল থিয়েটার" নাম কাহার প্রদত্ত?

৫। কে ঐ নাট্যভূমির মেনেজার অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন?

৬। ওখানে প্রথম হইতে স্বদেশীয় ঐকতান বাদন, কি বিদেশীয় ঐকতান বাদন প্রবর্ত্তিত হয়? যদি প্রথমে বিদেশীয় বাদ্য প্রচলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কখন্ স্বদেশীয় বাদ্যের সূত্রপাত?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বালিকার আমন্ত্রণ।

(১)

মাগিয়ে করুণা-কণা,
জগতের প্রতি-দ্বারে,
ফিরিছে পথিকবর,
হৃদয়ের গুরু-ভারে॥
সজল করুণ আঁখি,
মলিন মু'খানি দেখে'
দু'খের কাহিনী তব,
শুধায় নি কেহ ডেকে'।
ললাটের অশ্রু-কণা
যতনে অঞ্চল দিয়ে,
আদরে কেহ তাহায়।
দেয় নি গো মুছাইয়ে।
ল'য়ে হৃদি-ভরা দুঃখ
তপত দীরঘ শ্বাসে
নৈরাশ্য-কাতর প্রাণে,
ফিরেছ আপন বাসে॥

(২)

কিন্তু,—
আকাশে বিভোর হয়ে'
ইন্দু, বিন্দু বিন্দু ক'রে,
ঢালিছে সুধার ধারা,
ব্যথিত জগত' পরে।

তটিনী-তরঙ্গ-তোয়
তটে প্রস্ফুটিত ফুল,
জুটেছে প্রাণের আকুল।
পিপাসিত অলিকুল॥
প্রকৃতি প্রমোদ-ছাঁদে,
ছেয়েছে মোদের ধরা,
তুমি কেন আমরণ,
কাঁদিবে এমন ধারা ?
ছি ছি গো পথিকবর !
থেক না গো আর পথে,
সুখের সংসার-বাসে,
এস গো আমারি সাথে।

(৩)

সামান্যা বালিকা আমি,
কি মোর শকতি বল ;
স্নেহের বচন ছুটো,
ছু' ফোঁটা আঁখির জল॥
তোমার কাহিনী শুনে'
কাঁদিব তোমারি তরে,
তোমার প্রাণের ব্যথা,
ঘুচাব যতন করে'॥
সুখ-শান্তি দিয়ে তোমা,
বিনিময়ে ছুঃখ ল'ব,
সুখে দুঃখে চির-দিন,
তোমারি নিকটে রব।
দলিত মরমে তব,
দুখের রেখাটি হায় !

যতনে আপন হাতে,
মুছাইয়ে দিব তায়।
ক্ষুদ্র এ হিয়ার মাঝে,
যেটুকু প্রণয় আছে,
হিয়ার দুয়ার খুলে'
দিব তা' তোমারি কাছে।
বালিকার সাধ যাহা,
করিব তা প্রাণপণে,
সংসারে পাও নি যা' তা,
পেতে পার মোর স্থানে।
তাই বলি, থেক না গো পথে পড়ে;
কেঁদ না গো অনুক্ষণ।
এস গো আমারি সাথে;
"বালিকার আমন্ত্রণ।"

শ্রীপ্রাণগোপাল দত্ত।

(রাজকীয় বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে "রজনী"।

প্রথমাভিনয় রজনী—১৩০১ সাল, ২০শে মাঘ,
১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ—২রা ফেব্রুয়ারি।)

যখন প্রথমে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে রজনীর অভিনয় হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম, "রজনী" উপন্যাস, নাটকাকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য যত গুলি উপন্যাস আছে, "রজনী" তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণে লিখিত। বঙ্কিম বাবু বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন—"প্রথম লর্ড লিটন্ প্রণীত লাষ্ট ডেজ্ অব্ পম্পী (Last days of Pompeii) নামক উৎকৃষ্ট

উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটী "কানাফুলওয়ালী" আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা, এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।

"উপাখ্যানের অংশবিশেষ, নায়ক বা নায়িকাবিশেষ দ্বারা ব্যক্ত করা, প্রচলিত রচনা প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত (Woman in white) নামক গ্রন্থ-প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এ প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।"

(যে "রজনীর" চরিত্র-চিত্রণে বঙ্গভাষায় গৌরব-রবি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র একদিন এত কৈফিয়ৎ দিয়া তবে পুস্তক আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই "রজনী" নাটকাকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করায় কিছু বিশেষ সাহসিকতা, বিশেষ আত্ম-নির্ভরতা ও বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।)

(বঙ্গ-রঙ্গ ভূমির বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায় "রজনীকে" নাটকাকারে পরিণত করিয়াছেন এবং উক্ত রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুযোগ্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তদভিনয়ের শিক্ষাদাতা (১)। ইহাঁরা উভয়েই আমাদিগের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

'রজনী' নাটকাকারে পরিণত করিতে গিয়া বিহারীবাবু যদি অন্যান্য দুই চারিটী নূতন চরিত্রের অবতারণা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পুস্তকের সৌন্দর্য্য-হানি হইত। তিনি যে বঙ্কিমবাবুর সম্পূর্ণ চরিত্রগুলি বজায় রাখিয়া ও তাঁহারই লেখনী-নিঃসৃত ভাব অবলম্বনে, তাঁহাকেই কথোপকথনে সজ্জিত করিয়া, কেবল সেই পুস্তকের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 'রজনী' নাটকের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সার্থক-মনোরথ হইয়াছেন।)

---

(১) শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র বাবুকে কোন অংশ অভিনয় করিতে দিলে আরও ভাল হইত।—তত্ত্বাবধারক।

বঙ্কিম বাবু আমাদিগকে 'লাষ্ট ডেজ অব পম্পী' নামক পুস্তকের 'নিদিয়া' নামক একটী কানা ফুলওয়ালীর চরিত্র-স্মরণে 'রজনী' রচিত হইয়াছে বলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্তু শুনিয়াছি, ফরাসীভাষায় লিখিত একখানি পুস্তকেও নাকি, এরূপ একটী চরিত্র আছে এবং অধিকাংশ স্থলে 'রজনীর' সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, 'নিদিয়া' চরিত্র ব্যতীত বঙ্কিম বাবু সেই ফরাসী গ্রন্থেরও সাহায্য লইয়া, "রজনী" সৃজন করিয়াছেন। যাহা হউক, সে সকল কথা আমাদিগের আলোচ্য নহে বলিয়া কেবল উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

"রজনী" নাটকাকারে পরিণত করা অতি কঠিন। বঙ্কিম বাবু যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি হয়; কিন্তু তাঁহার "রজনী" অভিনীত হওয়া কত দূর দুরূহ, পাঠককে পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। এক এক জন বিস্তৃত ভাবে আপনার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেই সকলের সমষ্টি একত্র না করিয়া, সেইরূপ প্রত্যেকের জীবনকাহিনী পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া বঙ্কিম বাবু "রজনী" সৃজন করিয়াছেন। পাঠকগণ সমস্ত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া, রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র, লবঙ্গ-লতা প্রভৃতি প্রত্যেক চরিত্রের সহিত প্রত্যেকের কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করিলেন। কিন্তু এই পুস্তকের নাটককার হইতে যিনি সাহসী হইয়াছেন, তাঁহাকে তাহা সম্পূর্ণ অন্য আকৃতিতে সৃজন করিতে হইয়াছে। ভাবাত্মক জীবন-কাহিনীকে নাটকচ্ছন্দে কথোপকথনে অভিনয়োপযোগী করিতে হইয়াছে।

"রজনী" বঙ্কিম বাবুর ছায়াময়ী কল্পনা। মনে মনে অনেক প্রকার সুন্দর ছবি কল্পনা করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে কি না, সেরূপ হওয়া সম্ভব কিনা, তাহাই বিবেচ্য। রজনীর চরিত্র অপূর্ব্ব চিত্র হইলেও সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নহে। ঘরে ঘরে কাণাফুলওয়ালী যদিও আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু সেই নজীরের জোরে "জন্মান্ধের প্রাণে প্রণয় সঞ্চার হইতে পারে না" এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও উচিত নয়। এই সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রমাণ করাই বোধ হয়, বঙ্কিম বাবুর মূল উদ্দেশ্য। আর এই গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াই নাটককার লিখিয়াছেন—

"চখে চখে ভালবাসা পদ্মপাতা-জল।
ক্ষণে চায় ক্ষণে ধায় নিরাশ কেবল॥
মনে মনে ভালবাসা প্রেম বলি'গণি।
প্রেমের প্রতিমা অন্ধ দুঃখিনী রজনী॥

রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের নাম ভবিষ্যতে ইতিহাসের সাহায্য করিবে জানিয়া তাহা এই স্থলে প্রদান করিলাম।

(পুরুষগণ। রামসদয়—শ্রীকুঞ্জবিহারী বসু। শচীন্দ্রনাথ—শ্রীমহেন্দ্রলাল বসু। বিষ্ণুরাম—শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ। অমরনাথ—শ্রীহরিদাস দাস (হরি-বৈষ্ণব)। গোবিন্দকান্ত—শ্রীমথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজচন্দ্র—শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হীরালাল—শ্রীশশীন্দ্রনাথ দাস দে। ভবানন্দ—শ্রীযোগীন্দ্র-নাথ ঘটক। গদা—শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়। মেন্দাশিউলী—শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ।

স্ত্রীগণ। রজনী—শ্রীসুকুমারী দত্ত। ভুবনেশ্বরী—শ্রীরাণী দাসী। লবঙ্গ-লতা—শ্রীনিস্তারিণী। মোক্ষদা—শ্রীহরিদাসী। চাঁপা—শ্রীগোলাপ দাসী। থাকী—শ্রীজ্ঞানদা দাসী।)

অভিনয় সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর পুস্তক সমালোচনা করিতে চেষ্টা না করিয়া, অভিনয় সম্বন্ধেই দুই চারিটা কথা বলিব। (রজনীর প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, রামসদয় ও বিষ্ণুরামের কথোপকথন। ইহাতে নান্দীর কার্য্য করিয়াছে *।

দ্বিতীয় দৃশ্যে—বৈদ্যনাথ পাহাড়ের নিকটস্থ পথ। এই দৃশ্যে ভবানন্দ ও অমরনাথ কথোপকথনে নিযুক্ত। পুস্তকে অমরনাথ আপনার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু রঙ্গমঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া যদি অমর-নাথের মুখে অত বড় স্বগত উক্তিতে তাঁহার জীবনকাহিনী শ্রবণ করিতে হইত, তবে কোন দর্শকই তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাই, নাটকে এইখানে ভবানন্দ ব্রহ্মচারী সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব। এই সিদ্ধ পুরুষের কথা যে "রজনী" উপন্যাসে একেবারেই নাই, তাহা নহে। নাটককার কিন্ত

* আমি বঙ্কিম বাবুর ১৮৮৭ সালের তৃতীয় সংস্করণ "রজনী" দেখিয়া এই সমালোচনা লিখিতেছি। —শ্রীশ।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এই সিদ্ধ পুরুষের ব্যাপার আরও বাড়াইয়াছেন। এরূপ করাতে, উপন্যাসের কোন অঙ্গহানি হয় নাই; বরং অমরনাথের জীবনকাহিনী-বর্ণনার একজন শ্রোতা, হতাশ জীবনে উৎসাহদাতা, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য একজন গুরু ও দর্শকগণের চিত্তে তুপ্তিদানের জন্য এই ব্রহ্মচারীকে অমরনাথের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত করাতে নাটককার অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। অমরনাথের কথা তথাপি দীর্ঘ হইয়াছে। ভবানন্দ ব্রহ্মচারীর মুখ হইতে আরও দুই চারিটী প্রশ্ন, দুই একটী ধর্ম্মতত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, দুই চারিটী উপদেশ-সূচক কথা বাহির হইলে আরও ভাল হইত।

তৃতীয় দৃশ্যে, আমরা রজনীকে প্রথম দেখিতে পাইলাম। দেখিয়াই মনে বড় আনন্দ হইল। বঙ্কিমবাবুর ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অভিনয়ে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে যাহার অভিনয়ের প্রশংসা শুনিতে পাই, তাহাকেই অন্ধ ফুলওয়ালী রজনীর সাজে সজ্জিত দেখিয়া কেননা প্রীতি জন্মিবে? সেইখান হইতেই আশা হইল, যদি অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীর প্রশংসার সহিত অভিনয় করিতে নাও পারেন, তাহা হইলেও অন্ততঃ "রজনীর" রজনী দেখিয়াও তৃপ্ত হইব। অভিনেত্রীর বয়সের দোষে কাণাফুল-ওয়ালীকে কিছু বড় দেখাইতেছিল, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে রজনীর মুখে কথা বাহির হইল, অমনই দর্শকগণ যেন তাহা ভুলিয়া গেলেন। অন্ধ রজনী, মালা গাঁথিতেছে, ফুল গুছাইতেছে, সূচিকায় সূতা পরাইতেছে, এবং দর্শকগণকে উদ্দেশ করিয়া কথা কহিতেছে। দৃশ্যটী বড়ই প্রাণে লাগিল। বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন "রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমর-কৃষ্ণ তারা-বিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষুঃ—কিন্তু কটাক্ষ নাই।" অভিনেত্রী, চক্ষের ভাব ঠিক এই বর্ণনার অনুরূপ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপভাবে চক্ষু ঠিক্ রাখা কত দিনের অভ্যাস, বলিতে পারি না; কিন্তু অভ্যাসের বড় বাহাদুরী আছে। আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার স্বাভাবিক চক্ষুর উপর, কাচ, প্রস্তর বা অন্য কোন পদার্থের কৃত্রিম চক্ষু বসান রহিয়াছে। কিন্তু যখন দেখিলাম, তাহা নয়, তখন মনে মনে এই আশ্চর্য্য অভ্যাসের জন্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। অমরনাথের দীর্ঘ বক্তৃতার দায়

এড়াইবার জন্য নাটককার ভবানন্দের অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু রজনীর কথোপকথন শুনিবার জন্য কাহাকেও রাখেন নাই।

মৃণালিনীর গিরিজায়া, দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা, আনন্দমঠের শান্তি, বিষবৃক্ষের সূর্য্যমুখী, সেই সুকুমারীর সুকণ্ঠ হইতে সংগীত ধ্বনি যেন সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। রজনী গাইল :—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কেমনে পরের সনে পরিমিত মোর হয়।
সকলেরই সুখ দুঃখ কভু তো সমান নয়॥
শরদে পরশে সাগে, সুখী আমি মনে মনে,
সুখী হয় হেরি আনে, গগনেতে চন্দ্রোদয়॥
আঁধার মম জীবন, না জানি আলো কেমন,
মুদিত পোড়া নয়ন, অপরের দৃষ্টিময়॥

(এইখান হইতেই অভিনয় জমিতে আরম্ভ হইল। রজনী আবার গাইল :—

রামকেলী—কাশ্মীরি খেমটা।

মৃদুল মৃদুল বহি' প্রভাত-মলয়ানিল।)
বিলায়ে ফুলসৌরভ বিভোর মন করিল।
গুন্ গুন্ রবে অলি, ভ্রমিতেছে বুলি' বুলি'
চুমি' চুমি' ফুল-কলি, চুমি' রসেতে মাতিল॥
মলয়েরই সুপরশে, ফুলের মোহিনী * বাসে,
মধুপ মধুর ভাষে, মনোজে, মন গলিল॥

কেবল দর্শকগণকে উপলক্ষ করিয়া রজনী আপনার জীবন-কাহিনীর প্রথম পরিচ্ছেদ বর্ণন সমাপ্ত করিল। এই কারণেই শেষে দর্শকগণকে সন্তুষ্ট করিয়া যাইবার জন্যই রজনী বলিল—"তোমাদের কাছে অনেক বকিলাম—এখন শেষে তবে আর একটী গান শুনাইয়া যাই"। রজনী গান ধরিল :—

টোরি—মধ্যমান।

"যৌবন-নিকুঞ্জে মোর মুঞ্জরিত নানা ফুল।
কেন না মধুপ তাহে, গুঞ্জরে হ'য়ে আকুল॥

* "মোহিনী বাস" ভুল। —তত্ত্বাবধারক।

অযতনে অপালনে, কোমল কুসুম রয় কেমনে,
হতাশ প্রবল পবনে হ'ল বুঝি নির্মূল॥

(রজনী গান গাহিয়া দর্শকগণকে উপলক্ষ করিয়া প্রিয়-জীবনের সুখ-দুঃখের গোটা-কতক কথায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরিমিত কাল দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল (২)) কিন্তু বিশ্বনিন্দুক এক পাশে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিলেন, তিনি অনেক মাথা চুলকাইয়া, দুই চারিটা ঢোঁক গিলিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। তাঁহার চক্ষে একটু দোষ—একটু খুঁত—যেন রহিয়া গেল। প্রথমতঃ রজনীকে দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রজনীকে মনে পড়িল না, যেন কিছু বয়স্থা বলিয়া বোধ হইল, তাই যেন অস্বাভাবিক লাগিল। দ্বিতীয়তঃ, রজনী যে কাপড় খানি পরিয়া আসিয়াছিল, তাহা সৌখীন, মিহি, দামী দোপেড়ে (লাল এবং কাল) কাপড়। দরিদ্র রাজচন্দ্র দাসের পালিত কন্যা, অন্ধ ফুলওয়ালীর, এরূপ বসন পরিধান করিয়া যৎসামান্য অস্বাভাবিকতার পরিচয় না দিলেই চলিত।

(চতুর্থ দৃশ্যে, রামসদয় ও লবঙ্গলতা শয়নকক্ষে হাজির) রামসদয় ডাকিলেন—"কই গো! আমার "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে" (৩) কোথায় গো!"

"আজ্ঞে ঠাকুরদাদা মহাশয় দাসী হাজির" বলিয়া আর এক ধার হইতে সেই সদা-প্রফুল্লময়ী মূর্ত্তি লবঙ্গলতা দেখা দিলেন। "লবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর, রামসদয় বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশীতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল

---

(২) এই অভিনয়ে যে স্থানে দীর্ঘ দীর্ঘ আত্মগত রহিয়াছে, তত্তাবৎই কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর—সুতরাং তৎসমুদয় শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হইয়াছে। স্বগত বিষয় বন্ধ হওয়া দূষণীয়। উহা দীর্ঘ হওয়াও নিন্দনীয়—সুতরাং উভয়ই বর্জ্জনীয়; যথাসম্ভব সুসঙ্গত স্বগতই আদরণীয়।

—তত্ত্বাবধারক।

(৩) উক্ত স্থলটুকু জয়দেবের গীতগোবিন্দের উদ্ধৃতাংশ, পাঠক জানিয়া রাখুন।

—তত্ত্বাবধারক।

এবং আরোগ্যে স্বরূপা। তিনি অশেষ গুণে গুণবতী; গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা। লবঙ্গলতা, পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসিতেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন—সে সজ্জায় রস,—কাহাকে বলি! আপন হস্তে শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিল পেড়ে, ফিতে পেড়ে, কুল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রগণকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রিতাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চস্মাগুলি, লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া,যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত (৪); রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয় গাছা মল বাহির করিয়া, পরিয়া ঘরময় ঝম্ ঝম্ করিয়া, রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।"

রজনী উপন্যাসের বর্ণনার সহিত নাটককার অবিকল মিলাইয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কথোপকথন উত্তমরূপে লিখিয়াছেন (৫); কেবল "সোণার চস্মা চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা" আর "ছয়গাছা মল পায়ে দিয়া ঘরময় ঝম্ ঝম্ করিয়া বেড়াইয়া রামসদয়ের নিদ্রাভঙ্গ করা" এই অংশ দুইটী বাদ দিয়াছেন। বাদ না দিলে চলিত না কি (৬)? রামসদয়ের মুখভঙ্গী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিচালন ও লবঙ্গলতার সহিত কথোপকথন অত্যন্ত স্বাভাবিক, অতীব প্রশংসনীয় (৭)।

(৪) একস্থানে লবঙ্গলতা সম্মাননীয়, অন্যত্র অশ্রদ্ধেয়; ইহা বঙ্কিমচন্দ্র বাবুর ভাষার ত্রুটি। —তত্ত্বাবধায়ক।

(৫) বিহারিলাল বাবুর ইদানীন্তন লিপিচাতুর্য্য, তাঁহার নিজের পূর্ব্বকালীয় রচনা অপেক্ষা পক্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। —তত্ত্বাবধায়ক।

(৬) বিষয়টী অকিঞ্চিৎকর। বাদ পড়ায় কোন মারাত্মক দোষ ঘটে নাই। মনে করিলে নাটককর্ত্তা উহার প্রসঙ্গ রাখিতে অনায়াসেই পারিতেন। —তত্ত্বাবধায়ক।

(৭) রামসদয়বেশী গোঁফ কামাইয়া বড় ভাল কাজ করিয়াছেন। অন্যত্র হইলে রামসদয়কে গুম্ফশোভিত দেখিতে পাইতাম। —তত্ত্বাবধায়ক।

নবজলতার অভিনয়ও অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। নবজলতা, স্থানে স্থানে, রজনী অপেক্ষা সুন্দর অভিনয় করিয়াছেন (৮)

(ভৈরবীমিশ্র—কাওয়ালী।

কোন্ আবাগী বলে তোমায় বুড়ো।)
তুমি আমার রসের সাগর সুখ গিরির চূড়ো।
তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, হৃদাকাশের পূর্ণ ইন্দু,
হেরি, তোমাতেই অমিয় বিন্দু রসাসিন্ধুর গুঁড়ো।
তুমি আমার মনের মুকুর, তুমি আমার দাদাঠাকুর,
(করি) তোমার কাছে ফুকুর ফাকুর, তুমি আমার খুড়ো।

শেষের পঙক্তিটী আমাদের ভাল লাগিল না। "ফুকুর ফাকুর" ও "খুড়ো" কথাটী বদ্‌লান উচিত। (লবঙ্গলতা, এই দুঃখে আর একটা গান গায়,—

ভৈরবী—কাওয়ালী।

আমি কেমন করে' তোমায় ছেড়ে'
রব ঘরে দাদামশাই (৯)।)
চখের আড়াল, হ'লে তুমি,
কাঁদা হ'য়ে ঘুরে' বেড়াই।
তুমি সোহাগের আতর,
তুমি আমার পরেশ পাথর,
তোমার তরে সোণার গতর
নইলে পোড়ার মুখে ছাই।

স্বামি-সোহাগের অতৃপ্ত সাধ ও স্বামি-ভক্তির উত্তম নিদর্শন লবঙ্গলতার মুখে, এই এক সংগীতে প্রকাশ। সঙ্গীত রচনা সম্বন্ধে এই স্থলে দুই একটা কথা বলিব।

---

(৮) আমরা ইহার অনুমোদন করি না। লবঙ্গ, অভিনয়ে রজনীর প্রায় তুল্য-মূল্য।
—তত্ত্বাবধায়ক।

(৯) বঙ্কিমচন্দ্র বাবু বলিয়াছেন বলিয়াই স্বামীকে "দাদামশাই" বলা কি উচিত? ইহার পূর্ব্ব গানে স্বামীকে "আমার খুড়ো" বলা হইয়াছে। 'হরির খুড়ো' বলা হউক না?
—তত্ত্বাবধায়ক।

(বিহারী বাবুর সরল ভাষায় গান রচনায় কবিত্ব প্রকাশ হইয়াছে। দুই চারিটী শব্দ ব্যতীত সকল গুলিই প্রায় মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। সুর সংযোজনার ও বেশ বাহাদুরি আছে।

পঞ্চম দৃশ্য।—কাণাফুলওয়ালী রজনী, লবঙ্গলতাকে ফুল যোগাইতে আসিয়াছে।)এই স্থান হইতেই "রজনী" নাটকে রজনী-চরিত্রের প্রথম বিকাশ। চখে না দেখিলে অনুরাগ হয় কি না, তাহাই প্রমাণের এই প্রথম সূত্রপাত। এই স্থলে যে বীজ অঙ্কুরিত হইল, পরে তাহাই ফলে ফুলে পরিশোভিত ও প্রেমবৃক্ষ পরিণত হইয়াছিল।

ছোট বাবু রজনীর চক্ষু পরীক্ষা করিবার জন্য দেখিতে চাহিলে রজনী লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিল। শচীন্দ্রনাথ তাহার চিবুক ধারণ করিয়া, মুখ তুলিয়া, চক্ষু দেখিলেন। সেই চিবুকস্পর্শে রজনী মরিল। "সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুথী, জাতি, মল্লিকা সেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি—সব ফুলের ঘ্রাণ পাইল। তাহার বোধ হইল, তাহার আশে পাশে ফুল, মাথায় ফুল, পায়ে ফুল, পরণে ফুল, বুকের ভিতর ফুলের রাশি।"

রজনী জন্মান্ধ। হৃদয়ে অনুরাগ-বহ্নি উদ্দীপিত হইলে সে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল—"বহু মূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? যাহার কর-স্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্ত জন্য এই সুখময় স্পর্শ কি দেখিতে পাই না? দেখা যা! আমি একবার মনের সাধে, রূপ দেখে' নারী জন্ম সার্থক করি।" রজনীর ভাগ্যে তাহা নাই, তাহার অদৃষ্ট বিধাতা তাহা লেখেন নাই। সে শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ ভিন্ন অন্য কিছু জানিবার ও পাইবার অধিকারিণী নহে। কিন্তু তাই বলিয়া, কি রজনী ভালবাসিতেও পারে না? তাহার কি সে অধিকারও নাই? শুষ্ক ভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে যদি তাহা উৎপাদিনী হয়, শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে যদি তাহা জ্বলে, রূপে হ'ক, শব্দে হ'ক স্পর্শে হ'ক, শ্রবণে হ'ক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শে, প্রণয়-বীজ কেননা অঙ্কুরিত হইবে? অন্ধকারে ফুল ফোটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জন-শূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, সাগর-গর্ভে রত্ন

জন্মে, তবে অন্ধের হৃদয়ে প্রেম জন্মিবে না কেন? নয়ন নিরুদ্ধ বলিয়া, হৃদয় প্রস্ফুটিত হইবে না কেন? রজনী ভাবিল. যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু ফোটে, তাহা হইলেও সে একবার এই শব্দ-স্পর্শ-ময় বিশ্বসংসার কি, তাহা দেখিয়া লয়। সে নিজে কি? শচীন্দ্র কি? তাহা একবার প্রাণ ভরিয়া দেখে। কিন্তু হায়! রজনী তখনও সে সুখ পাইবার অধিকারিণী হয় নাই।

(ষষ্ঠ দৃশ্যে।—শচীন্দ্রের মুখে রজনী সম্বন্ধীয় স্বগত উক্তি মন্দ নয়।

সপ্তম দৃশ্য।—রামসদয় মিত্রের বৈঠকখানা। পারিষদগণ পরিবেষ্টিত শচীন্দ্র আসীন। এ দৃশ্যে হীরালালের তেজস্বিনী বক্তৃতা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। হীরালালের অভিনয় প্রশংসার যোগ্য।

হীরালালের মুখ দিয়া নাটককার এস্থলে এবং অন্যস্থলে যে সকল কথা বাহির করিয়াছেন, তন্মধ্যে সম্পাদক-কুলের উপর বিদ্রূপোক্তি আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইল না।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য——রাজচন্দ্রের বাটী। খোলার বাড়ীর দৃশ্যপট খানি অতি সুন্দর। শচীন্দ্রের কথা লইয়া রজনীর স্বগত উক্তি, রাজচন্দ্র ও মোক্ষদা উভয়ে রজনীর বিবাহের কথা, তাহা শুনিয়া রজনীর দুঃখ-প্রকাশ ইত্যাদি। এ দৃশ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ আপন আপন অংশ উত্তম-রূপে অভিনয় করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য—গোপাল বাবুর গৃহ। চাঁপা ও হীরালাল আসীন। চাঁপা হীরালালের ভগ্নী, গোপাল বাবুর স্ত্রী। গোপাল, রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার হরনাথ বাবুর পুত্র। চাঁপা তাঁহারই পত্নী। চাঁপার অদৃষ্টদোষে পুত্রাদি কিছুই হয় নাই। রজনীকে দেখিয়া লবঙ্গলতার দয়া হয়, তাই তিনি টাকা খরচ করিয়া রজনীর বিবাহ দিতে প্রস্তুত হন। রাজচন্দ্র দাসের কন্যা, কানা ফুলওয়ালীকে আর কে বিবাহ করিবে? অনেক অনুসন্ধানেও পাত্র না পাওয়াতে লবঙ্গলতা, গোপালচন্দ্রকে রজনীর পাত্র ঠিক্ করে। অর্থলোভে গোপালচন্দ্র, কাণা ফুলওয়ালীকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়। গৃহমধ্যে তাহার গৃহিণী (চাঁপা) ছিল, সন্তান-অভাবে অন্য পত্নী পরিগ্রহণে তাই তাহার আপত্তি ছিল না। গরীবের পক্ষে অর্থলোভ বড় ভয়ানক!

রজনী এই সংবাদে প্রমাদ গণিল। কিসে এ বিবাহ না হয়, তাহার উপায়

অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এজন্য সে নিজ-পিতার পদ ধারণ করিয়া নিবারণ করিয়াছিল। কিন্তু পিতা সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে, লবঙ্গলতার কাছে গিয়া, বিবাহে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে লবঙ্গলতা তাহাকে "ভ্রষ্ট" বলিয়া বিদূরিত করিয়াছিল।

এই বিবাহে রজনীকে ঈশ্বর এক সহায় মিলাইয়া দেন। সে সহায় চাঁপা। চাঁপার চেষ্টা, যাহাতে রজনীর সহিত তাহার স্বামীর (গোপাল বাবুর) বিবাহ না হয়। তাই সে রজনীকে স্থানান্তরিত করিবার উদ্দেশে নিজ ভ্রাতা হীরালালকে সম্মত করে। এই দৃশ্যে সেই কথারই অবতারণা করিবার জন্য নাটককার চাঁপা ও হীরালালকে একত্র করিয়াছেন। (হীরালাল, মাতাল অবস্থায়, ভগ্নীর সহিত যেরূপ ভাবে কথা কহিল, (হীরালালের অভিনয় স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয় হইলেও) এস্থলে নাটককারের দোষে আমাদের তাহা তেমন ভাল লাগিল না। (১০))

বঙ্কিমচন্দ্র বাবু হীরালাল কর্ত্তৃক সহোদরা চাঁপার প্রতি এরূপ বেয়াদবি বর্ণনা করেন নাই। নাটককার ইহা জোর করিয়া "উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে" চাপাইয়াছেন। হীরালাল যে সকল কথা রাজচন্দ্র দাসের সহিত কহিয়াছিল, এবং রজনী যাহা অন্তরালে লুকায়িত থাকিয়া শুনিয়াছিল, বঙ্কিম বাবু তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। (নাটককার, হীরালালের সে কথোপকথন, রাজচন্দ্র দাসের সহিত না রাখিয়া, চাঁপার সহিত করাইলেন কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ভাই-ভগ্নীতে এরূপ ভাবে কথা কহা, অস্বাভাবিক ও নীতি-বিরুদ্ধ, সুদর্শকের চক্ষেও অপ্রীতিকর। নহিলে, হীরালাল যে ভাবে অভিনয় করিয়াছিল, তাহা কোন মতে নিন্দনীয় নয়।)

প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে, শচীন্দ্রের পারিষদগণের সহিত হীরালালের এরূপ উক্তি, শচীন্দ্রের অনুপস্থিতে চলিতে পারিত। চাঁপার সহিত হীরালাল যে সকল কথা কহিয়াছিল, তাহার প্রথম অংশ (অর্থাৎ হীরালালের নিজমুখে তাহার আত্মজীবনী বর্ণন) শচীন্দ্রের পারিষদগণের সহিত যুড়িয়া দিলে ভাল হয় এবং শেষাংশ বঙ্কিম বাবুর পুস্তকে যেমন আছে, সেইরূপ রাজচন্দ্র দাসের

(১০) আমাদের মত অন্যরূপ। আমরা হীরালালের অভিনয়ে গুণ ভিন্ন দোষ দেখি না। তবে যে দোষ হইয়াছে, সে নাটকের দোষ। —তত্ত্বাবধারক।

সহিত রাখিলেই বেশ স্বাভাবিক হয়। তাহার উপর, রজনী অলক্ষ্যে সেই কথোপকথন শ্রবণ করিতেছে, ইহা দেখাইতে পারিলে আরও উত্তম হইত, সোণায় সোহাগা হইত।, চাঁপার সহিত হীরালালের কথোপকথন এই পর্য্যন্ত রাখিলেই যথেষ্ট হইত যে, চাঁপা হীরালালকে অর্থের লোভ দেখাইয়া রজনীকে স্থানান্তরিত করিতে সম্মত করাইল এবং হীরালাল ভগ্নীর কথাক তৎকার্য্য উদ্ধারে প্রতিশ্রুত হইল। সদোদরার সম্মুখে এরূপ ভাবে মাতলামি "মাই ডিয়ার (my dear) দিদি"ও সর্ব্বশেষে "দিদি তোমার কাছে মদ আছে" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা অত্যন্ত আপত্তিজনক। (১১) এদৃশ্য এরূপ ভাবে সজ্জিত করিয়া নাটককার পুস্তকের সৌন্দর্য্য হানি করিয়াছেন। আশা করি বারান্তরে তিনি ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

তৃতীয় দৃশ্যের কথা, দ্বিতীয় দৃশ্যের সহিত এক প্রকার বলা হইয়াছে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(চতুর্থ দৃশ্য—কাশী, মণিকর্ণিকার ঘাট। দৃশ্যপটখানি সুন্দর।) কতক-গুলি লোকের মুখে রজনীর জীবনকাহিনীর পূর্ব্ব ঘটনা প্রকাশ ও অমর নাথের সেই কথা শুনিয়া রজনীর সাহায্য চেষ্টা। (অভিনেতৃগণের অভিনয় বেশ স্বাভাবিক, বিশেষতঃ অমরনাথের।) অমরনাথ কর্ত্তৃক, রজনীর বিষয় সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টার, এইখান হইতেই সূত্রপাত। (প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দাস (বৈষ্ণব) অমরনাথের অংশ অভিনয়ে বরাবর বেশ স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছিলেন। তবে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশ-য়ের আমলে, "মেঘনাদ-বধ" প্রভৃতি কঠিন পুস্তক সমূহে, হরিদাস বাবুর যৌবন কালের অভিনয় দেখিয়া, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যত প্রফুল্লিত হইতেন, আজ কাল তাঁহার অভিনয়ে আর যেন তত তেজ নাই। তবে ঐ যে কথায় বলে "পুরাতন চা'ল ভাতে বাড়ে" অথবা "মরা হাতী লাখ টাকা" হরিদাস বাবুর পক্ষেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।

পঞ্চম দৃশ্য—রাজচন্দ্র দাসের বাটী। রজনীর বিবাহে অসম্মতি, মোক্ষদা কর্ত্তৃক রজনীকে তিরস্কার ইত্যাদি। মোক্ষদার অভিনয়ে দোষ আছে। তাহার

(১১) হীরালাল মাতাল বলিয়া মার্জ্জনীয় হইবে কি? —তত্ত্বাবধায়ক।

কণ্ঠস্বর স্থানে স্থানে বড় কর্কশ হয়। তা' ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালন, মুখ-ভঙ্গী প্রভৃতি সামান্য সামান্য দোষের উপর শিক্ষকের (প্রবোধ বাবুর) লক্ষ্য রাখা উচিত। অভিনয় মোটের উপর নিন্দনীয় নহে।

৬ষ্ঠ দৃশ্য—গম্ভীর পাহাড়। দৃশ্যটি নূতন ও সর্বজন-মনোহর। পর্ব্বত শিখরে অচল অটল ভাবে ভবানন্দ যোগারাধনায় মগ্ন। ভবানন্দ বরাবর এক ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন। স্থানে স্থানে তাঁহার কণ্ঠস্বর কঠোর হইলেও, তাঁহার অভিনয় বেশ স্বাভাবিক। পর্ব্বত-শিখরে তিনি যে ভাবে বসিয়াছিলেন,—তাহা যেন ছবিখানি। প্রকৃতপক্ষে, প্রথম দর্শনে শিখর প্রদেশে যোগারাধনায় নিমগ্ন ভবানন্দকে দেখিয়া, দৃশ্যপটে চিত্রিত মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হয়। (ভবানন্দের মুসলমান বেশ ও তাঁহার মুখে সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির কথা আমাদের বড় ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ ভবানন্দ প্রথমে অমরনাথের সহিত, যে ভাবে যে সকল উচ্চ মহত্বপূর্ণ লম্বা চৌড়া কথা কহিতেছিলেন, তাহার মধ্যে সহসা "বিধবা বিবাহ" "কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ" "জাতিভেদ" "স্ত্রীস্বাধীনতা" প্রভৃতি বিষয়ক বঙ্গ সমাজের প্রতি আক্রমণ, অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, তাহাতে যেন জমাটী আসরে তাল কাটিয়া যায়।)

"সমাজ-সংস্কার" প্রভৃতি বিষয়ক কথা গুলি, অমরনাথের মুখ দিয়া বাহির করাইয়া, ভবানন্দের জন্য শাস্ত্র, ধর্ম্ম, ও মোক্ষতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্য গুরুতর কথা লিখিত হইলেই ভাল হইত। ভবানন্দ-চরিত্র যেরূপ সুন্দররূপে অভিনীত হয়, আমাদের মতে তাঁহার মুখে উচ্চতত্ত্বের উপদেশ গুলি অমৃত বর্ষণ করিবে।

(তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, ঘোরা যামিনীতে, রজনীর নিদ্রাভঙ্গ করাইবার জন্য চাঁপা কর্ত্তৃক দ্বারে মৃদু মন্দ আঘাত। এই সময় রঙ্গমঞ্চের আলোক কিছু কমাইয়া দিলে ভাল হইত। (১২) রজনী অভিনয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি বলিয়াই, সামান্য সামান্য ত্রুটিরও উল্লেখ করিতেছি।

(১২) দ্বিতীয় অভিনয় আমরা দেখিয়াছি; তাহাতে ঐ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।
—তত্ত্বাবধায়ক।

দৃশ্যপট গুলি যথাসময়ে ফেলা, ঠেলা বা তোলা সম্বন্ধেও বিশেষ দোষ ঘটিয়াছিল। এ সকল বিষয়ে ষ্টেজ ম্যানেজার বাবু দেবেন্দ্রনাথ দাসের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। সামান্য সামান্য ত্রুটি একত্র হইলে দর্শকগণের চক্ষে, এমন সুন্দর অভিনয়ও নিন্দনীয় হইবে।)

চাঁপা রজনীকে উঠাইয়া পলায়নের উপায় ও বন্দোবস্ত বর্ণন করিল। রজনী তখন "বিবাহ" রূপ ভীষণ দায় হইতে অব্যাহতি পাইলে বাঁচে। অদৃষ্টে সুখ ছিল বলিয়াই রজনী পলাইয়াছিল।

(দ্বিতীয় দৃশ্য—কলেজ ষ্ট্রীট। হীরালালের সঙ্গে রজনী পলায়ন করিতেছে) কোথায় যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। অন্ধ রজনী, বিবাহের দায় হইতে নিষ্কৃতি-লাভার্থে অপরিচিত পুরুষের পদ-শব্দ লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে।

এদিকে হীরালাল তখন মদিরা-পানে উন্মত্ত; এমন কি, ঠিক সোজা হইয়া চলিতেও পারিতেছে না। অভাগিনী রজনী, হীরালালের চরিত্রদোষ-সম্বন্ধে কিছু জানিত না। অন্ধতাপ্রযুক্ত হীরালালের টলটলায়মান্ চলন দেখিতে পায় নাই।) (এমন সময় নেপথ্যে এক জন বার-বিলাসিনীর অসম্বদ্ধ গীত শব্দ রজনীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল :—

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

"যামিনী যে যায় হায়! আশা মোর পূরিল না।
গুণমণি, কামিনীর মান কেন রাখিলে না॥
আমি তোমায় ভালবাসি, প্রাণ দিয়ে সদাই তুষি,
তুমি তাতে নও খুসী, আমায় ভালবাস না।"

(নেপথ্যে যে কামিনী, এই গীতটী গাহিয়াছিল, সে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্রী। তাহার কণ্ঠস্বর সতেজ ও সুমিষ্ট।)

হীরালাল তখন মদোন্মত্ত। সুতরাং বিকৃতভাবে হীরালাল কোনকোন কথা উচ্চারণ করিল। শুনিয়া রজনীর হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল।

হীরালালের চরিত্র-সম্বন্ধে রজনী কিছুই জানিত না, বঙ্কিম বাবু, এই

কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারী বাবুও কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া রজনীকে সেই ভাবে সাজাইয়াছেন। কিন্তু এই স্থানে বড় গোল বাধিল।

উপন্যাসের ২৮পৃষ্ঠা হইতে ৩০পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, যে রজনী, হীরালালের চরিত্র-দোষ বেশ জানিত। ইহা বঙ্কিম বাবুর দোষ বা তাঁহার ভুল, সাহস করিয়া বলিতে পারি না। পাঠকগণ পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, এস্থলে বঙ্কিম বাবুও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। চারি পৃষ্ঠা পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন, রজনী অন্তরালে থাকিয়া তাহার পিতা রাজচন্দ্রের সহিত হীরালালের কথোপকথন শুনিয়াছিল। সে কথোপকথনের শেষ চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে, রজনী, হীরালালের চরিত্র-সম্বন্ধে কিছু জানিত কি না। তাহা এই :—

"হীরালাল চুপি চুপি (পিতাকে) কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না। পিতা বলিলেন "সে কি ? না—আমার কাণা মেয়ে।"

"হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এ দিক্ ও দিক দেখিতে লাগিল। চারি দিক্ দেখিয়া বলিল, 'তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে ?' পিতা বিস্মিত হইয়া বলিলেন 'মদ কি জন্য রাখিব !'"

হীরালাল 'ঘরের এদিক ওদিক্ দেখিতে লাগিল' 'চারিদিক্ দেখিয়া বলিল' ইত্যাদি। এ সব অন্ধরজনী কেমন করিয়া জানিল, তাহা বলিতে পারি না। বঙ্কিম বাবু এখন স্বর্গে; তিনি থাকিলে বোধ হয় এ কথার উত্তর দিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত যে রজনী, অন্তরালে থাকিয়া হীরালালের মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিল, সেই কি আবার বলিতে পারে, "হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা আমি কিছুই জানিতাম না।"

এখন আমরা নাটককারকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, যে তিনি পুস্তকে এইরূপ অসামঞ্জস্য দেখিয়াই বুঝি হীরালাল ও রাজচন্দ্র দাসের কথোপকথন ও অন্তরালে থাকিয়া রজনীর তাহা শ্রবণ, এই অংশটুকু বাদ দিয়াছেন ? কিন্তু যাহাই হউক, তাহা হইলেও, আমরা সহোদরার সমুখে ওরূপভাবে বেয়াদব কথাবার্ত্তার অনুমোদন করি না।

(তৃতীয় দৃশ্য—গঙ্গাবক্ষ। নৌকারোহণে রজনী, হীরালাল, মাঝি ও দাঁড়ীগণ। এ দৃশ্যটি অতি সুন্দর—অতি হৃদয়গ্রাহী। থিয়েটার কোম্পানি

ইহাতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। উদ্বেলিত তরঙ্গ-পূর্ণ ভাগীরথীর এই দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণের চিত্ত কত প্রফুল্ল হয়, তাহা বলা যায় না।

তাহার পর এই স্থলে যখন পিশাচবৎ কঠোরহৃদয় হীরালাল সহায়হীনা অন্ধ রজনীকে একটী চড়ার উপর নামাইয়া দিয়া, রহস্যের হাসি হাসিয়া, মাঝ দরিয়ায় নৌকা ভাসাইয়া দিল, তখন রজনীর ক্রন্দন ও আক্ষেপোক্তি শুনিলে কেহই অশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এই দৃশ্যে হীরালাল ও রজনীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

প্রবন্ধটী বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। সুতরাং আর প্রতি দৃশ্য ধরিয়া আলোচনা করা চলেনা। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী সম্বন্ধে ও রজনী নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার রহিল। তবে এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে পাঠক মাত্রেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, অনেককাল বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে এপ্রকার অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আজকাল "বেঙ্গল থিয়েটারে" যত ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ আশা হয় যে, ইঁহারা চেষ্টা করিয়া যদি ভাল ভাল নূতন পুস্তকের অভিনয় আরম্ভ করেন, অতি সত্বরেই সাধারণের অধিকতর প্রিয় হইবেন।

শচীন্দ্রনাথ ও অমরনাথের অভিনয় বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। তাঁহারা প্রসিদ্ধ অভিনেতা হইলেও, নিজ নিজ অংশ মুখস্থ থাকিলে, আরও সুন্দররূপে অভিনয় করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

শেষাংকে অমরনাথের সহিত কথাবার্ত্তায় লবঙ্গলতা যদি অঙ্গ ভঙ্গী সম্বন্ধে একটু সাবধান হইয়া চলেন তাহা হইলে তিনি লবঙ্গলতার অভিনয়ে আরও সুখ্যাতি লাভ করিবেন।

শেষাংকে ভবানন্দের শচীন্দ্রের প্রতি উপদেশ ও তৎপরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় শচীন্দ্রনাথের "ওহে ধীরে, রজনী ধীরে! ধীরে ধীরে, আমার এই হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ কর।" ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য বড়ই স্বাভাবিকতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

গীতি।

ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

ভব নিদ্রা পরিহরি, মন!, হও সচেতন।
জাগ্রত স্বপন ত্যজি' চাহ রে জ্ঞান-নয়ন।
আপনার হয় যারা, সকলই মায়ার কারা,
হ'য়ে তাই দিশে হারা সংসারে হই মগ'ন।
জীবন নশ্বর হের, ভাব সেই পরাৎপর,
তিনি যে কেবলই সার, আর'সব ভুয়াবাজী ;—
মায়া মরীচিকা ভ্রমে মজ না সংসার প্রেমে,
ভুলিবে নিজেরে ক্রমে শিয়রে দেখ শমন।

ললিত—আরাঠেকা।

কি ভাবিছ ক্ষেপা মন! বসিয়ে হে অকারণ
ভাবিলে হবেনা কিছু লও তাঁহার শরণ।
ভেব না ভেব না আর, বুঝে দেখ কেবা কা'র,
বুঝিলে সব অসার, ভেবে' দেখ, কে আপ'ন।
সংসার পরীক্ষাস্থল, ত্যজ তব মোহ-মল,
নতুবা পাবে না ফল, হৃদয়ে শান্তি কখন।

শ্রীবিরিঞ্চিমোহন সেন।

অনুশীলন

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

প্রথম ভাগ } ১৩০১ সাল, চৈত্র। { সপ্তম সংখ্যা।

সমালোচনা।

সাময়িক সাহিত্য।

(চোরবাগান-সাহিত্য-সমালোচক সমাজ হইতে প্রকাশিত।)

সাহিত্য মাঘ—শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের "লক্ষণাবতী" এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ। গৌড় কথাটায় যেন প্রাণের অনেক কথা জাগিয়া উঠে। অতীত ইতিহাসের—সেই বাঙ্গালা দেশের—বাঙ্গালী রাজার—বাঙ্গালার অভ্যুদয় ও পতনের—কত কথাই না মনে উদিত হয়। লেখক, ঐ স্থানীয় লোকদিগের নির্দেশানুসারে ও নিজে ভ্রমণ করিয়া গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া "লক্ষণাবতী"-সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, তাহাই বলিয়াছেন।

বাঙ্গালায় পাল ও সেন বংশের সহিত গৌড়ের অভ্যুত্থান ও পতন, দৃঢ়-রূপে সম্বদ্ধ। অধুনা স্বর্গগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ লেখনী-মুখে পাল ও সেন বংশ-সম্বন্ধে অনেক কথা বাহির হইয়া গিয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রেও, মধ্যে মধ্যে এই বিষয়ের আলোচনা-সৌকর্য্যার্থে অনেক লেখা-লেখি চলিয়াছিল।

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, এ বিষয়ে বিস্তর লিখিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষায় বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহও এ বিষয়ের কতকগুলি অসঙ্গত মত ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচীন গৌড়ের লিখিত ইতিবৃত্তের মধ্যে তাম্রশাসন গুলিই প্রধান। এ গুলির সাহায্যে এ পর্য্যন্ত অনেক কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান ইতিহাস-লেখক মিনহাজ উদ্দিন সমকালীন হইলেও তাঁহার "তবকৎ নশিরি" খানি যেমন বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস হওয়া উচিত, উহা তেমন কখনই নয়। এ সম্বন্ধে যতই স্বাধীনভাবে আলোচনা হয়, যতই গবেষণার সহিত প্রাচীন নগরগুলির স্থান-নির্দ্দেশ ও বিবরণ লিপি-বদ্ধ হয়, বাঙ্গালা ইতিহাসের ততই মঙ্গল। 'বটব্যাল' মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি কিরূপ প্রখর, তাহা "সাহিত্যের" "সাধনায়" ও 'নব্যভারতের' প্রবন্ধ সমূহে প্রকটিত। "মধুচ্ছন্দার সোমযাগে" বাঙ্গালার পাঠক বিশেষ পরিচয় পাইয়াছেন। * "লক্ষণাবতী" প্রবন্ধেও গৌড়ের ইতিহাস উদ্ধার সংকল্পে তাঁহার পরিশ্রম বিশেষ সফলীকৃত হইয়াছে।

সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রবন্ধ—ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন। মূল প্রবন্ধের তাৎপর্য্য সমালোচনায় একটী বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। বাদ-প্রতিবাদ, সিংহ ও বটব্যালের মধ্যে চলিতেছে। তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার লইয়াই এই বাদানুবাদ। ইহাঁদের উভয়ের বক্তব্য শেষ হইলে এ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথা বলিব।

ফার্ম্মেণ্টেসন প্রবন্ধে—শ্রীপতি বাবুর বিশেষ পরিশ্রম প্রকাশ পাই-তেছে। এই প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ভাষা-সম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত সরল ও সাধারণ-বোধগম্য ভাষায় লিখিত হয়, দেশের ততই মঙ্গল।

জগদানন্দ বাবুর "বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ" পূর্ব্বের ন্যায় চলিতেছে। "মস্তিষ্কের দৌত্য" সংগ্রহটী কৌতূহল-প্রদ।

---

* মধুচ্ছন্দার সোমযাগে স্বাধীন মত যতটা আছে, তদপেক্ষা সাহেবী মত অনেক বেশী।—সম্পাদক।

তৃতীয় প্রস্তাব—মীরকাশেম। হরিসাধন বাবুর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ গুলি এরূপ সরলভাবে লিখিত যে, তাহাতে ঐতিহাসিক জটিলতা কাটিয়া গিয়া বেশ সুপাঠ্য হইয়া দাঁড়ায়; বিশেষতঃ তাঁহার মোগল রাজত্ব-কালের ও ইংরাজাধিকারের প্রথম সময়ের ইতিহাস গুলি বড় অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি-পরিপূর্ণ। মীরকাশেম এখনও শেষ হয় নাই। শেষ হইলে ইহা একটী উপাদেয় প্রবন্ধ হইবে। মীরজাফর ও মীরকাশেম বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। একের আমলে বাঙ্গালার ধ্বংস ও অপরের আমলে তাহার প্রতিবিধান হইয়াছিল। কাশেম আলি খাঁ, বাঙ্গালার শেষ নবাব। তাঁহার ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে ইতিহাস-ভক্ত পাঠক বিশেষ আনন্দ অনুভব করিবেন। এ প্রবন্ধ যত দূর বাহির হইয়াছে, তাহাতে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ।

প্রতিশোধ উপন্যাস এখনও চলিতেছে। শেষ না হইলে এ সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে না।

মুসলমান কবির বাঙ্গালা কাব্য একটী ভাল প্রবন্ধ। "আশাস্থল" কবির সমগ্র রচনা উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। এবারে সাহিত্যের প্রবন্ধ গুলি প্রীতিপ্রদ। গত বারের অপেক্ষা এবার পড়িবার বিষয় অনেক আছে।

শ্রী—ম

জন্মভূমি।*

চতুর্থ বর্ষ (১৩০০ সাল, পৌষ—১৩০১ অগ্রহায়ণ)।

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে জন্মভূমির চতুর্থ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে। পৌষ মাসে পঞ্চম বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এ সময়ে এক বার উহার

* আমরা 'নব্যভারতে' জন্মভূমির প্রথমতঃ বিস্তৃত সমালোচন করি। তাহার পর হইতে উহার উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে। "অনুশীলনের" প্রথমেই 'নব্যভারত' ও 'সাহিত্যের' সঙ্গে 'জন্মভূমির' আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি, ক্রমশঃ উহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। জন্মভূমির বর্ত্তমান উন্নতির জন্য ন্যায়তঃ উহার সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক কার্য্যতঃ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। —তত্ত্বাবধারক।

অতীত জীবনের কাহিনী স্মরণ করা উচিত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, অতীত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিবার আবশ্যক কি? সাহিত্যে অতীতের সমালোচনা একান্ত কর্ত্তব্য। তুলনা ব্যতীত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। অতীত কাহিনী বর্ণনা, অনেক সময় তুলনায় সমালোচনা করা মাত্র। আমরা লেখকানুক্রমে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

তৃতীয় বৎসরের জন্মভূমি অপেক্ষা চতুর্থ বৎসরের জন্মভূমি বিশেষ কিছু উন্নতি করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌষ মাসে 'গ্যাস' মাঘ মাসে "রূপসী হিরণ্ময়ী" ও গুটিকতক ধাতু, বর্ত্তমান সংবৎসরের বৈশাখে 'নূতন বৃক্ষ' আষাঢ় মাসে 'সূর্য্য গ্রহণ' ও 'বায়ু' ভাদ্রের পত্রিকায় 'সুগন্ধ' এবং অগ্রহায়ণের সংখ্যায় 'এড়ি রেশম' এই আটটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'রূপসী হিরণ্ময়ী' শীর্ষক প্রবন্ধটি ব্যতীত অপরগুলি অতীব প্রয়োজনীয় প্রস্তাব। 'গ্যাস' 'সূর্য্যগ্রহণ' ও 'বায়ু' এই তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষা যে রূপ প্রাঞ্জল হওয়া আবশ্যক, গ্যাস শীর্ষক প্রবন্ধটির ভাষা সেরূপ হয় নাই। তবে প্রবন্ধ গুলি মন্দ হয় নাই। এই সমস্ত প্রবন্ধে জানিবার ও শিখিবার কিছু কিছু বিষয় আছে। "রূপসী হিরণ্ময়ী" একটি অনুত্তম গল্প। লেখক ইহার প্রথমে লিখিয়াছেন,—ভাবিয়াছিলাম এই সে হতভাগিনীর কথা লিখিয়া আমার লেখনীকে আর কলঙ্কিত না করি।" তবে হতভাগিনীর এমন কি বিষম মায়া যে, তাহার নিকট বৈজ্ঞানিক ত্রৈলোক্য বাবু পরাস্ত হইলেন? এই গল্পটি লিখিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন "কিন্তু লিখিতে আমার মন হইতেছে না, কলম সরিতেছে না'। মন না হইলেই ছিল ভাল, কলম না সরিলেই হইত ভাল। 'গুটি কতক ধাতু' প্রবন্ধ পড়িয়া বড়ই আনন্দ হইল। মনে করিলাম সন্দর্ভ-লেখক, বুঝি ব্যাকরণের ধাতু লইয়া শব্দ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট স্থানে পত্র উদ্ঘাটন করিয়া বুঝিলাম, সন্দর্ভটী ভাষার ধাতু নয়; গুটিকতক খনিজ দ্রব্যের বিষয় অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা, দস্তা, টিন এই কয়েকটি ধাতুর প্রতি বিষয়ে ও ঐ সকল ধাতু সম্বন্ধে আরও কতকগুলি স্থূল স্থূল বিষয় লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাধ্যয়ন সময়ে লোকের ভাষার প্রতি ক্ষে

রূপ অমনোযোগ, তাহাতে বলা যাইতে পারে, ইহাতে নিরাশ হওয়া দূরে থাকুক, বরং হৃদয় সমধিক প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বস্তু-বিজ্ঞানে আমাদের এখন মহতী অনভিজ্ঞতা, সুতরাং ঐ শ্রেণীর লেখা যতই প্রকটিত হয়, ততই সমাজের মঙ্গলের আশা করা যায়। আমরা পরাধীন জাতি। এই সকল যথার্থ প্রয়োজনীয় বিষয়ে অস্মদীয় সামাজিক ও পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। 'নূতন বৃক্ষ' 'সুগন্ধ' এবং 'এড়ী রেশম' ঐ তিনটী প্রস্তাবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'নূতন বৃক্ষ' প্রবন্ধটীতে মারটাসি বংশান্তর্গত, ইউকালিপটস বৃক্ষের বিষয় লিখিত হইয়াছে। 'সুগন্ধ' প্রবন্ধটিতে সুগন্ধ দ্রব্যাদি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, পাশ্চাত্য দেশে কিরূপ উপায়ে সুগন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, ইত্যাদি বিষয় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। 'এড়ী রেশম' প্রস্তাবটীতে এড়ী রেশম কোথায় চাস হয়, এড়ী পোকারা কয় প্রকার জাতিতে বিভক্ত, উহার গুটি হইতে কি প্রকারে সূতা বাহির করিতে হয়, ঐ সূতার কাপড় কিরূপ দীর্ঘকাল-স্থায়ী, এবং ঐ সূতা কিরূপ দরে বিক্রীত হয়, ঐ সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে এবং ধারাবাহিক ক্রমে সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে সন্দর্ভ-রচয়িতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে পারিলে আমরা সফল-মনোরথ হইতে পারি। আজ কাল অনেকেই নানাবিধ তত্ত্বের অনুশীলনে ব্যস্ত, ঐ সকল স্বাধীন উপজীবিকা-পথ-প্রদর্শক এতাদৃশ বিষয়ে প্রায় কেহই লেখনী চালনা করিতে চাহেন না। ইহা আমাদিগের বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমরা "হা চাকুরি, যো চাকুরি" না করিয়া যদি এই সকল বিষয়ে মনোযোগী হই, তাহা হইলে আমাদের এ দরিদ্রতা-নিপীড়িত ভারতের মঙ্গল হয়। কিন্তু আমাদের এই দুর্দ্দিনে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিতে বড় কেহ ইচ্ছুক নয়। এই সকল প্রবন্ধ সুযোগ্য বহুদর্শী লেখক ত্রৈলোক্যনাথ বাবুর লেখনী-প্রসূত। তিনি সুপথেরই পথিক হইয়াছেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাবু ইংরাজীতে পারদর্শী ব্যক্তি। তাঁহার বাঙ্গালা প্রস্তাব-সন্দর্শনে আমরা আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়াছি। আশা করি, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে বাঙ্গালার অকপট মিত্রগণের হৃদয়ও মহোল্লাসে নৃত্য করিবে।

বাবু হরনাথ বসুর লিখিত গত বৎসরের পৌষ মাসের জন্মভূমিতে

'গরীব গর্দ্দভ ও ম্রিয়মাণ মেষ', চৈত্র মাসে 'অশ্ব' এই দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হরনাথ বাবু নূতন লেখক। তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। প্রাণিতত্ত্ব সম্বন্ধে হরনাথ বাবুর নিকট আমরা অনেক আশা করিব; চেষ্টা থাকিলে কালে তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতির সম্ভাবনা।

পৌষ সংখ্যক জন্মভূমিতে "ম্যালেরিয়া-মঠ" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রচনায় রচয়িতার নাম অপ্রকাশিত। সন্দর্ভ-লেখকের বাঙ্গালা লেখায় যে অধিকার আছে, তাহা তাঁহার পদবিন্যাস ও শব্দ-যোজনার চাতুর্য্যে স্পষ্টীকৃত।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র বসু।

পুস্তক সমালোচনা।

চাঁদরাণী—প্রকৃত ঘটনা-মূলক ধর্ম্মাত্মক উপাখ্যানগ্রন্থ। ইহাতে গ্রন্থকার কেন নাম দেন নাই, বুঝিলাম না। প্রথম চেষ্টার ফল যদি সাধারণে উত্তম না বলেন, এই ভাবিয়া আত্ম-গোপন করা হইয়া থাকে, আমরা বলি তাহা আর করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় ভাগে গ্রন্থকার নাম দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, এই আমাদের অনুরোধ। ইহাতে কথোপকথনের যে ভাষা লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ভাষার বিশুদ্ধি ও রচনার সরলতার দিকে গ্রন্থকারের দৃষ্টি রহিয়াছে, দেখিয়া সুখী হইলাম। এই ভাষা-বিদ্রূপের দিনে ইহা অল্প প্রশংসার কথা নয়। এক জন সমালোচক আইডলেট্রি (Idolatry) শব্দের অযথা অনুবাদ "পৌত্তলিকতা" শব্দের প্রতি যে মতামত দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। পৌত্তলিকতা না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'প্রতিমা পূজা' প্রচলিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। এই প্রতিমার পূজার গুরুত্ব কি, তাহার সার্থকতা কত দূর আছে, "চাঁদরাণী" পাঠে বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায় উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষণী ভাষায় ইহাতে যে ইতিহাসের ব্যাপার বর্ণিত, তাহার যথোপযুক্ত প্রশংসা আমরা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই সকল তো গেল সুখ্যাতিবাদের কথা। কয়েকটী সামান্য ত্রুটির উল্লেখ না করিলে, আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি রহিয়া যাইবে বলিয়া কিছু বলিয়া লইতে চাই। যে পুস্তকে এত বিশুদ্ধির সমাদর, তাহাতে ইংরাজীর অনুকরণ" ৯২ পৃ.কল

সম্বৎ ১৯৫১" না থাকিলেই, ভাল হয়। "সংবৎ ১৯৫১, ৯ই শ্রাবণ' হওয়াই অবশ্যক। ইহাই আমাদের স্বজাতীয় রীতি। আর একটি কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। "হইবেক" স্থলে 'হইবে' লিখিলেই চলিত ক্রিয়ার অনুবর্ত্তন করা হয়। আশা করি, এই পুস্তকের উত্তর ভাগে এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইবে। সর্ব্বশেষে আবার বলি—গ্রন্থকার প্রকাশিত হউন, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি নাই, কিন্তু সমাজের লাভ আছে। তাঁহার দৃষ্টান্তে কত উদীয়মান লেখক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। আমরা বিশ্বস্তলোক-মুখে শুনিতেছি, "সংখ্যাসার" "হিন্দুমহিলা নাটক" "সাত্ত্বিক সঙ্গীত" ইত্যাদি পুস্তক এই গ্রন্থকারের রচিত। অতএব আর আত্মগোপন কেন?

আমাদের ভ্রমণ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

(ক) গত বারে বলিয়া রাখিয়াছি, কামারেরা অত্রত্য প্রথমাধিবাসী। এক্ষণে অন্যান্য অধিবাসীদের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

(খ) রায়গণ। ইহাঁরাই এই পল্লীর দ্বিতীয় অধিবাসী। কামারদের পরই ইহাঁরা এখানে বসতি গ্রহণ করেন। এখানকার 'গোপাল মন্দির' ও 'দোলমঞ্চ' এই রায়দিগেরই কীর্ত্তি ঘোষণার জন্যই যেন আজও পর্য্যন্ত শিরোদেশ সমুন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। কামার, এই গ্রামের প্রথম অধিবাসী হইলেও, এই রায়গণই ভদ্র অধিবাসীদের প্রথম পথপ্রদর্শক। উক্ত উভয় দেবশালাই ১৬২১ শকাব্দের পূর্ব্বতন। কারুকার্য্য-চাতুর্য্যে অভিনিবেশ করিলেও, উহার প্রাচীনতা অনুমিত হইয়া থাকে।

(গ) চট্টোপাধ্যায়গণ। বিষ্ণুমন্দির-প্রসঙ্গে উহাঁদের কুল-তালিকাদি বলা হইয়াছে।

(ঘ) কনোজী ব্রাহ্মণ। ১৫৩৮ পনর শত আটত্রিশ শাকে (১০২৩ দশ শ তেইশ সালে) উহাঁরা এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। প্রবাদ, উহাঁদের

প্রথম নিবাস লাহোর। কনোজই তাঁহাদের আদিম বাসস্থল (অভিজন)। প্রথমতঃ বাঁকুড়ার অধীনস্থ মেজেগ্রামে পাঁড়েদিগের বাসস্থান ছিল ; তৎপরে কুম্ভারডিহিতে অধিবাস ঘটে। এই গ্রাম, অত্রত্য ভূম্যধিকারী রাজা ইন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর অধীন ছিলন তাঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ও জমিদারবাটী-নিবাসী। তৎপূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত 'মেজে' তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। ইহা রাণীগঞ্জের দক্ষিণে দামোদর নদের পর-পারে তত্তীরে অবস্থিত। নারায়ণ পাঁড়েই এখানকার আদি নিবাসী। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ভীম। বহু চেষ্টায়ও তাঁহাদের পিতার নাম জানিতে পারা গেল না। সুতরাং তাঁহারা কাহার পুত্র, অদ্যাপি জানা যায় নাই।

বংশাবলি এই,—
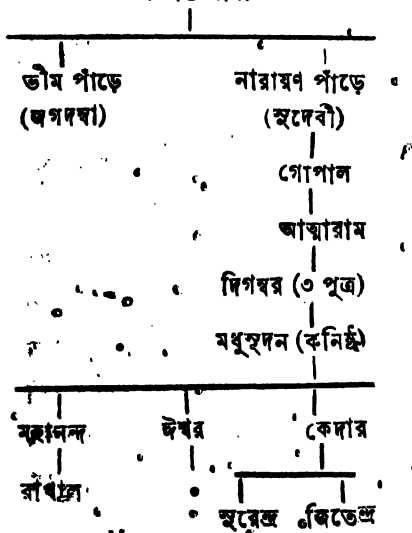
আনুমানিক ১৫৪০ শাকে জীবিতাবস্থায় প্রেমপুরীর সমাধি হয়। সমাধি-মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহার জীর্ণ-সংস্কার আবশ্যক। গ্রামস্থ সকলে ভক্তিভরে তাঁহার পবিত্র কীর্ত্তি স্মরণ করেন। তাঁহার প্রতি সম্মানের চিহ্ন আছে। প্রতি-নিশায় লোকে তথায় প্রদীপ জ্বালিয়া দেন। ইহাই

সম্মানের নিদর্শন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালী দেবীর পূজার ভার পাঁড়েদের উপর সমর্পণ করিয়া যান। সুতরাং পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণ, প্রেমপুরীর সমসাময়িক। প্রেমপুরীর ঠিক্ কোন্ সময়ে এখানে সমাগম ঘটে, নির্ণয় হইতেছে না। প্রেমপুরীর প্রতিষ্ঠিত উক্ত দেবীর মহানিশায় পূজা হইয়া থাকে। উখড়ার উত্তরে যে জঙ্গল ছিল, তথায় তিনি যোগ করিতেন। পূর্ব্বকালে দক্ষিণাংশে গ্রাম খানি বিস্তৃত ছিল। পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রেমপুরীর স্থাপিত বামাকালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলে প্রসঙ্গাধীন পুনরায় বলিতে হইল। গ্রামে যে তিনটি কালীমন্দির দৃশ্যমান হইয়া থাকে, তন্মধ্যে 'বামাকালী' প্রেমপুরীর স্থাপিত। ঐ দেবী ভয়ঙ্করী সংজ্ঞায় আখ্যাত, পরিচিত বা প্রখ্যাত। কুঞ্জবিহারী নামক এক ব্যক্তিকে ঐ দেবী প্রদত্ত হয়। কুঞ্জবিহারীই ঐ দেবতার অধিকারী; পাঁড়েরা পূজারী। প্রেমপুরী ইহার পরে গ্রামের উত্তরে গিয়া আপন যোগাসন স্থান নিরূপণ করিয়া লন ও তথায় তান্ত্রিক মতোক্ত বামাচারে সিদ্ধ হন।

(৬) প্রথম প্রস্তাবে জমিদার-বংশের বিষয় যথাকথঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মহারাজ তিলকচাঁদ বাহাদুরের সহিত এই বংশীয়া বিষণকুমারীর বিবাহ হয়। রাণী বিষণকুমারী ৺রাধাগোবিন্দ জীউর সেবার্থে ১৮০০ বিঘা ভূমি দান করেন এবং উক্ত দেবতার মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পিত্রালয়-স্থিত উখড়ার অস্থলের ঠাকুর ৺বৃন্দাবনচন্দ্র জীউকে ধুনারা গ্রাম সমর্পণ করেন। তখন মনসারাম মোহন্ত। মদনমোহন জীউকে যে গ্রাম সম্প্রদত্ত হয়, তাহা পরে ঐ দেবতারই নামে বিখ্যাত হয়। অস্থলের তৃতীয় দেবতা গোপীনাথ জীউ। কেন্দুলিতে ইছাই ঘোষের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরূপা দেবীও বিষণকুমারীর দানে বঞ্চিত নন। রাণী বিষণকুমারীর গর্ভে মহারাজ তিলকচাঁদের যে পুত্র জন্মে তাঁহার নাম তেজচাঁদ। তিনি উত্তরকালে রাজা তেজচাঁদ নামে খ্যাত হন। সুতরাং বক্তার সিংহ, রাজা তেজচাঁদের মাতুল। ঐ বক্তার সিংহই, নয়নতর্কভূষণকে উখড়ায় বাস করান। তৎপূর্ব্বে তর্কভূষণের যেথায় বসতি ছিল, এখন তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। তিনি কাশ্যপ গোত্রীয়, সুতরাং চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী। তিনি ছকড়ির সন্তান। ১৫৬৮ শাকে ৯৫৩ সালে সম্ভবতঃ তাঁহার উখড়ায় বাস হইয়াছিল। তাঁহার

বংশাবলি দৃষ্টে অঙ্ক-নিরূপণ, ঘটনা-বর্ণন ও বিবৃত বিষয়াবধারণ সুগম হইবে, এই আশায় বংশতালিকা ২৬৫ পৃষ্ঠায় প্রদান করা গেল।

(চ) বক্তার সিংহের ৬ পুত্র। চতুর্থ পুত্র ভোলানাথের পান্নালাল, হীরালাল ও জহরিলাল এই তিন পুত্র। পান্নালালের পুত্র ছিল না, হীরালালের এক পুত্র বনয়ারীলাল। তাঁহার পুত্র হয় নাই। কনিষ্ঠ জহরিলালের পুত্র কুঞ্জবিহারী। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা মহাতাপচাঁদের ভাগিনেয়ী অমৃতকুমারীকে বিবাহ করেন। কুঞ্জবিহারী বাবুর পুলিনবিহারী ও গোষ্ঠবিহারী নামে দুই পুত্র জন্মে। ইঁহারাই উখড়ার বর্ত্তমান সময়ের জমিদার। ইঁহারা দুই জনেই অতি সদাশয়। কোন প্রকার ব্যসন, ইঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এমন অমায়িক-স্বভাব যুবক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বংশতালিকা এ স্থলে প্রদত্ত হইল ;—
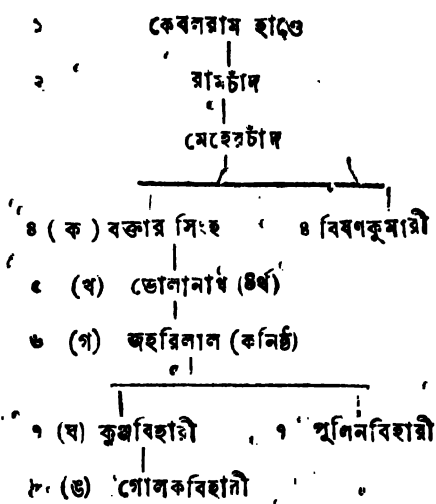
উপরে যে বংশতালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতে পাঠক সকল বুঝিয়াছেন। মেহেরচাঁদের কন্যা বিষণকুমারীর সঙ্গে রাজা তিলকচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ঐ বংশের সহিত রাজবংশের যে সংযোগ হইয়াছিল, তাহা উহাতেই বোঝা গেল। তদ্ভিন্ন দেখা যায়, কুঞ্জবিহারী বাবুর, রাজা মহাতাপচাঁদের ভাগিনেয়ী অমৃতকুমারীর সহিত বিবাহ হইয়াছিল। কুঞ্জবিহারীর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের

রাজবাটীর লছমন কপুর ও কানাইলাল বাবুর কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে। কুঞ্জবিহারী বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র গোষ্ঠবিহারী বাবুর বিবাহে মহাসমারোহ হইয়াছিল। আমাদের এক বন্ধু উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পুলিনবিহারী বাবুর এক পুত্র হইয়াছে। ইহাঁদের দেব-সেবার বন্দোবস্ত অতি উত্তম। অতিথি ও অভ্যাগতের সমাদর বা সংবর্দ্ধনা, যেরূপে করিতে হয়, তাহা ইহাঁদের বিলক্ষণ জানা আছে। অতীব প্রাচীনকালে হিন্দুরীতিনীতি অনুসারে যে ভাবে আতিথ্য-সৎকার সমাহিত হইত, এই গোষ্ঠীতে তাহার সুব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা হিন্দু। কি বাক্যনিষ্ঠা, কি কার্য্যনিষ্ঠা, কি আচার-ব্যবহার, কি ক্রিয়া-কলাপ, সমস্ত বাহ্য ও আন্তরিক বিষয়েই ইহাঁদের হিন্দুয়ানী পূর্ণ মাত্রায় ষোল আনায় দেখিতে পাইবে।

(ছ) নয়ন তর্কভূষণের গোষ্ঠী এবার বিবৃত হইতেছে। বক্তার সিংহ, নয়নতর্কভূষণকে উপড়াপ আনয়ন করেন। তিনিই উহাঁদের অত্রত্য প্রথম পুরোহিত। নয়নতর্কভূষণের বংশাবলী প্রদত্ত হইল :—
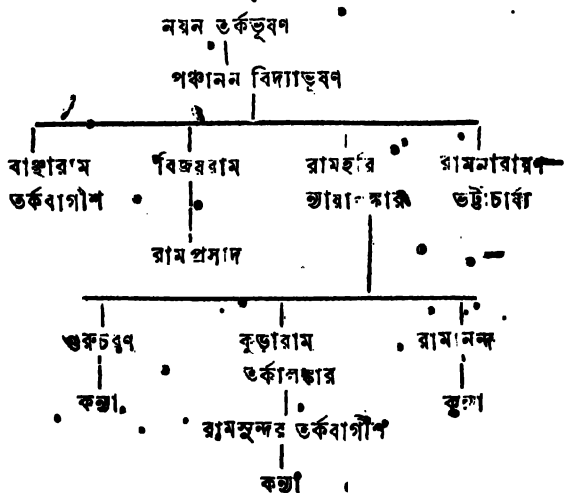
কালিগড়।—এই গ্রামের প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর কোণে আবড়া নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামের বাহিরে একটী কালীমন্দির আছে। তথায় প্রত্যহ ৺কালী দেবীর পূজা হয়। ৺শ্যামাপূজার সময় প্রতি বৎসর

এখানে অনেক মেষ বলি হইয়া থাকে। এই মন্দিরের প্রায় ২০।৩০ বিশ ত্রিশ হস্ত দূরে একটি ক্ষুদ্র গর্ত্ত রহিয়াছে। ইহার নাম "কালীগড়।" এই গড়ের জল কখনও শুষ্ক হয় না। এমন কি. গ্রীষ্মকালেও ৭।৮ সাত আট খানি গ্রামের লোক ইহার জলপান করিয়া পিপাসা শান্তি করে।*

আগামী বারে মোহন্তদের ও অস্থলের বর্ণনা করিয়া সন্দর্ভের উপসংহার করিব।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

প্রতিবাদ।

ষ্টারে চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিয়া অবধি আমাদের বাসনা ছিল, একবার বিচার করিয়া দেখিব, নাটকাকারে বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখরের গৌরব, মর্ম্ম, উদ্দেশ্য ও ভাব কত দূর রক্ষা করা হইয়াছে; একবার আলোচনা করিব, অন্তর্দর্শী নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসকারের গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করাইয়াছেন, ভাবসমূহ ভাষায় ও চিত্রগুলি চরিত্র দ্বারা কি ভাবে বুঝাইয়াছেন; অঙ্কে গর্ভাঙ্কে গ্রন্থের মর্ম্ম কতটা বিশ্লেষিত হইয়াছে।

"অনুশীলন"-নামক নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রে † "ষ্টারে চন্দ্রশেখর" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের বাসনা সিদ্ধির অনেকটা সুবিধা হইয়াছে দেখিলাম। পরন্তু লেখক আমাদের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব করিয়াছেন। আমরা যে ভাবে সমালোচনা করিব ভাবিয়াছিলাম, আপাততঃ সে ভাবে না করিয়া অনুশীলনের অনুশীলনে সাধ্যমত সাহায্য করিলে সে উদ্দেশ্য

* জমিদার বাবুদের সুদক্ষ অধ্যক্ষ বাবু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশের সাহায্য করিয়াছেন। এই ভ্রমণকালে আমাদের সহচর উত্তরকাল-প্রকাশিত বৎসম্পাদিত "পুরোহিত" পত্রের অধ্যক্ষ বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও কোন কোন সাহায্য করিয়াছেন।

† পত্রান্তরে প্রকাশের জন্য ইহা প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য এরূপ ভাষা। —তত্ত্বাবধায়ক।

কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইবে, আশা করি। তবে 'শ্রী—প'র মত বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকিয়া যে মতামত প্রকাশ করিতেন, সেই ধরণে, সেই ভাবে, সেইরূপে সমালোচনা করিব অর্থাৎ বঙ্গাকাশে দ্বিতীয় বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া উদিত হইবার উৎকট কল্পনা আমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের মস্তিষ্ক এখনও অবিকৃত আছে।

"চন্দ্রশেখর" বঙ্কিম বাবুর শ্রেষ্ঠ চিত্র, কল্পনার শ্রেষ্ঠ কুসুম বলিয়া 'শ্রী—প'র মনে হইলেও সকলের মতে তাহা নহে। তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে দোষ দিই না; কারণ "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। কাহারও মতে 'কপাল-কুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কাহারও মতে "বিষবৃক্ষ", কাহারও মতে "কৃষ্ণকান্তের উইল"। স্বয়ং বঙ্কিম বাবুর মতে "কৃষ্ণকান্তের উইল" তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। Idealistic কথার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ 'ভাবাত্মক' ইহা নূতন শুনিলাম। Idea অর্থে ভাব বটে, কিন্তু idealistic কথাটি Ideal (আদর্শ) শব্দ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং idealistic novel বলিতে আদর্শ চিত্রময় উপন্যাসই বুঝায়; অর্থাৎ যে উপন্যাসে প্রকৃতের সহিত অতিপ্রকৃত ঘটনা বা চিত্র মিশ্রিত।

লেখকের মতে চন্দ্রশেখরের প্রধান চিত্র শৈবলিনী, প্রতাপ ও চন্দ্রশেখর কিন্তু দলনীর চরিত্র চন্দ্রশেখর অপেক্ষা অধিক ফুটিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার ন্যায় কবিকে আমরা "ঘটনা প্রাচুর্য্যের সাহায্য লইতে, নায়ক নায়িকাকে নানাবিধ ঘটনা-মধ্যে আনয়ন" করিতে তো আমরা দেখি নাই। তিনি বঙ্কিম বাবুর যাবতীয় নারী-চরিত্রের মধ্যে "শৈবলিনী জীবনে কেবল তিন চারিটী ঘটনা দেখিয়াছেন," আমরা কিন্তু তিলোত্তমা, কপালকুণ্ডলা, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি চরিত্রেও তাহাই দেখিয়াছি। লেখকের পরামর্শে "ঘটনাপ্রাচুর্য্যের সাহায্য লইলে" বঙ্কিম বাবু বোধ হয়, বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার হইতে পারিতেন না। তার পর তিনি বলিয়াছেন, "শৈবলিনী যাহা কিছু করিয়াছিল, সবই তাহার মনেই ঘটিয়াছিল;" অর্থাৎ ফষ্টরের সহিত ভীমা পুষ্করিণীতে কথাবার্ত্তা, তাহার সহিত গৃহত্যাগ, সুন্দরীকে নৌকা হইতে ফিরাইয়া, দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি "সবই মনেই ঘটিয়াছিল", বাহ্য দৃশ্যে, কার্য্যে কিছুই ঘটে নাই। অতএব চন্দ্রশেখর-পাঠক এবং

অভিনয়-দর্শকগণ স্বয়ই দেখিয়াছেন, ইহাই এখন ধার্য্য হইল। সজ্ঞানে পুস্তক পড়িতে পড়িতে এবং চক্ষু চাহিয়া বিভোর হইয়া অভিনয় দেখিতে দেখিতে এমন স্বপ্ন দেখা যদি "চিত্রের নূতনত্ব, সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্ব" না হইবে, তবে আর কিসে হইবে।

'শ্রী—প'র ন্যায় আমাদেরও এককালে বিশ্বাস ছিল, "চন্দ্রশেখর" অভিনয় অসম্ভব। তাহার প্রধান কারণ, চন্দ্রশেখরের মেরুদণ্ড বঙ্কিম বাবুর স্বর্ণময়ী লেখনীর স্বর্ণরেখা "অগাধ জলে সাঁতার" অভিনয়ে প্রদর্শন অসম্ভব ছিল বলিয়া, নটকুলচূড়ামণি ৺ শরচ্চন্দ্র ঘোষ বোধ হয়, কেবল এই জন্যই রঙ্গভূমিতে চন্দ্রশেখর অভিনয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালীর ভাগ্যে বঙ্কিম বাবু যদি আর কিছু কাল জীবিত থাকিতেন, তবে তিনি, বোধ হয়, আমাদের সহিত এক বাক্যে বলিতেন, ষ্টার থিয়েটার কোম্পানি সে অসাধ্য সাধনা করিয়াছেন, অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে যাহা কল্পনায় আসে নাই, আজ তাহা বঙ্গের প্রত্যেক নর-নারীর প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এখন যিনি চন্দ্রশেখর অভিনয় দেখিতেছেন, তিনিই বিস্ময়ে অভিভূত, আনন্দে ও উল্লাসে অধীর হইতেছেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, অমৃত বাবুর দায়িত্ব-বোধ 'শ্রী—প' অপেক্ষা অনেকগুণ গুরুতর। ভগবৎকৃপায় অমৃত বাবু যে শক্তি লাভ করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর উপন্যাস খানিকে নাটকে পরিণত করিবার সময় তিনি পদে পদে তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা অঙ্কে গর্ভাঙ্কে পাইয়াছি। সুতরাং "সাহসের পরিচয়ের" স্থলে সুনিপুণ শিল্পীর পরিচয়ই আমরা জানাইতেছি, 'শ্রী—প' মহাশয়ের এত ঈর্ষা কিসে হইল, আমরা যে ভাবিয়া পাই না।

প্রত্যেক প্যারগ্রাফ ধরিয়া 'শ্রী—প'র অনুশীলনে সাহায্য করিতে গেলে আমাদের প্রবন্ধের আয়তন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তিনি এত দূর শাস্ত্রবিরহিত যে, তাহা না করিলেও তাঁহার জ্ঞানোন্মেষ হইবে না। তথাপি আমরা সাধ্যমত সংক্ষেপে সারিব।

অভিনয়-দর্শনের পর উপন্যাস খানি পাঠ করা আবশ্যক এ কথা বলাতে নিতান্ত সত্যের অপলাপ করা হইয়াছে। সমালোচনা কার্য্যটি অপক্ষপাতে,

প্রতিপদে ন্যায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়, এ কথাটি 'শ্রী—প' এবং তাঁহার মত সমালোচকগণ যেন বিস্মৃত না হন। (অভিনয় দেখার পর আমরা পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখিলাম, উপন্যাসে লিখিত ব্যক্তিগণের উক্তি সকল তো দূরের কথা, গ্রন্থকারের নিজোক্তি গুলি নাটকে যত দূর সম্ভব, অমৃত বাবু তত দূর প্রবেশ করাইয়াছেন। "ভাবময়" এবং সকলই মুখে পরিষ্কার রূপে ভাষায় এবং কার্য্যে প্রতিভাত হইয়াছে। গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিয়া নাটক করিতে, পুস্তকের মৌলিক ভাব যথাসম্ভব রক্ষা করিতে অধিকতর কৃতকার্য্য অল্প লোকেই হইয়াছেন।)

কেবল "কয়েকটী চিত্রের চিত্রনোদ্দেশ্যেই" কি বঙ্কিম বাবুর মত ক্ষণজন্মা পুরুষ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন? আমরা অত দূর ভূত ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ নহি। মোটামুটি তাঁহার উপন্যাস কয় খানি পড়িয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে, প্রণয়ের বিবিধ ও বিচিত্র চিত্রে মানব-হৃদয়ের গুহ্যতম, অন্তরতম প্রদেশের পরিস্ফুট, পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, সুন্দর, মুগ্ধকর, বিস্ময়-জনক, ভীতিজনক ছবিতে উপন্যাসগুলি পূর্ণ। 'শ্রী—প' ক্ষমা করিবেন, আমরা রমানন্দস্বামীর ভালবাসাকে এ প্রণয়ের স্তরে ফেলিতে পারিলাম না। রমানন্দস্বামীর সর্ব্বজীবে প্রীতিকেও আমরা "ভালবাসা" আখ্যাটিই দিতে অক্ষম

শ্রী—পর মতে ভীমা পুষ্করিণীর দৃশ্যে শৈবলিনীকে "সুন্দরী, কুলটা যুবতী একটা লম্পট গোরার সহিত গৃহত্যাগ করিতে অগ্রগামিণী বলিয়া মনে হয়; প্রকৃত শৈবলিনীর পরিচয় এখানে পাওয়া যাইবে না।" জিজ্ঞাসা করি, বঙ্কিমবাবু কি শৈবলিনীকে পরম লজ্জাশীলা, ধীর, শান্ত, নম্রপ্রকৃতি, পতিপ্রেমে তন্ময়া করিয়া গড়িয়াছেন, না একটা বিষম প্রগল্‌ভা, অতি দুঃসাহসিকা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা পতিবিরাগিণী রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন? দুর্গেশনন্দিনীর বেহায়া প্রগল্‌ভা বিমলা ও শৈবলিনীতে কত প্রভেদ? স্বয়ং বঙ্কিমবাবুতো লিখিয়াছেন "অশুভক্ষণে শৈবলিনী ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে"। "শৈবলিনী কলুষিতা আমারি এই লেখনী" "পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই নবাবের নিকট আসিয়াছিল" ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কষ্টরের সহিত কথোপকথনে এবং তাহার আসিবার কালে "এ কি জন্য আসে?

কি চায়" ইত্যাদি স্বগত উক্তিতে আমরা কুলটা যুবতীর লম্পট গোরার সহিত গৃহত্যাগে অগ্রগামিনী বলিয়া ত বুঝিলাম না, বরং তাহার বিপরীতই মনে হইল। বুঝিলাম, শৈবলিনী অসতী বটে, কিন্তু কুলটা বা ভ্রষ্টা নহে।

দ্বিতীয় চিত্রে নাটককার কি চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ দেখাইয়াছেন? ঠিক যেন ১৭। ১৮ বৎসরের বরটি এবং ৯।১০ বৎসরের কনেটি? জানিতে উৎসুক হইয়াছি " শ্রী—প' কোন্ 'নব্য বাবুকে' মোটা চাদর গায়ে সন্ন্যাসীর মত একবাশ চুল রাখিতে দেখিয়াছেন? চন্দ্রশেখরকে তো ঢিলে আস্তিন পাঞ্জাবী জামা বা কোট গায়ে, বুকে উড়ানি বাঁধা, বিলাতী জুতা পায়ে দেখিলাম না, শৈবলিনীর মন চন্দ্রশেখরে কেন আকৃষ্ট নয়, তাহা শৈবলিনীর বিদায়কালে স্বগত উক্তিতে এবং পরে চন্দ্রশেখরের মনোভাব-ব্যক্তিতে সুস্পষ্ট উপলব্ধ হয় নাই কি?

তৃতীয় দৃশ্যে কঠিন হইতেছে দলনীর গীত। সেই কঠিন গানটি অতি সহজে অতি সুন্দররূপে গীত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখর দেখিয়া সহস্র সহস্র লোক যে প্রতিবারে মুগ্ধ হইতেছেন, তাহার একটী কারণ দলনীর হৃদয়দ্রবকারী সঙ্গীত। কিন্তু অভিনেত্রীর সঙ্গীত যত মোহকর, অভিনয় তত নহে। তাহার ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি, দলনী-চরিত্রের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করে।

লেখকের জানা উচিত ছিল, উপন্যাসে যাহা থাকে, নাটকে তাহার কতকগুলি ডালপালা বাড়াইতে হয়, নহিলে নাটকই হয় না। চতুর্থ দৃশ্যটি সেই ডালপালার একটী। মূল উপন্যাসে ইহা না থাকিলেও ইহাতে অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছুই হয় নাই। বিষবৃক্ষে যাহার কমলমণি আছে, চন্দ্রশেখরে তাঁহার সুন্দরী থাকা বিচিত্র কি? বিশেষতঃ গ্রন্থকারের ভাব ও মর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া সুন্দরীর "রসিকতার ফুয়ারার" অবতারণা হইয়াছে। যে চতুরা অতিতীক্ষবুদ্ধিশালিনী সুন্দরী, নাপিতানী সাজিয়া সাহস করিয়া লরেন্স ফষ্টরের বজরায় যাইতে সক্ষম, যাহার ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণী, সাহেবের সঙ্গে নির্ভীকভাবে কথোপকথন করিতে এবং প্রতাপ-দর্শনের অন্যতর স্বাভাবিক বারাঙ্গনারমণীসুলভ উপায় অবলম্বন না করিয়া অসম্ভব, অস্বাভাবিক, উদ্ভট, বিজাতীয়, হীন উপায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিমোহাঙ্গিনী ঠাকু-

রাণীর পক্ষে স্বামীর বাড়ী ধরিয়া গান গাওয়া বিন্দুমাত্র অনুচিত ও অসঙ্গত হয় নাই।

(সম্পাদক মহাশয়ের টিপ্পনীতে দেখিলাম "ঘটনাকে সুরস করিবার জন্য পঞ্চম দৃশ্যের অবতারণা হইয়াছে।") সম্পাদক মহাশয়ের নাটক-চিত্রন জ্ঞানটি তো টন্‌টনে দেখিতেছি। (ফষ্টরের সহিত শৈবলিনীর গৃহত্যাগরূপ প্রধান ঘটনাটি দর্শকগণকে অবগত না করাইলে নাটকের যে বিশেষ অঙ্গহানি হইত, সম্পাদক মহাশয়ও কি সেটা প্রণিধান করেন নাই? তিনি কি বলিতে চান, দর্শকের সম্মুখে ডাকাত পড়া, বজরার ভাঙ্গিয়া জ্বালাইয়া দিলেই সুন্দর নাটকত্ব রক্ষিত হইত?)

"শ্রী—প' ২য় অঙ্কের ২য় গর্ভাঙ্কের অর্থাৎ গঙ্গাবক্ষে বজরার কামরায় অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তবু প্রাণ ধরিয়া সুখ্যাতি করিতে পারেন নাই। সুন্দরীর অভিনয় যে অতি সুন্দর, অতি স্বাভাবিক হইয়াছে, তাহা না বলিয়া কষ্টেসৃষ্টে, ঢোক গিলে' দায়ে পড়ে' "অভিনয় উত্তম" কথাটি মাত্র বলিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়াছেন।

তার পর চন্দ্রশেখর-অংশ-অভিনেতার প্রতি আক্রমণ বা ঝালঝাড়া। যিনি প্রায় কুড়ি বৎসর অসাধারণ সুখ্যাতির সহিত সাধারণ রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতেছেন, যাঁহার বঙ্গবিজেতার সতীশচন্দ্র, মেঘনাদবধের রাবণ, সীতার বনবাসের রাম, দক্ষযজ্ঞের মহাদেব, বুদ্ধদেবের বুদ্ধ, চণ্ডের চণ্ড, সরলার বিধুভূষণ, বিজয়বসন্তের বলবন্ত, তরুবালার অখিলচন্দ্র প্রভৃতি কত নায়ক উপনায়কের অংশাভিনয় প্রত্যেক বাঙ্গালীর হৃদয়পটে চিরতরে মুদ্রিত থাকিবে, যিনি এখন বাঙ্গালীর মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, তিনি "চন্দ্রশেখর-চরিত্র একবিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই" একথা পাগলে ভিন্ন আর কে বলিবে!

'শ্রী—প' একটা কথা বলিয়াছেন, "মূল পুস্তকের এই অংশ পাঠ করিলে যে ভাবের উদয় হয়, অভিনয়-দর্শনে, তাহার কিছুই হয় না। চন্দ্রশেখর নবাবের নিকট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় শৈবলিনীর জন্য নিদারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিলেন, শৈবলিনীর প্রতি তাঁহার প্রাণভরা অতুলনীয়, বর্ণনার প্রেমের যে অভিব্যক্তি—এবং যে মর্ম্মস্পর্শী কথাগুলিতে এক জন

শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অগাধ, অতিলস্পর্শ প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহারই কথা বোধ হয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বুঝা উচিৎ ছিল "বাটীর প্রাঙ্গন" গর্ভাঙ্কে সেই জানালা দরজা ভাঙ্গা ও দগ্ধ দৃশ্যের সম্মুখে সে সব কথা আসিতেই পারে না। নাটককার তাহা করিলে নিতান্ত অনুপযোগী ও অস্বাভাবিকই হইত। কিন্তু তিনি যদি একটি গর্ভাঙ্ক বাড়াইতেন, অর্থাৎ 'বাটীর প্রাঙ্গন' দৃশ্যের পূর্ব্বেই একটী 'পথের দৃশ্য' করিতেন, তাহা হইলে চন্দ্রশেখর-চরিত্র কি, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইত, পরের কোন গর্ভাঙ্কে এই পরিচয়টি দেওয়ার সম্পূর্ণ সুবিধা হয় নাই। বলিতে পারি না, ইহাতে নাট্যাংশে কোন ক্ষতি হইত কি না, আমাদের অপেক্ষা সে বিষয়ে অমৃত বাবু সহস্রগুণে অভিজ্ঞ।

(যেমন ফষ্টরের বজরার দৃশ্য তেমনই গুরগন্ খাঁর কক্ষের দৃশ্য)। আহা কি সুন্দর, কি মহান্, কি স্বাভাবিক, কি মর্ম্মস্পর্শী চিত্র! (অভিনয়ও ঠিক্ দৃশ্যানুযায়ী। যেমন দলনীর, তেমনই গুরগণের।) গুরগণ খাঁর অংশ অভিনেতা মর্ম্মে মর্ম্মে, হৃদয়ের পরতে পরতে গুরগণ-চরিত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। অভিনেত্রীও এই দৃশ্যে দলনী-চরিত্রের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। (কিন্তু বোদ্ধা 'শ্রী—প' বলিতেছেন "উপন্যাস পাঠ না থাকিলে কাহার সাধ্য, এই সকল কথা বুঝিয়া উঠে।" দর্শকবৃন্দ এই দৃশ্যের অভিনয় দেখিতে দেখিতে স্তম্ভিত ও আনন্দে উদ্বেলিত-হৃদয় হইয়াছিলেন। উপন্যাসের একটি বর্ণও নাটককার এ দৃশ্যে বাদ দেন নাই।) কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, যে 'শ্রী—প' চন্দ্রশেখর অভিনয় সমালোচনারূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহারই পক্ষে উপন্যাস পাঠ ব্যতীত এ অংশ বুঝিয়া উঠা সাধ্যাতীত হইল, এইখানেই তাঁহার অভিনয়-সমালোচনায় ব্যুৎপত্তি এবং অনুশীলনের প্রতিপত্তির পরিচয় পর্য্যাপ্ত পাওয়া গেল।

প্রতাপ কি, তাঁহার পরিচয় আমরা ১ম অঙ্কের ৪র্থ গর্ভাঙ্কে, ২য় অঙ্কের ৫ম গর্ভাঙ্কে, ৩য় অঙ্কের ২য় ও ৭ম গর্ভাঙ্কে এবং শেষ অঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে যথেষ্ট পাইয়াছি। শারীরিক বল অপেক্ষা নৈতিক বল যে সহস্র গুণ কঠিন এবং এক জন যোদ্ধা বা মহাবীর অপেক্ষা জিতেন্দ্রিয়, সংসারবিজয়ী ব্যক্তি যে লক্ষগুণে প্রশংসনীয় ও পূজনীয় এ কথা কি লেখক অস্বীকার করিবেন?

বীরপুরুষের সম্মান অধিক, না মহাপুরুষের সম্মান অধিক? বঙ্কিম বাবুরও উদ্দেশ্য, প্রতাপের নৈতিক বীরত্ব, পাঠক-সমক্ষে উজ্জ্বলতর বর্ণে প্রতিফলিত করা। চন্দ্রশেখর গ্রন্থের এত গৌরব, এত গাম্ভীর্য্য, এত মহত্ব এবং এত সৌন্দর্য্য, প্রতাপের এই নৈতিক বীরত্বের জন্য। চন্দ্রশেখরের ইহাই মূল নীতি। প্রতাপের শারীরিক বীরত্ব-প্রদর্শন চন্দ্রশেখরের একটি প্রধান অঙ্গও নহে। দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহ হইতে সে বীরত্ব দেখা আমাদের সুরু হইয়াছে।

পণ্ডিতপ্রবর 'শ্রী—প' আবার বলিতেছেন, "নাটককার প্রতাপ-চরিত্র ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিলে তিনি গ্রন্থকারের কথা প্রতাপের মুখে প্রকাশ করিতেন না।" এক্ষণে পুস্তকের সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিয়া "শ্রী—প"র চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতে হইতেছে যে, কথাগুলি প্রতাপের মনোভাব বা স্বগত উক্তি, গ্রন্থকারের নহে। "প্রতাপ জ্বালিত প্রদীপালোকে দেখিলেন, (গ্রন্থকার দেখেন নাই) যে শ্বেত শয্যার উপর কে নির্ম্মল, প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢালিয়া রাখিয়াছে, যেন বর্ষাকালে গঙ্গার স্থির শ্বেতবারি-বিস্তারের উপর কে প্রফুল্ল শ্বেত পদ্মরাশি ভাসাইয়া দিয়াছে। "মনোমোহিনী স্থির শোভা দেখিয়া প্রতাপ চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না" বলিয়াই গ্রন্থকার পরে বলিতেছেন, "সৌন্দর্য্যমুগ্ধ হইয়া বা ইন্দ্রিয়-বশ্যতা-প্রযুক্ত যে তাঁহার চক্ষু ফিরিল না, এমত নহে" ইত্যাদি। 'শ্রী—প' গ্রন্থের ঐ অংশের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি একটি কথা স্মরণ রাখিবেন, কার্য্যে এবং কথায় মনোভাব, অবস্থা, চরিত্রাদি প্রকটিত করাই নাটকের ধর্ম্ম।

পণ্ডিতপ্রবরের দ্বিতীয় মত "অভিনেতা প্রতাপ-চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই, সে জন্য অভিনয়ও ভাল হয় নাই।" শ্রী—পর প্রবন্ধপাঠে আমরা তিনটি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলাম। ১ম, নাটককার চন্দ্রশেখর বুঝিতে পারেন নাই, ২য়, মিত্রজ অমৃত বাবু চন্দ্রশেখর-চরিত্র এবং ৩য়, অক্ষয় বাবু প্রতাপ-চরিত্র বুঝিতে পারেন নাই। এমন অমূল্য জ্ঞান আর কোথায় পাইব? কিন্তু শ্রী—প ব্যতীত যিনি প্রতাপের অভিনয় দেখিয়াছেন, তিনিই প্রীত, উল্লসিত ও বিমোহিত হইয়াছেন। অগাধ-জলে সাঁতারের অভিনয় কি স্বাভাবিক,

কি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তাহা কি তিনি নিদারুণ গাঁয়ের জ্বালায় সবই ভুলিয়া গেলেন? পাঠকগণ শ্রী—পর সূক্ষ্মদর্শিতা ও সূক্ষ্মজ্ঞানের আর একটী সুন্দর নিদর্শন পাইবেন, তাঁহার "অতি হৃদয়-মনঃ-প্রাণ-স্পর্শী কথাটিতে"।

(পর দৃশ্যে প্রতাপের গৃহে আমরা সাহেবদিগকে দেশলাই জ্বালাইয়া বাতি জ্বালিতে দেখি নাই, তাঁহাদের সঙ্গেই আলোক ছিল। আর পিস্তলটীও, ছেলেদের খেলিবার পিস্তল নহে—একটী রিভলবার। শ্রী—প, কি তাহার স্থলে একটী কামান দাগিতে বলেন?)

চন্দ্রশেখরের ৬ষ্ঠ খণ্ডের ১ম পরিচ্ছেদটি শ্রী—প, অনুগ্রহ পূর্ব্বক খুলিয়া পড়িবেন, রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের 'দীর্ঘ বক্তৃতা' আছে কিনা, প্রবন্ধ লিখিবার আগে কি পুস্তক খানি খোলা উচিত ছিল না?

শৈবলিনী, প্রতাপকে কিরূপে উদ্ধার করিলেন, তাহা আমরা ৩য় অঙ্কের ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম গর্ভাঙ্কে সবিশেষ জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু শ্রী—প, তাহা দেখিতে পান নাই। সেই যে শৈবলিনী "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে, আমার জাত গেল—মা গঙ্গা ধরিও" বলিয়া গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, সেই কয়টী কথা লইয়া একটা গর্ভাঙ্ক তৈয়ার হয় নাই বলিয়া শ্রী—পর ভারি ক্ষোভ হইয়াছে। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে নিশ্চয় অমৃত বাবুকে এজন্য ছয় মাস ফাঁসি দিতেন। গ্রন্থকার জীবিত থাকিলে শ্রী—পর কি দণ্ডবিধান করিতেন, সেইটিই কিন্তু এখন আমাদের আলোচ্য।

"তৎপরবর্ত্তী তিনটি দৃশ্য উপন্যাস পাঠ না থাকিলে বোঝা দুষ্কর" অথচ "এ সকল দৃশ্য আরও সংক্ষিপ্ত হইলে ভাল হইত।" ("গিরিগুহায় শৈবলিনীর দৃশ্য বোঝাই কঠিন, অভিনয় তো দূরের কথা" অথচ "অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীকে প্রশংসা করি।" বাঃ! সুন্দর সমালোচনা!)

শ্রী—পর অনুমতি যে দুই চিত্রে শৈবলিনীর জীবন ও দলনীর পতিপ্রেমে তন্ময়তা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই দুইটি দৃশ্য সংক্ষেপে সারিলে ভাল হইত। তাহা হইলেই সকলে পুস্তক পাঠ না করিয়াই সম্পূর্ণরূপে চন্দ্রশেখর অভিনয় বুঝিতে পারিতেন। অহো! কি সমীচীন সমালোচক! কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি!

তার পর তোপ ও রণ-বাদ্যের কথা। (শ্রী—পর অভিপ্রায় বড় বড় পটকার আওয়াজ না করিয়া গোটা-কতক বোমা আনিয়া তাঁহারি সম্মুখে

ছাড়িয়া দেওয়া। আসল যুদ্ধ চাই; সৈন্যটি যদি না তোপের চোটে উড়ে যাবে, তবে আর যুদ্ধ হইল কি?

যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যের পূর্ণতা ও মনোহারিত্বের কথা বলিতে হইবে না। কিন্তু প্রতাপের মর্ম্মভেদী বাক্যগুলি না শুনিয়া দর্শকগণ চলিয়া যাওয়ার ঘটনাতে শ্রী—প সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অমৃতবাবু নাটকে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। পাঁচ ঘণ্টা কাল অনেক মর্ম্মভেদী ঘটনা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া লোকে আর সহ্য করিতে পারে না বলিয়াই যে উঠিয়া পড়ে, কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষ কথাগুলি শুনিয়া লইতেও কেহই কসুর করেন না, এ কথাটাও শ্রী—প গোপন করিলেন কেন? শুধু চন্দ্রশেখর নাটকসম্বন্ধে নহে, সর্ব্বত্র সকল নাটকে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। শেষ দৃশ্যে লোকে বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। তা' ছাড়া প্রতাপ ও রমানন্দ স্বামীর কথাগুলি প্রায় সবই তো গ্রন্থকারের, তবে আর সাফল্য অসাফল্যের কথা আসিল কেন?

আমরা এই অনুচিত নিন্দাবাদ-পূর্ণ সুদীর্ঘ অসার প্রবন্ধের সুদীর্ঘ প্রতিবাদ সাঙ্গ করিলাম। ক্ষোভে, রোষে, দুঃখে শ্রী—প উৎকৃষ্ট অভিনয়গুলির উল্লেখই করেন নাই। আমরা উপসংহারে দু চারিটি কথায় তাহা সারিতেছি। চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, গুরগণ খাঁ, সুন্দরী ও দলনীর অভিনয়ের কথা অমরা যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। শৈবলিনী-অভিনয়ে গ্রন্থকারের ভাব প্রায় আগাগোড়াই রক্ষিত হইয়াছে। নবাবের অভিনয় বেশ স্বাভাবিক হইয়াছিল। ৫ম অঙ্কের ৩য় গর্ভাঙ্কের সংসারের বিশ্বাসঘাতকতার এমন সুন্দর ছবি সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। গন্ধগোকুল বিশ্বাস, নাটককারের নূতন ও সুন্দর সৃষ্টি। অমৃতবাবুর কল্পনা-কুসুম, অভিনেতা বেশ প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। ফষ্টরের অভিনয়ে কৃত্রিমতা কিছুই নাই; ঠিক সাহেবের মতই কথাবার্ত্তা, হাব-ভাব। নবাবের শিবিরের শেষ দৃশ্যটিতে অভিনয় বিলক্ষণ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। রামচরণ, বকাউল্লা প্রভৃতির অভিনয় বেশ প্রীতিপ্রদ ও রহস্যজনক হইয়াছিল। রমানন্দ স্বামীর চরিত্রে বৈচিত্র্য, কিছু না থাকিলেও ইহার উন্নতি প্রার্থনীয়। পরিশেষে বক্তব্য শ্রী—প প্রভৃতি যতই দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া চন্দ্রশেখর নাটকের নিন্দাবাদ করুন, যতই তাঁহারা মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসুন, চন্দ্রশেখর

যে সর্ব্বসাধারণের অতি আদরের, অতি প্রিয় জিনিষ হইয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু "সরলা" লিখিয়া যে বিপুল যশঃলাভ করিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখরে যে তদপেক্ষা অনেক বেশী যশঃ অর্জ্জন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত।

সমালোচনের অনুশীলন *।

"হাঁরে চন্দ্রশেখর" শীর্ষক সুবিস্তৃত প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পূর্ব্বে প্রবন্ধ-লেখকের নামাদি অবগত হইবার নিমিত্ত স্বতঃই একটা স্পৃহা জন্মে। কিন্তু, পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে যে, লেখক স্বকীয় কোনও গুপ্ত কারণ বশতঃ আত্মগোপন করিয়াছেন, বা আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে ক্ষেত্রে কাহারও নিন্দাবাদ করিতে হইবে, কিংবা কাহারও বিরুদ্ধে কোনও অপ্রীতিকর বাক্য ব্যবহার করিতে হইবে, সে স্থলে স্ব-স্বরূপ লুকায়িত করা কত দূর ন্যায়ানুমোদিত, তাহা পাঠকবর্গই মীমাংসা করিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় মেঘনাদের ন্যায় মেঘের পার্শ্বে লুকায়িত থাকিয়া, বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া প্রশংসাবাদ লাভ করার চেষ্টা না করিয়া, সাহসিকতার সহিত সম্মুখ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই অধিক বীরত্বের পরিচায়ক। অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তির সহিত অত্যধিক বন্ধুতা বা অত্যধিক শত্রুতা করা কর্ত্তব্য নহে, শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণ এই অমোঘ উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি শেষোক্ত বিষয় অপেক্ষা প্রথমোক্ত বিষয়েরই অধিকতর পক্ষপাতী। তাহা হইলেও শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ-পালনে আজন্ম অভ্যস্ত থাকা প্রযুক্ত, আমি পূর্ব্ব পক্ষ অবলম্বন করিতে কতক কুণ্ঠিত হইতেছি।

"প্রতিবাদ" বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি, সুতরাং নান্দী তাদৃশী শুভ নহে। ইহাতে অনেকে ইহার ফলসম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন, এবং হওয়াও কিছু

---

* অনুশীলন, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যায়, "হাঁরে চন্দ্রশেখর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

অসঙ্গত নহে। কিন্তু মহানুভব পাঠকমাত্রেই স্মরণ রাখিবেন যে, মদীয় এই হংসপুচ্ছ কোনও অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া, অনাবশ্যক অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হয় নাই; তাহার কারণ এই যে, প্রতিবাদ করিবার আমার ক্ষমতা নাই, ক্ষমতার অনুযায়ী সাহস নাই, সাহসের অনুরূপ বিদ্যা নাই, বিদ্যার অনুরূপ জ্ঞানও নাই। তবে চলচ্ছক্তিহীন এই ক্ষুদ্র লেখনী হইতে অকস্মাৎ কি বহির্গত হইতে পারে, তাহা কে জানে? কিন্তু যদি গুটিকতক "কতিপয়" শব্দ প্রয়োগ করিয়া প্রবন্ধটিকে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পাঠযোগ্য, চিন্তাশীলের কল্পনাযোগ্য, সৎসমালোচকবর্গের দর্শনযোগ্য করিয়া গঠন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু এই মরীচিকাময়ী আশাপথের একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে। শত্রু যদি নূতন হয়, তাহা হইলে তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কতকটা সাহস হইতে পারে. কিন্তু যদি সে ব্যক্তি, শত শত পরাক্রান্ত বীরগণকে হতবল করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্মুখীন হইতে কিঞ্চিৎ ভীত হইতে হয়, তাহার উপর যদি সে শত্রু গুপ্তভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ভয়ের আর অবধি থাকে না। কারণ, যুদ্ধে জয়লাভ করার কথা দূরে থাকুক, কখন 'অতর্কিত-রূপে' পশ্চাদ্ভাগ হইতে তীক্ষ্ণ শর আসিয়া প্রাণ বধ করিতে পারে, তাহা কে বলিতে পারে?

সমালোচক যখন আত্মগোপন করিয়াছেন, তাই নিশ্চিন্ত বাধ্য হইয়াই হউক বা অন্য কারণ বশতঃই হউক, যুদ্ধক্ষেত্রের সনাতন নিয়মানুযায়ী আমাকেও বাধ্য হইয়া আত্মগোপন করিতে হইল। আশা করি, আমার কার্য্য তাদৃশ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের মধ্যে রচনাপারিপাট্যসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রমাদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। তাহা না হইলেও স্থলে স্থলে লেখক মহাশয় ভাবের এরূপ জটিলতা সম্পাদন করিয়াছেন যে, তাহা সহজেই বোধগম্য হওয়া দুরূহ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, তিনি চন্দ্রশেখর—অবশ্য বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, এবং সেক্ষপীরের ম্যাকবেথ নাটকে তুলনায় সমালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, প্রথমোক্ত উপন্যাস খানি শেষোক্ত নাটক খানির ন্যায় মানসিক

ভাবসমূহে অত্যধিক পরিব্যাপ্ত ; সুতরাং ঘটনাপ্রাচুর্য্য নাই বলিয়া তাহা পূর্ণ সাফল্যের সহিত রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু নাটক ম্যাকবেথের সহিত উপন্যাস চন্দ্রশেখরের অভিনয়-প্রদর্শনের তুলনা করিতে গিয়া, "প" বাবু সমীচীনতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই। ম্যাকবেথ সেক্সপীয়রের অমৃতময়ী লেখনী-প্রসূত একটি অত্যুজ্জল রত্নবিশেষ। মানসিক ভাবের বিভিন্ন পরাকাষ্ঠা, সাংসারিক আবর্ত্তে পতিত হইয়া কি প্রকার ফেন-পুঞ্জাকার ধারণ করিতে পারে, এবং অবস্থাচক্রনেমীতে সংশ্লিষ্ট হইয়া ইহা কখন কি প্রকারে উৎক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, সেক্সপীর ম্যাক-বেথ নাটকে তাহা পূর্ণ সামঞ্জস্যের সহিত প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাহা অভিনয়োপযোগীও করিয়া চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। স্বীকার করি, ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথের অংশ, সহজেই রঙ্গমঞ্চে উত্তমরূপে প্রদর্শিত হওয়া অসম্ভব। প্রাচীন, সুশিক্ষিত, অভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্ অভিনেতৃ-ভিন্ন উক্ত অংশদ্বয় অপরের গ্রহণ করা বিড়ম্বনা-মাত্র এবং যদি কেহ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি অকৃতকার্য্য হইবেন। ইহার এই অকৃতকার্য্য-তার হেতু কি স্বয়ং কবি সেক্সপীর? কখনই নহে। ম্যাকবেথে ঘটনা-প্রাচুর্য্য নাই সত্য, কিন্তু সেই সমস্ত মানসিক ভাবগুলিকে নাট্যকার, এরূপ ক্রম-বানিষ্ঠতার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা উৎকৃষ্ট অভি-নেতৃবর্গের হস্তে পতিত হইলে তাহার অক্ষনানুযায়ী প্রদর্শিত হইলেও হইতে পারে। অপর পক্ষে চন্দ্রশেখর এক খানি ভাবপ্রধান উপন্যাস ; রঙ্গমঞ্চে ইহার অভিনয় প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে ইহাকে সম্যক্‌রূপে নাট্যাকারে পরিণত করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, অভিনয়কালে দর্শকবর্গকে ইহার কয়েক-খানি দৃশ্য প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যে গুলির অভাবে "চন্দ্রশেখরের" প্রকৃত সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যে সেই "অগাধ জলে সাঁতারই" সর্ব্বপ্রধান এবং মনোহর ; অমৃত বাবুও এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন দেশীয় রঙ্গমঞ্চই ইতিপূর্ব্বে এ প্রকার বিস্ময়ো-দ্দীপক দৃশ্য প্রদর্শিত করিতে পারে নাই, বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হইবে না।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কোন্ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া লেখক, নাটক ম্যাকবেথের অভিনয়ের সহিত উপন্যাস চন্দ্রশেখরের অভিনয়ের তুলনা করি-

লেন ? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ম্যাকবেথ নাটক-খানি রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত করিতে হইলে সুদক্ষ অভিনেতৃবর্গের প্রয়োজন ; কিন্তু চন্দ্রশেখরের অভিনয় প্রদর্শন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম সুশিক্ষিত নাট্যকারের প্রয়োজন। আরি একটি কথা, লেখক মহাশয় কোন্ অভিজ্ঞতা হইতে অবগত হইয়াছেন যে, ম্যাকবেথ কখনও সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত অভিনীত হয় নাই ? ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদের এতদ্দেশীয় অভিনয় দর্শন করিয়া যদি তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু তিনি স্মরণ রাখিবেন, বিলাতের অনেক রঙ্গমঞ্চেই ইহা অদ্ভুত সাফল্যের সহিত বহু বার অভিনীত হইয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ গ্যারিক এই ম্যাকবেথ অভিনয় করিয়াই জগদ্ব্যাপিনী খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তবে যদি লেখক "পূর্ণ সাফল্যে" অর্থে আদর্শ অভিনয় কল্পনা করেন, তাহা হইলে সে বিভিন্ন কথা। কিন্তু মানবের ক্ষুদ্র ক্ষমতার যাহা সাধ্যায়ত্ত, তাহার পূর্ণ পরিণামের সহিত ইহা প্রদর্শিত হইয়া গিয়াছে, ইহার প্রমাণ কতিপয় ইংরাজি নাট্যশালার ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তাহার পর "চন্দ্রশেখরের" লোকপ্রিয়তার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লেখক যে অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য ও দৃঢ়বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চপলতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মতে নাট্যাকারে পরিণত চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে আদৌ মনোহারিত্ব নাই; তবে লোকে যে এত প্রশংসা করিতেছে, তাহার কারণ এই যে "জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত নদীবক্ষে নায়ক-নায়িকার সন্তরণ" দৃশ্যটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং হর্ষশোক-ভাবোদ্দীপক। "তাহার মত" বলিলাম বটে, কিন্তু তিনি যদি ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করিয়াই নিরস্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আপত্তির কোনও কারণই ছিল না। যেহেতু প্রবাদই আছে—"ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ।" কিন্তু যখন তিনি সাহসিকতার সহিত স্বয়ং সকলের মত ব্যক্ত করিতেছেন, এই বলিয়া গৌরব করেন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যদি একটা মহাভ্রমে পতিত হন, তাহা হইলে আমি "সাধারণের মধ্যে একজন বলিয়া, তাঁহার প্রমাদ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি।

লেখক মহাশয় কি প্রকারে যে এই মহাকারণটী নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন, তাহা কল্পনা দ্বারাও স্থির করা অসম্ভব। তথাপি নিতান্ত অপরিণত কল্পনাকে বারংবার বেত্রাঘাতে আহত করিয়া, দুইটিমাত্র বিষয় চিন্তা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হয় তো লেখক মহাশয় ত্রিকালজ্ঞ ও অন্তর্যামী। তিনি হয় তো কোনও সুগুপ্ত যোগবলে দর্শকমাত্রেরই মানসিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বা তাঁহার নিযুক্ত কোনও লোক চন্দ্রশেখরের প্রত্যেক অভিনয়-রজনীতে রঙ্গশালার সম্মুখে গমন করিয়া প্রত্যেক দর্শককেই তাঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই দুইটী কারণ যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত, এ কথা আমরা বলিতে চাহি না। কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ইহারা আমাদিগের জীর্ণ কল্পনা বৃক্ষের দুইটী অপরিপক্ক ফল-মাত্র—সুতরাং ইহা প্রমাদপূর্ণ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলির সমষ্টি করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই দুইটি কারণের মধ্যে একটি কারণ ব্যতিরেকে লেখকের মতের ন্যায় এরূপ একটী স্থির সিদ্ধান্তে অত্যল্প কালের মধ্যে উপনীত হওয়া নর-মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কল্পনার কথা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করি যে, প্রতি রাত্রিতে রঙ্গশালায় ন্যূনাধিক ১৫০০শত ভদ্রমহোদয় সমবেত হইয়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কাল উপবিষ্ট থাকিয়া কেবল দুই খানি দৃশ্য দর্শন করিয়াই কি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করেন? পাঁচ ঘণ্টা কালব্যাপী সুদীর্ঘ অভিনয়ের মধ্যে কি এমন কোনও আকর্ষক বিষয় নাই, যাহা দ্বারা চন্দ্রশেখর অভিনয়ের এত উচ্চ প্রশংসাবাদ, এত সর্ব্বজন-মুখরিত হর্ষধ্বনি! তবে যদি তিনি কোনও স্বদেশহিতৈষী সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের অপ্রকাশিতনামা ত্রিবর্ণধারী পত্রলেখক মহাশয়ের ন্যায় সমাগত ভদ্রদর্শকবৃন্দকে অভদ্র ও অশিক্ষিত কুরুচি সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যাত করেন এবং সেই আখ্যাবশতঃ তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ গুলিকে বর্ব্বরের চীৎকারধ্বনি বলিতে চাহেন, তাহা হইলে সে বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত তর্ক করিতে অনিচ্ছুক। অবশ্য স্বীকার করি, হয় তো লেখক মহাশয়ের নিকট বা তাঁহার কতিপয় বন্ধুর নিকট চন্দ্রশেখরের সমুদয় অভিনয়ের মধ্যে কেবল দুই খানি দৃশ্য দ্রষ্টব্য বলিয়া বিবেচিত

হইলেও হইতে পারে; কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত মত হইতে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সাধারণের মুখপত্র হইয়া তাহাই প্রকাশিত করা যে, আদৌ ন্যায়শাস্ত্রানুযায়ী নহে, তাহা বিবেচনা করা উচিত ছিল!

তাহার পর লেখক মহাশয় একটু বিষয় ব্যক্ত করিয়া আমাদিগকে মহাশায় আশান্বিত করিয়াছেন। প্রাচীন কবিকুল বলিয়া গিয়াছেন যে আশা মরীচিকাময়ী, কিন্তু লেখক যে প্রকার দৃঢ়তার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা আশা না করিয়া বরং একেবারেই দৃঢ়বিশ্বাস করিলেও নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিব না। তিনি বলিতেছেন, গ্রন্থকার (বঙ্কিম বাবু) জীবিত থাকিয়া এ অভিনয় দেখিলে যে মতামত প্রকাশ করিতেন, তিনি যে যে স্থলের প্রশংসা করিতেন এবং যে যে ত্রুটীর উল্লেখ করিতেন, তেমন না হউক আমরা সেই ধরণের সেই ভাবে সেই রূপে এই নূতন নাটকের সমালোচনা করিব।"

যদি কোনও দেশে সৌভাগ্যবশতঃ কোনও মহাপুরুষ অবতীর্ণ হ'ন এবং জীবিত কালে স্বদেশ মধ্যে এবং বিদেশেও অতুলনীয় খ্যাতিলাভ করেন কিন্তু তাঁহাদিগের অবসানের পর ঠিক তাহাদিগের স্থান কাহারও দ্বারা পূর্ণ হয় না; বহুকাল হইল পিট্ ও বার্ক চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, তাহার পর কত শত সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতি-বেত্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহারা যে কার্য্য করিয়া অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন সে কার্য্য আর কে করিতে পারিয়াছেন? করাও অসম্ভব! কিন্তু শুভদৈববলে দুর্ভাগিনী বঙ্গভাষা-সম্বন্ধে সে কথা বলা যাইতে পারে না। বঙ্কিম বাবু আমাদিগের মধ্য হইতে চির কালের নিমিত্ত অপসৃত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শূন্য সাহিত্য-সিংহাসন অধিকার করিবার এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি প্রকাশমান হইয়াছেন। বয়সে কিঞ্চিৎ নবীন বলিয়াই হউক, বা অন্য কোনও কারণ বশতঃই হউক, তিনি এখন ঠিক বঙ্কিম বাবুর ন্যায় কার্য্য করিতে অসমর্থ হইলেও, সেই ভাবে সেই রূপে সেই ধরণে কার্য্য করিতে সম্যক্ পারদর্শী। আমাদিগের দৃঢ় প্রতীতি যে বয়োবৃদ্ধির সহিত মতের পরিপক্কতাও সাধিত হইতে পারে; সুতরাং এক্ষণে

যাহা কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণ আছে, পরিশেষে তাহা পূর্ণ সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে—তাহা সুপরিণত "সমালোচক বঙ্কিম চন্দ্রে" বিকশিত হইতে পারে, কে হেন উদীয়মান সমালোচক? তিনি কে, যাহার যশঃসৌরভ আজ দিগন্ত বিস্তারিত হইয়া সমগ্র জগৎবাসীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করিবার সমুপযুক্ত? তিনি কে যিনি তমসাবৃত বঙ্গসাহিত্য-গগণে ধ্রুবতারারূপে উদিত হইয়া বীচিবিক্ষোভিত অনন্ত মহাসমুদ্রে ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত পথভ্রষ্ট ক্ষুদ্রবঙ্গ-লেখক গুলিকে দিঙ্ নির্ণয় করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন? হায়, তিনি অজ্ঞাত ও অদৃশ্য!

লেখক মহাশয় নাট্যাকারে পরিণত চন্দ্রশেখরের মধ্যে একটী প্রধান দোষ দেখিতে পাইয়াছেন এই যে, যাহারা উপন্যাস পাঠ করে নাই, তাহাদিগের পক্ষে ইহা সম্যক্ রূপে বোধগম্য হইবে না। নাট্যকার কোন্ কোন্ স্থলে যে এই প্রকার প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, লেখক বিশেষ রূপে তাহার উল্লেখ করেন নাই। দু এক স্থলে যাহা বা সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রান্ত—পরে তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা যাইবে; এবং যে যে স্থানে লেখকের মত প্রমাদপূর্ণ, সেই স্থলে কি হয় নাই, এবং কি বা হওয়া উচিত ছিল, যদি তিনি সেগুলি সুস্পষ্ট রূপে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে পাঠক বর্গের ক্ষোভের কোনও কারণই থাকিত না। কোনও এক খানি অঙ্কিত চিত্র দর্শন করিয়া অনেকেই বলিতে পারেন যে "এ স্থল ভাল হয় নাই, ও স্থলটি নিতান্ত অপ্রাকৃতিক হইয়াছে" ইত্যাদি, কিন্তু সে স্থলে কি হওয়া উচিত, তাহা নির্দ্দেশ করা প্রায় অধিকাংশ লোকেরই ক্ষমতাতীত। সুতরাং সে প্রকার সমালোচকবর্গের মত গ্রহণ করিয়া চিত্রকরের কোনও উপকারই হয় না, বরং অপকারেরই সম্ভাবনা অধিক।

যাহা হউক, যদি কেবল তর্কের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে, অমৃত বাবু নাট্যাকারে পরিবর্ত্তন কালীন স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু উপন্যাস খানির ভাব-প্রধানতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার প্রতি আদৌ দোষ প্রদান করা যায় না,—লেখক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন যে, চন্দ্রশেখরের মধ্যে ভাবের জটিলতা এত অধিক যে তাহা সহজেই প্রকাশিত করা একপ্রকার অসম্ভব। আর একটি

কথা, যদি উপন্যাসকার গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি ভাব অপ্রকাশিত রাখেন, পাঠক নিজকল্পনাবলে সেই অসম্পূর্ণতাটিকে পরিপূর্ণ করিয়া লইলেও লইতে পারেন—এবং প্রায় সকল স্থানেই এই প্রকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু নাটকে যে দর্শকগণ উপন্যাসের ন্যায় কল্পনা প্রয়োগ করিবেন, এ প্রকার আশা করা অন্যায়। আমাদিগের নিতান্ত অবসর কালে চেয়ারে ঠেস দিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে করিয়া, নিতান্ত সদয়ভাবে উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া থাকি; চিন্তাদেবী ধীরে ধীরে একদৃশ্যের পর আর এক দৃশ্যে প্রসারিত হইতে থাকে, সুতরাং নায়ক নায়িকা বা অন্য কোনও চরিত্রের মধ্যে যদি কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে, আমরা তাহা সচ্ছন্দচিত্তে পূরণ করিয়া লই। দেবীচৌধুরাণীর প্রফুল্ল যখন শ্বশুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাহিরে আসিয়া মার সহিত মিলিত হইল, তখন তাঁহার মা কেবল কাঁদিতেছিল, বঙ্কিম বাবু এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। মা কেন কাঁদিতেছিল, কি ভাবে কাঁদিতেছিল, বঙ্কিমবাবু তাহার কোনও কারণই প্রদর্শন করেন নাই—কেবল লিখিয়া গিয়াছেন কাঁদিতেছিল; কিন্তু এই নবীন ক্রন্দনের কারণ ও অর্থ কি পাঠকের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল? বঙ্কিম বাবুর সমুদয় উপন্যাসই এই প্রকার অপ্রকাশিত ভাবে পরিব্যাপ্ত; কিন্তু সেগুলিকে কল্পনাবলে প্রতিফলিত করিয়া লইতে পাঠকের আদৌ ক্লেশ হয় না।

কিন্তু নাটকে—বিশেষতঃ তাহার অভিনয়ে, দর্শকগণ কল্পনার সাহায্য লইবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হয়েন না। তাহা বলিয়া যে তাহাদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও অবসর হয় না—এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। উপন্যাসকারের প্রতি তাঁহারা যতটা কৃপাদৃষ্টি প্রদান করেন, ঠিক এতটা না হউক, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প করুণাও বিতরণ করিতে যে তাঁহারা অসমর্থ তাহা নহেন। এবং প্রত্যেক নাটকের অভিনয়-দর্শনকাল দর্শকগণ এক দৃশ্য ও অপর দৃশ্যের মধ্যে ব্যবধানটি পূর্ণ করিয়া লইয়া থাকেন। নাট্যাকারে পরিণত চন্দ্রশেখরের মধ্যে অমৃত বাবু এমন কিছু অসম্পূর্ণ রাখেন নাই, যাহা অল্প সময়ের মধ্যেই কল্পনা করিয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়, কিন্তু লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "উপন্যাস পাঠ না করিলে, চন্দ্রশেখরের অভিনয় বুঝিতে ক্লেশ হয়।" আমরা তো ক্লেশের কোনও কারণই দেখি

নাই ; বোধ করি, লেখক মহাশয় চাহেন যে উপন্যাসের প্রত্যেক কথা এবং প্রত্যেক ভাবটি রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। তাহা না হ উপন্যাসের সমুদয় ভাব অবগত হওয়া যায় না। আমাদিগের এই অনু কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ব পারি যে রঙ্গালয়ে কোনও নাটকেরই অভিনয়-দর্শন করিতে যাওয়া লেখ অনুচিত। কারণ, যে কোনও নাটক যতই কেন সুসম্পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট না কেন, তন্মধ্যে কতকগুলি ভাব অবিকশিত থাকিবেই, যে গুলি দর্শকবৃন্দ অনায়াসেই পূরণ করিয়া লইতে পারেন এবং লইয়া থাকেন। স্থলে বলা ভাল যে এমন কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকে—তাহা সেক্সপীরেরই বা অপর কাহারও হউক, সকলগুলিতেই এই প্রকার অবিকশিত ভা অন্তর্নিহিত আছে ; তাঁহার ম্যাকবেথ বল; ওথেলো বল, কিং জন বল, ম অফ্ ভিনিস্ বল, সমুদয় নাটকেই এই প্রকার অসম্পূর্ণতা আছে। কারণ বশতঃ সেক্সপীরের সমুদয় নাটকই কি অসম্পূর্ণ ? লেখক যদি বলিতে চাহেন তাহা হইলে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই। কিন্তু যেন বিস্মৃত না হয়েন যে লেখক যাহাকে "অসম্পূর্ণ" বলিতেছেন, যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে নাটকমাত্রেই অসম্পূর্ণ ; তবে সু ক্ষমা করিবেন, লেখক মহাশয় অমৃত বাবুর চন্দ্রশেখরকে কেন যে অ বলিলেন, তাহার কারণ আমরা কতকটা অনুমান করিয়া লইতে প তাহা যে সত্য এ প্রকারও আমরা বলিতেছি না। লেখক ষ্টারে অ দর্শন করিতে যাইবার পূর্ব্বে হয় তো বহু বার উপন্যাসখানিকে পাঠ ক ছিলেন,—কোথায় কি অন্তর্নিহিত ভাব সুগুপ্ত আছে, সে গুলিকে মান চিত্রিত করিয়াছিলেন, এবং কোন্ কথাটির পর কোন্ কথাটি ব্যবহৃত হই তাহাও তিনি কণ্ঠস্থ করিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং যখন তিনি রঙ্গালয়ে স্থিত হইলেন, তখন তিনি মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত, এক ধনুর্ব্বাণ অপর হস্তে খড়্গ এবং তাহার সহিত একখানি "চন্দ্রশেখর" যাইতেও, বোধ করি, বিস্মৃত হন নাই।

শ্রী—ফ